CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস
ও
রাগরূপের সঠিক পরিচয়

आम्नाय-ग्रन्थालय,
[illegible]
वाराणसी-5

শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
अन्तनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

বিষ্ণুপুর
ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয়

শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রণীত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়—গ্রন্থালয়,
সরতনিধি, কচৌরী
বারাণসী-5

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রাকর :
শ্রীউমাশংকর চক্রবর্ত্তী
বি. এম. ট্রেডার্স (লেটার প্রেস ডিভিশন)
১২ তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা ৪

প্রাপ্তিস্থান :
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

আর, বি, দাস
৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

এ, সি, চন্দ
৪ নং রোফি আহম্মদ কিদওয়াই রোড, কলিকাতা ১৩

কল্লক প্রকাশণী
১৭ রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা ৪

গ্রন্থকারের নিকট
২৫ ই, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষরিত ॥

১৩৮৪। শুভ ১লা বৈশাখ।
ইং ১৯৭৭। ১৪ই এপ্রিল ॥

দাম আট টাকা মাত্র ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়—গ্রন্থালয়,
জয়নিধি, কচৌরী
বারেকরী-5

জ্ঞাপন

মল্লরাজাদের যেখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া জেলা) শাস্ত্রীয় সংগীতের ধ্রুপদাদি গান এবং বাদ্যাদি যন্ত্র চর্চার প্রবর্ত্তন কখন কিভাবে হয়েছিল, তার বর্ষ সংখ্যা কত পশ্চাতে এবং সেই সময় হতে ক্রমশঃ কেমন ভাবে বিপুল আকারে বর্দ্ধিত ও প্রচারিত হয়ে বাংলাদেশের একমাত্র গৌরবোজ্জল ঘরাণা রূপে পরিচিত হয়, তার সঠিক সংবাদ মনে হয় কেউই অবগত নন।

এই বিষয়ের ইতিহাস এবং রাঢ়দেশে রাগসংগীত চর্চার প্রাচীন পরিচয়াদি যথাসম্ভব প্রদত্ত হয়েছে আমার প্রণীত 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থে। কিন্তু ওই গ্রন্থটিতে প্রধানতঃ শাস্ত্রীয়সংগীতের তত্ত্বাঙ্গ ও ক্রিয়াঙ্গের সমুদয় পরিচয় ও যুক্তিবদ্ধ আলোচনা এবং বহু মূল্যবান বিষয়ের বিবরণাদি সুরক্ষিত হয়েছে,—বিশেষ করে উচ্চপর্য্যায়ের শিক্ষার্থী ও চর্চারত ব্যক্তিদেরই প্রয়োজনে আসবে এই মনে করে। কিন্তু দেশের এতবড় ঘরাণা, যাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ঘরাণা সহজেই বলা যেতে পারে তার সৃষ্টি-তত্ত্বের ইতিহাস যাঁদের জানবার আগ্রহ আছে তাঁদের পক্ষে উক্ত গ্রন্থটিকে সংগ্রহ করে নেওয়ার তেমন তাগিদ থাকবে না মনে করে পৃথক ভাবে এই গ্রন্থটিতে ওইসব বিষয় লিপিবদ্ধ করে প্রকাশিত হল, যাতে সহজ সুযোগের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারা যায় এই ভেবে। মল্লরাজাদের সৃষ্টি তত্ত্বের বিষয়ও জানার আবশ্যক আছে মনে করে প্রথমেই তা উল্লেখিত হল। কিন্তু ওই সব বিষয়ের বিবরণ দিয়েই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারলাম না; তার কারণ,—বর্ত্তমানে রাগাদির মধ্যে বহু কিছু ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে বিবিধ ভাবে পরিবেশনের উপর, তাই সেগুলির সঠিক পরিচয় ও তার সৃষ্টি তত্ত্বের প্রমাণাদি কিভাবে আছে তা জানান একান্তই আবশ্যক বলে বিবেচিত হওয়ায় প্রয়োজন মত সেগুলি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হল। এবং সেই সংগে আরো বহু বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হল। শুধু ইতিহাস জানাই নয়, যাঁদের এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকে জানবার আগ্রহ আছে তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থটি সে বিষয়ে সহজ সুযোগ এনে দেবে বলে মনে করি॥

পরিশেষে দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, গ্রন্থের বহু স্থানে ছাপার অক্ষরে ভুল থেকে গেছে; পাঠের সময় শুদ্ধি পত্র দেখে নিতে অনুরোধ রাখলাম॥

ইতি—গ্রন্থকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রন্থকারের কয়েকটি গ্রন্থ

(১) 'সঙ্গীত-মুকুর',—কম বয়স্কদের জন্য স্বরলিপি সহযোগে প্রদত্ত কয়েকটি সুন্দরভাব যুক্ত বাংলা ও হিন্দী গান সম্বলিত এই গ্রন্থটি রাগসংগীত শিক্ষার একান্ত উপযোগী। মূল্য দেড় টাকা॥

(২) 'সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ',—বিশেষভাবে শিক্ষার উপযোগী করে তত্ত্বাঙ্গ ও ক্রিয়াঙ্গের ঔপপত্তিক বিষয় এবং স্বরলিপি সহ কুড়িটি রাগের চল্লিশটি গানে সমৃদ্ধ॥ মূল্য সাড়ে চার টাকা॥

(৩) 'রাগ-অভিজ্ঞান',—শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের তত্ত্বাঙ্গ ও ক্রিয়াঙ্গের সমুদয় বিষয়-বস্তুর আলোচনা এবং বিচার বিশ্লেষণপূর্বক সেগুলির বিশদ বিবরণ এবং ইতিহাস ও নৃত্যকলাদির পরিচয় মূলক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ॥ মূল্য কুড়ি টাকা॥

(৪) 'বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ খেয়াল,'—এই, গ্রন্থটিতে আছে স্বরলিপি সহ পঞ্চাশটি রাগের একশ' তিনটি বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল বাংলায় রচিত। অধিকাংশ গানই হিন্দী খেয়ালের হুবহু বন্দেজ ও গায়কীর উপর নিবদ্ধ। তার সংগে শেষের দিকে আছে কয়েকটি করে বাংলায় রচিত খাঁটি টপ্পা, ঠুম্‌রী ও ভজনের সুরে গান এবং সবশেষে ঔপপত্তিক আলোচনা॥ মূল্য পাঁচ টাকা॥

(৫) 'সুরের পথে একটি জীবন',—সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থটিতে আছে গ্রন্থকারের সঙ্গীত জীবনের পরিচয়, বহুতথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের ঘটনাবলী এবং বহুকিছু অভিজ্ঞাতার বৃহৎ বৃহৎ সঙ্গীত অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ॥ মূল্য পনের টাকা॥

(৬) 'সঙ্গীত ও কাহিনী',—বহুবিধ আদর্শ চরিত্রের সমাবেশ রেখে উপন্যাসের আকারে সঙ্গীতের আকর্ষণীয় ও আদর্শ মূলক পরিচয় সমৃদ্ধ॥ মূল্য তিন টাকা॥

(৭) 'কবিতা শত',—এর কবিতাগুলি পাঠকগণের কাছে হৃদয় গ্রহী ও আদর্শ মূলক বলে মনে হবে॥ মূল্য সাড়ে তিন টাকা

বহুরাগের উপর পাঁচ শতাধিক হিন্দী খেয়াল এবং বহু সংখ্যক শোরীর টপ্পা, ঠুমরী, ভজন এবং অন্যান্য শ্রেণীগত সংগীত, স্বরলিপি সহ গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে আছে॥

আদর্শ মূলক ষোলটি ছোটগল্প প্রকাশিত হবে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৩	করনীয়	করণীয়
১৪	২৪	সমন্বিত	সম্বলিত
২০	৮	দিদর্শন	নিদর্শন
২১	২৬	গুনী	গুণী
২২	২৮	কল্পনীক	কাল্পনিক
২১	২৪	ঘরানার	ঘরাণার
২৫	১২	দিছেন	দিয়েছেন
২৭	১৩	এবন্বিধ	এবম্বিধ
২৮	২৩	কবিবিলাস	হরিবিলাস
৩১	১০	তাঁদেদ	তাঁদের
৩৪	শীরনামায়	প্রকুতি	প্রকৃত
৩৫	”	”	”
৩৮	১৫	শারোদ	শরোদ
৩৯	২০	এরা	এঁরা
৪০	৪	এর	এঁর
ঐ	৮	ধ্রুপদে	ধ্রুপদের
৪২	১২		রূপে।
৪৮	৩	মানণীয়া,	মাননীয়া
ঐ	১৭	এইরূপে	এইরূপ
ঐ	১৯	জতকাল	জমকাল
ঐ	২২	কলস	কলম
ঐ	২৩	দৌষ্বলতা	দৌর্ব্বল্যতা
৪৯	১২	স্বষ্টর	সৃষ্টির
ঐ	১৯	এর	এঁর
ঐ	২৮	এদের	এঁদের
৬৪	১৪	বেত্তাগ	বেত্তাগণ
৬৮	১৭	উৎপন্ন	পরিপক্ক
৭৫	৩	রূপের	রূপের উপর
৭৬	২৮	পাস্তকের	সপ্তকের
ঐ	২৯	কাট	সা: সুরে
৭৬	৩	মুখ পদৃশ	সদৃশ
ঐ	৩০	উত্তরাদ	উত্তরাঙ্গ
৯১	২৭	ইচ্ছামাত	ইচ্ছামত
৯৩	২	শুয্	শুধু
৯৬	২৮	চাক	ঢাক
৯৭	২৩	এ	এবং
১০৩	৭	—	রাগের
১০৯	৫	সারণের	সাধারণের
১১১	৬	প্রচেষ্টায়	প্রচেষ্টায়ও
ঐ	ঐ	উৎসাহও	উৎসাহ
১২৮	১৭	—	ওতপ্রোত
১২৯	২৭	ক্রিয়ার	ক্রিয়ায়
২২৯	২৩	চর্চটা	চর্মটা
১৩২	১০	করেছে যে	করেছে সে
১৪১	৬	গুরুদেব	গুরুদের
১৫০	১৪	রাগের উপর	উপর বাদ
ঐ	ঐ	চেহারার-এই	চেহারার-আসল
ঐ	১৫	রকম	এ রকম
১৫১	২২	স্বরূপ	স্বরূপ
১৬৫	১১	উন্নত	উন্নীত
ঐ	১৪	হচ্ছে	হচ্ছে।
ঐ	১৩	অধ্যায়ণ	অধ্যয়ন
১৬৬	২০	মিন্তু	কিন্তু
৩২	২২	দুস্পাপ্য	দুস্প্রাপ্য
৩৫	২৪	পুরেথ	বিষ্ণুপুরের
৫০	৮	তালে	তালের
৫৫	১৫	মাতামহী	পিতামহী
৫৭	৩	সনভাবে	সমভাবে
৭১	১১	হবে	হয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভুল সংশোধন

৭৮ পৃষ্ঠার ২৩ পুংক্তিতে বিভাস রাগের পরিচয়ে তার আরোহণেও 'নি' সুর ব্যবহৃত হবে। এই রাগটির সৃষ্টি তত্ত্বের যে পরিচয় দিয়েছি তা সম্প্রতি-কালের চিন্তা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বাস্তববোধকে ধরে দার্শনীক বিচারের সাহায্য নিয়ে। তাছাড়া এই রাগের পরিচয় প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে ধারাবাহিকতার মাধ্যমে যে ভাবে এই বাংলা দেশে প্রচারিত হয়ে এসেছে, বিশেষ করে দক্ষিণ রাঢ় দেশে, তাতে সংস্কৃত ও অন্যান্য শ্রেণীর গানে ও বিভিন্ন সুরে থেকে এসেছে আরোহণেও 'নি' সুরের ব্যবহার। সুতরাং তার নিজস্ব সুরকে বজায় রাখবার জন্য ওই স্বরের ব্যবহার থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। এই রাগের জন্মোদ্ভব সম্বন্ধে বিচার ভিত্তিক যা প্রমাণ তা আগেই জানিয়েছি। এর সৃষ্টি যে এই রাঢ় দেশেই রাগ সৃষ্টির আদিতে হয়েছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই। এখান হতে যে সময়ে এই রাগ ভারতের দুরান্তরে পেঁাছে প্রাচীন ধ্রুপদাদি গানে তার সুর সংযোজিত হয়েছিল, তখন কোন রকমে আরোহণের 'নি' সুরের ব্যবহার হয়ত লুপ্ত হয়ে পড়ে। কিংবা এমনও হতেপারে, প্রাচীন দেশকার ও বিভাসের স্বর গতির আরোহণ একই রকম দেখে তাকে বৈজ্ঞা-নিক নিয়মে বিশুদ্ধতা বজায় রাখবার জন্য বিভাসের ওই স্বরকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিচারে তা হয়না। কারণ মুল সৃষ্টির মধ্যে বিভাসের ওই স্বর থাকায় তার অকৃত্রিম রূপকে রক্ষা করে যাওয়ারই দায়িত্ব আছে। প্রাচীন দেশকার রাগটির রূপ প্রভাব তেমন আকর্ষণীয় ও রূপস্বাতন্ত্রের পরিচয় তেমন নেই বলে ধ্রুপদ, খেয়ালের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু উক্ত বিভাসের বহু সংখ্যক প্রাচীন ধ্রুপদ, খেয়াল আছে। আমার যুক্তিতে প্রাচীন দেশকারের রূপের মধ্যে আরোহণে 'ধা' সুর বাদ দিয়ে ঔড়ব-ষাড়ব জাতিতে রাখলেই সব দিক দিয়ে বিচার সম্মত হবে॥

কল্যাণ রাগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই রাগটির সুরের উপর এখন অনেকে পনের আনা সাড়ে তিন পয়সা ভাগই ভূপালী রাগেরই পরিচয় রাখেন, অর্থাৎ কড়ি 'মা' ও 'নি' সুর না থাকার মতই। কল্যাণ রাগের আরোহণেও কড়ি 'মা' এবং 'নি' সুরের ব্যবহার প্রাচীন ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদি গানেও আছে। কি ভাবে আছে তা ভাল করে জেনে এই রাগের চর্চা করা উচিত। কল্যাণ রাগকে শুদ্ধ কল্যাণ বলার মধ্যে কোন যুক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় থাকেনা। কল্যাণ নামেই তার পরিচয় বরাবর থেকে এসেছে আসলের রূপে। কল্যাণ রাগের শাস্ত্রীয় নাম 'কল্যাণী'॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথম পরিচ্ছেদ

মল্লরাজবংশের আদি জন্মবৃত্তান্ত

মল্লরাজারা শৌর্য্যে, বীর্য্যে, প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে এবং শিল্পের ঐশ্বর্য্য স্থষ্টিতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। শুধু তাই নয়, দেব-দেবীর উপর তাঁরা পরম ভক্ত যে ছিলেন তাঁর প্রমাণ রেখে গেছেন বিষ্ণুপুরে এবং মল্লরাজত্বের মধ্যে বহু বিষ্ণুমন্দির, ও শিবমন্দিরাদি নির্মাণ করিয়ে। এইসব বৃহৎ মন্দিরের নির্মাণকার্য্য ও শিল্প স্থষ্টির সমাবেশ অপূর্ব ও আকৃষ্ট কর। এঁদের রাজত্বের সীমানা রাঢ়ভূমের বহু অংশ ছাড়াও ছোটনাগপুর ও সাওতাল পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

এই মল্লরাজাদের জাতি নির্ণয় বিষয়ে কোন কোন ইতিহাস লেখক অসম্ভব ভুল ধারণা নিয়ে জানিয়েছেন স্থানীয় হাঁড়ি, ডোম, চণ্ডাল, বাগ্‌তী, মাল (মল্ল) প্রভৃতি যেসব নীচ জাতি আছে তাদের মধ্যে মালজাতি হতে এই রাজবংশের উদ্ভব। মল্লরাজারা যে সত্যই ক্ষত্রীয় তার প্রমাণ যথেষ্ট থাকা সত্বেও ইতিহাস লেখকরা কি করে সে দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখলেন না, তা ভেবে আশ্চর্য্য হতে হয়। তাঁদের বুদ্ধি শক্তিকে নিয়োগ করে ভেবে দেখতে হত, গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজ, পণ্ডিতমণ্ডলী প্রভৃতি, যে রাজাদের নিকট হতে বিত্ত ও অন্নগ্রহণ করে এসেছেন, পুরোহিত ও দীক্ষাগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সেই রাজাদের বংশ নীচ জাতি থেকে উদ্ভূত হতে কি করে পারে ?

এঁদের বংশোৎপত্তির সত্যকারের পরিচয় এখন আমি প্রদান করছি। এইসব পরিচয় সংগৃহীত হয়েছে আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে ধারাবাহিক ভাবে থাকা ইতিহাস থেকে এবং দেশ জুড়ে প্রথম সময় হতে প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে।

জন্ম তত্বের বিবরণ,—বহুশতাব্দী আগে দক্ষিণ রাঢ় ভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রান্ত সীমা ধরে উত্তর,-পশ্চিম ভারতের বহু স্থান হতে লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে পায়ে হেঁটে সাগর সঙ্গমে পূণ্যস্নান ও কপিলমুণি দর্শন মানসে যেত।

এই রাস্তা মেদনীপুর জেলার পূর্ব শেষ প্রান্তের কোলাঘাট নামক স্থান পর্য্যন্ত ছিল। তারপর ওখান হতে রূপনারায়ন নদের উপর নৌকা যোগে যাত্রীরা সাগর সঙ্গমে গিয়ে পৌছত।

মল্লাব্দের বর্ষ সংখ্যা ধরে আজ থেকে (১৩৭৬ সাল) প্রায় ১২৮১ বর্ষের কিছু পূর্বে (৬৯৩—৯৪ খৃঃ) ওই সঙ্গম স্থলে গমনকারী এক যাত্রীদল এখনকার বিষ্ণুপুরের কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী লাউগ্রাম নামক স্থানের পশ্চিমভাগে বৃহৎ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যখন যেতে থাকে তখন তাদের মধ্যে এক স্ত্রীলোকের দারুণ অসুস্থ শরীরের উপর আসন্ন প্রসবকাল উপস্থিত হয়। তৎক্ষণাৎ এক বৃক্ষতলে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে, কিছুক্ষণের মধ্যে প্রসুতিটি মারা যায়। যাত্রীরা শোকাভিভূত এবং বিভ্রান্ত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেই নিবিড় বনমধ্যে থাকা এবং তখন আর কোন কিছু করণীয় নেই ভেবে তারা মৃতাকে ঝোপের মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে কবরস্থ করে দেয়। তারপর সদ্যজাত শিশুটিকে তার পিতা নিজের পাগড়ী খুলে মাটির উপর বিছিয়ে তার উপর শায়িত করে রাখে। তারপর শিশুটিকে ভগবান যদি রক্ষা করেন এই আশায় তার পরিচয় রাখার অভিপ্রায়ে নিজের তাবিজটি শিশুর হাতে বেঁধে দিয়ে এবং নামাঙ্কিত তরবারীটি মাথার কাছে রেখে সরোদনে যাত্রীদলের সংগে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

একটি মাল (মল্ল) জাতীয় নারী কাষ্ঠ আহরণ করতে গিয়ে দৈবক্রমে ওইখানে এসে এই বেদনাহত করুণ দৃশ্য অবলোকন করে যাত্রীদের অলক্ষে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সদ্য পুত্রহারা সেই নারীটি ছুটে এসে শিশুটিকে পরম আগ্রহভরে কোলে তুলে নেয়, এবং পাগড়ী ও তরবারীটি হাতে করে নিয়ে নিজের পর্ণকুটিরে চলে আসে। তারপর যথাসময়ে তাদের জাতির সকলকে এই ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত জানায়।

যথাস্থান থেকে ঘটনার এই পরিচয় এবং সাগর সঙ্গমে সেই যাত্রীদের গমন বৃত্তান্তের সংবাদ তখনকার সময় থেকে দেশের মানুষদের কাছে প্রচারিত হয়ে এসেছিল। কিন্তু কোন কোন ইতিহাস লেখক সত্য পরিচয়কে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধরে লিখতে গিয়ে মনে হয় অসতর্ক হয়েই জানিয়েছেন—ওই যাত্রীদল জগন্নাথ দর্শনে শ্রীক্ষেত্র ধামে যাচ্ছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—"মন্দির নির্মাণের পর জগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে। ওই মন্দির নির্মিত হয় সেই সময়কার উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গভীমদেব কর্তৃক চৌদ্দ বৎসর পরিশ্রমের ফলে।

তারপর থেকেই ক্রমশঃ পুরীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয় এবং তখন থেকেই দর্শনপ্রার্থীর সমাগম হতে থাকে।" তাহলে দেখা যাচ্ছে মল্লরাজত্ব সৃষ্টির বর্ষ সময় অপেক্ষা পুরীর মন্দির এবং জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠার বর্ষসীমা আরো প্রায় চারশ' বছর কমের মত।

পুরী ধামের মাহাত্ম্য প্রচারিত হবার পরই যাতায়াতের পথ সুগম করে দেবার জন্য মহারাণী অহল্যাবাঈ ৺কাশী হতে পুরী পর্য্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ করিয়ে স্থানে স্থানে পান্থশালা, জলাশয়, ইন্দারা, ইত্যাদি তৈরি করিয়ে দেন। এই সড়ক নির্মাণের সময়কাল এখন হতে সাতশ' বছরের কিছু আগে হবে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে ধরে জগন্নাথের মূর্ত্তি আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রাচীন বৃত্তান্ত কোন কোন মতে যা লিখিত ও কিম্বদন্তীরূপে প্রচলিত আছে তাকে বিশ্বাস যোগ্যরূপে গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট সংশয় থেকে গেছে। সেই পরিচয় এখনকার লোকের কাছে অবাস্তব বলে মনে হবে। তাছাড়া তার বর্ষ সংখ্যা এত পশ্চাতে যে সে যুগে দূরত্বে বসবাসকারী মানুষদের পক্ষে পুরীর এই সংবাদ জানা সম্ভবপর বলে মোটেই মনে হবে না।

সুতরাং বিচার যুক্তি দিয়ে দেখলে ওই যাত্রীদলের গমন যাত্রার প্রচারিত সংবাদে সাগরসঙ্গমে যাওয়ার কথাই যথার্থ বলে স্বীকারে আসে॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই শিশুর পরের বিবরণ,—সেই মাল বা মল্লরমণী নিজের স্তন্যদানে শিশুটিকে বড় করে তুলতে লাগল। শিশু সৌষ্ঠবপূর্ণ গঠন নিয়ে শশীকলার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মত উজ্জ্বলরূপে বৰ্দ্ধিত হতে থাকে। মল্লরমণীর শ্রেণীগোষ্ঠীর লোকেরাও শিশুটির উপর গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়। বয়সের এক সময়ে পালন কারিণী মাতা তার নাম রাখে 'রঘু'। স্থানীয় সমবয়সী ছেলেদের সংগে খেলার সময় যুদ্ধাদির প্রকরণ মত তার খেলার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ দ্বৈতভাবে মল্লযুদ্ধের মত এবং তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করা, এইসবে তাদের সংগে মেতে থাকে। তারপর দশ বার বছর বয়সের সময় তার শরীরের গঠনে ও ক্রিয়া-কলাপে সকলে বুঝতে পারে এই ছেলে নিশ্চয়ই ক্ষত্রীয় বীর বংশের সন্তান। তখন সকলের পরামর্শ ক্রমে সেই মল্লরমণী তাকে সংগে করে নিয়ে যায় কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী প্রদ্যুম্নপুর নামক রাজধানীতে থাকা তার জানিত এক জ্যোতিষী পণ্ডিতের গৃহে বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য। পণ্ডিতমহাশয় স্ত্রীলোকটির কাছে ছেলের সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় পেয়ে এবং তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে ও মুখমণ্ডলের মধ্যে রাজ চিহ্নের লক্ষণ দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েন। পরক্ষণেই অতি স্নেহাদরে তাকে বক্ষে টেনে নেন এবং পরম আগ্রহের সহিত তাকে কাছে রেখে দেন।

সেই পাগড়ীর মধ্যে অবস্থিত চিহ্ন এবং তরবারী ও তাবিজে থাকা খোদাই চিহ্ন দেখে জ্যোতিষী পণ্ডিতের কাছে ছেলেটির পরিচয় পরিষ্কার হয়ে যায় ক্ষত্রীয় বলে। সেই ছেলের লালন-পালন কারিণী মাতাকেও ব্রাহ্মণ সাদরে নিজগৃহে স্থান দেন।

শুভদিনে ছেলেটির বিদ্যা আরম্ভ করে দিয়ে আচিরেই বুঝতে পারেন তার মেধা অদ্ভুত। কিন্তু ছেলেটির বিশেষভাবে আগ্রহ থাকে শরীর চর্চা ও অস্ত্রাদি চালনার দিকেই। নিভৃতে পিতৃ তরবারীটি নিয়ে নানান কৌশল অবলম্বন করে চালনা অভ্যাস করতে থাকে এবং তার সংগে শরীরের নানা রকম শক্তিপরীক্ষাও। এই রকমভাবে তার যখন যৌবনকাল উপস্থিত হয় তখন ব্রাহ্মাণ তাকে ভূঃস্বামী রাজার কাছে নিয়ে যান এবং সমস্ত বিবরণ রাজাকে প্রদান করেন। অপুত্রক রাজা ছেলেটির দিকে তাকিয়েই সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেন, এবং পুত্রবৎরূপে গ্রহণ করে নেন। সেই মাল রমণীকেও ব্রাহ্মণ-গৃহ হতে আনয়ন করে অন্তঃপুরে থাকার ব্যবস্থা করে দেন সম্মানের সহিত। রাজা ওই ক্ষত্রীয় পুত্রের রাজ্য পরিচালনা ও সমর বিদ্যাশিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। রঘুনাথ অচিরেই মল্লযোদ্ধা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও সমরবিদ্‌রূপে সকলের কাছে পরিচিত হন। কিছুকালের মধ্যেই রঘুনাথ দক্ষিণ রাঢ়ের বহু ভূঃস্বামীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের বিপুল ধন সম্পত্তি করায়ত্ত করে নিয়ে উক্ত রাজাকে অর্পণ করেন। তাঁর পরাক্রমের কাছে বহু সামন্ত রাজাকে এবং দেশীয় সর্দ্দারদের মাথা নত করতে হয়েছিল।

তারপর যথাসময়ে শুভ লগ্নে রাজা তাঁর একমাত্র কন্যাকে রঘুনাথের পাণি গ্রহণ করান এবং রাজ সিংহাসন জামাতাকে অর্পণ করেন। বিরাট ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে রঘুনাথ মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হন। চতুর্দিকে বিরাট মল্লযোদ্ধারূপে তাঁর পরিচয় হওয়ায় মল্ল কথাটি যুক্ত করে মহারাজ রঘুনাথ মল্ল এই উপাধিতে সম্বোধিত হন এবং এই সম্বোধন থেকে যায় কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত। এই উপাধি পেয়ে রঘুনাথ খুশীই হন, তাঁর পালন কারিণী মাতার জাতি উপাধির সম্পর্ক থাকায়। এই রঘুনাথ থেকেই এই রাজবংশের মল্ল উপাধি ও মল্লভূমের নামোৎপত্তি, এবং সেইজন্য এঁকে মহারাজ আদি মল্লও বলা হয়। বহু পরে এই বংশের রাজারা, নবাবদের কাছে 'সিংহ' ও 'সিংহদেব' উপাধিপ্রাপ্ত হবার পর মল্ল উপাধি পরিত্যক্ত হয়। মল্লরাজাদের ষষ্টিতম পুরুষ পর্যন্তই রাজ পরিচয় টিকে ছিল। তারপর তা লুপ্ত হয়ে পড়ে। মল্লাব্দের বর্ষসংখ্যা বঙ্গাব্দের থেকে একশ বছর কম। ভারতের কোন স্থানে এত বর্ষ ধরে সমানে রাজ বংশের পরিচয় আছে কিনা জানি না।

এস্থলে আর একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের নাম করতে হয়। তা হল গড়মন্দারণ। এখানের রাজারাও বেশ ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপশালী ছিলেন। বিশেষভাবে জানা যায়, গৌড়ের মহারাজ বল্লাল সেন ছিলেন উক্ত বংশের এক রাজার ভগিনী পুত্র। গড়মন্দারণের দুর্গাদি এখন একেবারে ভগ্নদশায় পরিণত হয়ে গেছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী' এখানের উপরই রচিত। এই স্থানটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর থেকে কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত।

মল্লরাজারা যে ক্ষত্রীয় তার অন্যতম বিশেষ প্রমাণ, এঁদের সঙ্গে কয়েকটি ক্ষত্রীয় রাজাদের এবং পশ্চিম প্রদেশাঞ্চলের বহু স্থানের ক্ষত্রীয়দের বিবাহাদি শুভকার্যের আদান প্রদান চলে এসেছে। ময়ূরভঞ্জ এবং ত্রিপুরা রাজ বংশের কুমারীদের সঙ্গে এঁদের বিবাহ হয়েছে। এখনও বিষ্ণুপুরে ও অন্যান্য স্থানে এই বংশের যাঁরা আছেন, তাঁদেরও এইভাবে বিবাহাদি চলে আসছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই বংশের অনেকের গৃহের কুলবধূরা এখনও অসূর্য্যম্পশ্যার মত অন্দর মহলে আবদ্ধ থাকেন।

নিকৃষ্ট নীচ মাল জাতি থেকে মল্লরাজবংশের উদ্ভব বলে যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা এইসব প্রত্যক্ষ পরিচয়ের উপর অবস্থিত প্রমাণের দিকটা দেখারও অবকাশ রাখতে পারেননি, আশ্চর্য্য !

ইতিহাস লেখা সম্বন্ধে আমাদের একটা খুব স্বাধীন সুবিধা আছে। যে স্থানের লোকেদের সে স্থানের ইতিহাস সংগ্রহ নেই, জানার প্রতি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ও গুরুত্ব নেই, অর্থাৎ নির্বিকার চিত্ত, সে স্থানের ইতিহাস লিখতে বিশেষ শ্রমস্বীকার করতে হয় না। অবাস্তব রচনাও সহজে করতে পারা যায়। প্রতিবাদের বিশেষ আশঙ্কা থাকেনা, কারণ, ভরসা থাকে সেখানের লোক নির্বিবাদে সব হজম করে নেবে। লেখকরা যদি গণ্যমান্য বা বিদেশী হন, তাহলে তো কথাই নেই। কলমের ডগায় বুদ্ধি রেখে, প্রমাণ দলিলহীন স্থানের দলিল তৈরী করে নিয়ে তাতে অবাস্তব কল্পনার ষ্ট্যাম্প মেরে দিতে আটকায় না। এইসব উক্তির অভিজ্ঞতা এখনকার অনেক বিষয়ের উপর আমি পেয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ, একজন লেখক মল্লমহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেবের সময় তাঁকে নিয়ে লালবাঈ সংক্রান্ত ঘটনাকে ধরে 'লালবাঈ' নামে একটি বই লিখেছেন। এই বই পড়ে মনে হ'ল যেন লেখক চরিত্রের আসল কিছু মালমশলা নিয়ে উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। এখানের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে যাঁরা অজ্ঞাত তাঁদের কাছেই লেখকের খেয়াল খুশীর কাব্য কল্পনা চমকপ্রদ লাগবে এবং তা প্রশংসিতও হতে পারে। কিন্তু জ্ঞাত ব্যক্তিদের কাছে লেখার অধিকাংশ স্থল অবাস্তব বলেই মনে হবে। অথচ এর তেমন প্রতিবাদ নেই, কারণ আমরা নির্বিকার চিত্ত হয়ে গেছি। লেখক, লালবাঈ-এর জীবনের শেষ পরিণতির কথা যা লিখেছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রঘুনাথ সিংহকে হত্যা করার পর লালবাঈএর একান্ত অনুরোধে বিহার প্রদেশের মধ্যে তাঁর পরিচিত এক গ্রামে রাজা গোপালসিংহ শিবিকায় করে সেখানে পাঠিয়ে দেন। বিশেষ করে বলার আবশ্যক করেনা যে, ইতিহাস বিষয়ে সত্যানুসন্ধানের জন্য পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশীল, অনুসন্ধিৎসু ও দূর দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হয়। আমার অভিজ্ঞতায় বলে, অনেক বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব থাকলেও, ইতিহাস সংগ্রহের জন্য সেই স্থানের পারিপার্শ্বিক পরিচয়ের সঙ্গে নিজের বিচার বুদ্ধিকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একান্তভাবে নিয়োগ করে তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকতে পারলে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়। তবে দেখতে হবে, উদ্ঘাটিত সত্য যেন সকলের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হয়, অর্থাৎ তাতে যেন কারো সন্দেহ না থাকে। সকলে যেন উপলব্ধি করেন, দেওয়া পরিচয়ের বিকল্প আর কিছু নেই, থাকা সম্ভবও নয়।

এস্থলে আমি আবার জানাই, আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা কিছু লিখিত এবং পূর্বাপর বংশধারা হতে মুখে মুখে সংরক্ষিত এইসব ইতিহাস আগাগোড়া শুনে স্মৃতিশক্তিতে ধরে রেখে সেগুলির বিবরণ যথার্থ ভাবে প্রদান করলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাগসঙ্গীতের প্রাচীন চর্চার ধারা

লুইপাদ

প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রারম্ভিক পর্য্যায়ের আলোচনায় যে সন্ধান পাচ্ছি তাতে মল্লরাজত্বের প্রথম যুগ থেকেই নয় তার বহু পূর্বে থেকেও আঞ্চলিক রাজা ও জমীদারদের সময়ে রাগ-সংগীতের চর্চার ধারা যে অব্যাহত ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ উৎস না থাকলে বেদের শ্লোক, পদাবলী, সংস্কৃতে রচিত গানাদির মধ্যে দিয়ে রাগসংগীতের ধারা মল্লরাজত্বে কি করে আসতে পারে? শুধু তাই নয়; এই ধারার উৎস যে কত দূরের গভীরে নিহিত তা নিরাকরণ করাও দুঃসাধ্য। এর প্রমাণ প্রদানে কিছুটা অগ্রসর হয়ে পাওয়া যাচ্ছে বুদ্ধ শিষ্য লুইপাদের চর্য্যাপদ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হাজার বছরেরও অধিক সময় আগে রচিত। গ্রন্থটির পুরো নাম 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেগেছেন—লুই-পাদ এই রাঢ়েরই মানুষ ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় ইং ১৯০৭ সালে নেপাল দরবার থেকে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামক একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন।

এই পুঁথির গানগুলির নাম চর্য্যাপদ। চর্য্যাপদ গীতের আকারে লেখা কিছু সংখ্যক পদের সমষ্টি। প্রত্যেক পদের সূচনায় রাগের নাম উল্লেখ করা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আছে। এর থেকে সহজেই বুঝা যায় চর্য্যাপদ মূলতঃ গান হিসেবেই রচিত হয়েছিল।

চর্য্যায় ব্যবহৃত রাগের মধ্যে 'পটমঞ্জরী' রাগের সংখ্যা অনেক বেশী। মল্লারী, ভৈরবী, কামোদ, বরাড়ী, গুর্জ্জরী, গৌড়ী, দেশাখ, রামশ্রী, ধানশ্রী, মালশ্রী প্রভৃতি রাগগুলির নাম পাওয়া যায়। এইসব রাগরূপের চর্চা, ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে চলে এসেছিল। চর্য্যাগানে কয়েকটি বাদ্যের উল্লেখ আছে, যথা,—ডমরু, পটহ, বাদল, করটা, কশালা ইত্যাদি। লুইপাদ সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদে জানা যায় এবং বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীমাণিকলাল সিংহ নামে একজন পুরাতত্ত্ব সংগ্রহকারকের মুখেও শুনেছি, মল্লভূমের দ্বারকেশ্বর নদের তীরে কয়েক ক্রোশ ব্যাপী বিভিন্ন গ্রামে লুইচাঁদ ঠাকুরের পূজাদি প্রচলিত হয়ে বহুকাল ধরে অব্যাহত ভাবে চলে এসেছিল। এইসব পূজা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত বৈশাখী পূর্ণিমায় করা হত। বুদ্ধদেবের জন্ম ওই শুভদিনে বলে' তাঁর শিষ্য লুইপাদ বা লুইচাঁদকে ওই দিনেই বুদ্ধ স্মরণে পূজার দিন ধার্য্য হয়েছিল, এই কথাই প্রচলিত আছে। এই সমস্ত সংবাদের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে অন্যান্য মহাপুরুষদের ন্যায় লুইপাদ ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়ের নিকট দেবতা বিশেষ ছিলেন এবং তিরোধানের পর তাঁর পূজার প্রচলন হয়। এই বিশ্বাসের মূলে সন্দেহ রাখবার মত কিছু নেই—এ কথা বিশেষ জোর দিয়ে উক্ত মাণিকবাবু বলেন।

তিনি আরো বলেন মল্লভূমে লুই সহর নামে এক জনবহুল স্থান ছিল, এখনও ক্ষীণকায় নিয়ে আছে। অনুসন্ধানকারীরা অনেক কিছু প্রমাণ তথ্যের উপর নির্ভর করে তাঁদের যে মন্তব্য রেখেছেন তাতে জানা যায়ে লুইপাদের নামানুসারেই উক্ত সহরের নামকরণ হয়েছিল এবং শিষ্যদেরই প্রচেষ্টায় নগর গড়ে উঠেছিল। এইসব তথ্যবহুল সংবাদের ভিত্তিতে পাওয়া যায় লুইপাদের দক্ষিণ রাঢ়ভূমেই তাঁর জন্মোৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠার পরিচয়। রাগসংগীত-চর্চার ধারাবাহিকতার আরো বিশেষ প্রমাণ স্বরূপ হয়ে আছে দক্ষিণরাঢ়ের মল্লভূম অঞ্চলের ময়নাপুর গ্রাম হতে কবি রমাই পণ্ডিতের রচিত পুঁথি আকারে 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থ। রমাইপণ্ডিত উক্ত গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতদের মতে উক্ত রচিত গ্রন্থের রর্ধকাল খৃষ্টীয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দির মধ্যবর্ত্তী কালে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ওই স্থানে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের গ্রাম সমূহে সঙ্গীতের পরিবেশসহ ধর্ম-ঠাকুরের পূজা বহু সংখ্যা নিয়ে হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধের আবরণ দেবতা বলে মনে করে গেছেন। রমাই পণ্ডিতের সমসাময়িক বা কিছু পর থেকে রাজানুগ্রহে মল্লভূমের আরো যাঁরা বহু ধর্মমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন দ্বিজরামচন্দ্র, সীতারাম, রূপরাম, মাণিকরাম প্রভৃতি। এঁরা সকলেই রাগ-সংগীত চর্চার অনুগামী ছিলেন।

শেষোক্ত ব্যক্তির রচিত ধর্মমঙ্গলে সে সময়কার এক রাজা-হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতে (পালায়) লুইএর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং তিনশত বৎসর আগেকার প্রাচীন পুঁথিতে এবং বিক্ষিপ্ত পত্রেও লুইপাদ নামের উল্লেখ আছে। রাগসংগীত চর্চার প্রাচীনত্বের প্রমাণস্বরূপ লুইপাদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার এইসমস্ত বিষয় প্রদত্ত হ'ল ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লোচন পণ্ডিত

আটশ' বছর আগেকার শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চারত দু'জন মহান ব্যক্তির পরিচয় খুবই উল্লেখযোগ্য এবং রাগসংগীত চর্চার পরিচয় বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরমধ্যে প্রথম ব্যক্তি হলেন লোচন পণ্ডিত। দ্বিতীয় হলেন কবি জয়দেব। বহু কিছু তথ্য, সংবাদ ও প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যে পরিচয় পেয়েছি এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে সম্ভাবনার গুরুত্বকে গ্রহণ করেছি ; সেগুলি উপস্থাপিত করছি।

এর পটভূমিকায় প্রথমতঃ বলতে চাই, এদেশে অর্থাৎ ভারতে তখন স্বরলিপির যথাযথ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি বলেই মনে হয়, শাস্ত্রীয় সংগীতের গ্রন্থগুলি ঔপপত্তিক (Theoretical) বিষয় সম্ভারেই সমৃদ্ধ। তাই এখানের পদাবলী ইত্যাদিতেও রাগ-তালের নামই উল্লিখিত হয়ে আছে। প্রাচীন পদাবলী ইত্যাদিতে রাগ-তালের নামোল্লেখ ধরে কেবল বুঝতে পারা যায়—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উক্ত রচনা বস্তুর কবিগণ রাগসঙ্গীতের চর্চা করেছিলেন। কারণ তাঁরা সেই ভাবে গাইতে এবং রাগরূপের ভাব বস্তুকে যথাযথ ভাবে যদি চিনতে না পারতেন, তাহলে অহেতুক রাগের নাম সন্নিবেশ করতেন না। তাঁদের এই অধিকারের প্রমাণ আগের অনেক সংগীত সাধকদের মধ্যেও পাওয়া যায়।

রাগসংগীতের প্রভাব মাহাত্ম্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তি উপলব্ধি করে আমাদের দেশের উচ্চমার্গের জ্ঞানবান সাধক ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা বহু ধর্ম্মীয় ব্যবস্থায় তার ব্যবহারিক ক্রিয়ায় স্থান দিয়েছিলেন।

কয়েকশ' বছর আগে বাংলাদেশের ৺দুর্গাপূজায় নবপত্রিকা আনয়নের সময় এবং ওই পূজায় অনুষ্ঠিত মন্ত্রাদির মধ্যে তার নির্দিষ্ট সময়ে অনেকগুলি রাগ-তালের শুধু উল্লেখই নয়, গাইবার ও নির্দেশ আছে। এই সকল স্পষ্ট ব্যবস্থার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে আছে, উক্ত পূজানুষ্ঠানের প্রত্যেক জায়গায় রাগাদি চর্চারত গায়কের অভাব ছিল না। কারণ মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করে যে সমস্ত রাগ-তাল ধার্য্য হয়েছিল সেগুলি প্রকাশের মত যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা গরিষ্ঠতা যদি না থাকত তাহলে 'দুর্গাপূজা পদ্ধতি'র গ্রন্থকার নন্দিকেশ্বর তাঁর গ্রন্থে অহেতুক সন্নিবেশ করতে পারতেন না, পূজার মধ্যে রাগরূপের মূর্তি আনয়নের কামনা তাঁর অন্তরেই বিলীন হয়ে যেত।

এই সব ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে তখনকার গ্রন্থদিতে যে সমস্ত রাগ-তালের উল্লেখ আছে তা শুধু নামের জন্য নয়,—নির্ণয়কারকদের তাতে যথেষ্ট দখলও ছিল।

কবি জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' গ্রন্থে অনেকগুলি রাগ-তালের নাম আছে! তিনি তাঁর গীতগোবিন্দের রচিত বস্তু-গুলির প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন রাগ-তালকে যুক্ত করে গাইতেন, এই সংবাদ সুপরিচিত।

তাঁর দেওয়া রাগ গুলির সংগে দক্ষিণ রাঢ়ের প্রচলিত রাগের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়।

জয়দেবের জন্ম বৃত্তান্তাদি পরে আলোচিত হবে। এখন লোচন পণ্ডিতের সম্বন্ধে যুক্তিবদ্ধ পরিচয় জ্ঞাপন করি।

লোচন পণ্ডিতের এবং তাঁর 'রাগ তরঙ্গিনী' গ্রন্থের পরিচয় বিশেষ করে জানতে পারা গেল স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের এক বিস্তারিত প্রবন্ধের মাধ্যমে। তাঁর ওই প্রবন্ধ বাংলা ১৩৬৭ সালের ২৫শে বৈশাখ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'গীতবিতান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শার্ঙ্গদেব রচিত 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থকেই আমরা সম্মুখভাগস্থিত প্রাচীন গ্রন্থ বলে জানতাম কিন্তু ওই প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেল গৌড়ের মহারাজ বল্লাল সেনের দরবার গায়ক লোচন পণ্ডিতের রচিত 'রাগ-তরঙ্গিনী' গ্রন্থ আরো বহু পূর্বে লিখিত। এই গ্রন্থটিতে বহু রাগাদির পরিচয় এবং ঔপপত্তিকাদি বিষয় বস্তু সন্নিবেশিত হয়ে আছে। গ্রন্থটি বঙ্গ দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছল। পরে পাওয়া যায় এলাহাবাদের কাছে।

এই গ্রন্থ হতে মধ্য ভারতের রাজা হৃদয় নারায়ণ (খৃঃ ১৬৬৭ সালের কাছাকাছি) তাঁর গ্রন্থ 'হৃদয় কৌতুক' এ কতক বিষয় উদ্ধৃত করেন। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণযোশী এর নকল করে পুণায় পাঠিয়ে দেন। সেখানে ইং ১৯১৮ সালে শ্রীদত্তাত্রেয় যোশী তাহা সম্পাদন করেন।

লোচন পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন, "তখন দেশে আরো অনেক সঙ্গীত শাস্ত্রের গ্রন্থ ছিল। (পৃঃ ৮) তাতে রাগ বিশেষে আরোহণ-অবরোহণ ভাল করে লেখা আছে।"

লোচন পণ্ডিতের উক্ত গ্রন্থ ১১৬০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রাজা বল্লাল সেনের রাজ্য প্রাপ্তির সময়ে সম্পাদিত হয়, কবি জয়দেবের জন্মের পূর্বে। তাঁর উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তাঁর দ্বারা 'রাগসংগ্রহ' প্রভৃতি আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়ে আছে। কিন্তু সে সব গ্রন্থ এখনও কোন স্থানে উদ্ধার হয় নি, সে চেষ্টাই বা কোথায়!

যাই হোক, প্রাচীন চর্চার এইসব প্রাথমিক সত্যের উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই রাঢ় ভূমের কোন স্থানে আর্য্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে সামগান চর্চার এক শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

এই সিদ্ধান্তে আসার মূলে যে যুক্তি থাকছে, তাহল লুইপাদ প্রভৃতি মহান ব্যক্তিদের রাগসংগীত শিক্ষার গুরু এবং সেই গুরুর-গুরু, এই রকম উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষা কেন্দ্র থাকার উপর বিশ্বাসে উপণীত হওয়া যাচ্ছে। এই শিক্ষাকেন্দ্র দক্ষিণ রাঢ় ভূমেই ছিল বলে ধারণা এইজন্য হয় যে, সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে এই রাঢ়ভূমেই রাগ সংগীতের বহুল প্রচার ও চর্চার প্রাচীনতম পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

সঙ্গীতাচার্য্য লোচন পণ্ডিতের কোথায় জন্মস্থান ছিল সে বিষয় ক্ষিতিমোহন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেন শাস্ত্রী মহাশয় কিন্তু জানাতে পারেন নি তাঁর উক্ত পত্রিকার প্রবন্ধে। লোচনের 'রাগ তরঙ্গিনী' গ্রন্থে দেওয়া থাকলে তিনি নিশ্চয়ই উল্লেখ করতে বিস্মরণ হতেন না।

দক্ষিণ রাঢ়ভূমের রাগসংগীত চর্চার প্রাচীন পরিচয়ে যে প্রাথমিক সত্য আছে তাকে গ্রহণ করে লোচনের জন্মবৃত্তান্ত ইত্যাদির পরিচয় গুলি উপস্থাপিত করছি। দক্ষিণ রাঢ়ের রাগ সংগীত চর্চার ধারাবাহিকতার প্রমাণ ধরে দেখা যাচ্ছে, লুইপাদের গ্রন্থে এবং তার পরের পর লোচন পণ্ডিত, জয়দেব, রমাই পণ্ডিত, বড়ু চণ্ডীদাস প্রভৃতি ব্যক্তিদের গ্রন্থস্থিত রাগসমূহের মধ্যে অধিকাংশ রাগের পরস্পর মিল আছে, এবং সেগুলি আমাদের ঘরাণায় আদিকাল থেকে এবং ধ্রুপদাদি গানের মধ্যেও প্রচলিত আছে। পূর্ব্বাপর যোগাযোগের সম্পর্কের নিদর্শন ধরে এই বিশ্বাসে সত্য নির্ভর হতে হয়, লুইপাদ, লোচন, জয়দেব, রমাই পণ্ডিত, প্রভৃতি মহান ব্যক্তিদের সঙ্গীত চর্চা ও শিক্ষার ধারা দক্ষিণ রাঢ় ভূমের সঙ্গীতসংস্কৃতি কেন্দ্রের একই মূল থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল।

এই তথ্যের উপর বিশ্বাস রেখে এবং এ বিষয়ে বহু বৎসর ধরে অনুসন্ধানে প্রবৃত হয়ে লোচনের পরিচয় সম্বন্ধে যে সত্য আমার কাছে ধরা দিয়েছে তাতে এই সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়ার ভরসায় দেখতে পাচ্ছি, লোচন পণ্ডিত, রমাই পণ্ডিতের বংশেরই এক উর্দ্ধতন শাখা বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বিষয়ের আর এক সংবাদে সম্প্রতি জেনেছি, বিষ্ণুপুর হতে পাঁচ মাইল দূরত্বের পূর্ব দিকে ব্যাসদেবপুর নামক গ্রামে এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে নাকি উক্ত গ্রামের আদি নাম লোচনপুর বলে লেখা আছে। খোদিত অক্ষরের পাঠোদ্ধার করে এই বিস্তৃত অঞ্চলের প্রাচীনতত্ত্ব অনুসন্ধানবিদ্ শ্রীমাণিক লাল সিংহ আমাকে বলেন, শিলালিপি দেখে এই মনে হয় ওই গ্রামের নাম লোচন পণ্ডিতের নামেই প্রচারিত হয়েছিল।

কেউ যদি মনে করেন বিষ্ণুপুরের এত নিকটে যদি লোচনের বাসগৃহ ছিল তাহলে বিষ্ণুপুরের সংগীত পরিচয়ে তাঁর কোন নাম নেই কেন ?

এর কারণ, লোচন পণ্ডিত যে সময় কালের, তখন এবং তার বহু পরেও বিষ্ণুপুরের অস্তিত্বের কোন নাম পরিচয় ছিল না। তাছাড়া দেশের গৌরব-জনক এবং আদর্শমূলক মূল্যবান পরিচয়কে সংরক্ষণ করে রাখার কর্তব্যবোধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন তেমন কারোরই মধ্যে ছিল না। অর্থাৎ এই সব বিষয়ের ইতিহাস যে রাখতে হয়, এ ধারণা তখন ছিলই না বলা চলে। বিশেষ করে রাগসংগীতের চর্চার ক্ষেত্রে তো বটেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে লুইপাদের চর্য্যাপদ গ্রন্থটি যদি সংগ্রহ করে না আনতে পারতেন তাহলে লুইপাদের নাম এবং তাঁর রাগ সংগীত চর্চার প্রাচীনত্বের পরিচয় হয়ত অবলুপ্ত হয়েই থেকে যেত। তেমনি লোচনের গ্রন্থ উদ্ধার না হলে, রমাই পণ্ডিত প্রভৃতির এবং বড়ু চণ্ডীদাসের পুঁথি উদ্ধার না হলে ওই অবস্থাই হত।

আমাদের বংশে সংগীতচর্চারত ব্যক্তিদের নাম আমার থেকে ছয় পুরুষ পর্য্যন্তই জানা আছে। এমন কি ভারতের বিভিন্ন বড় বড় ঘরাণা হতে যে সব বড় বড় গায়ক বাদক প্রভৃতি বিষ্ণুপুর ঘরাণায় সংগীত বিতরণ করে গেছেন তাঁদেরও নাম সংগ্রহ করে রাখার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ এক অসম্ভব ক্ষতিকর অবহেলা।

লোচন পণ্ডিতকে ধরে আরো কিছু বলবার আছে। দক্ষিণ রাঢ়ের সংগীত সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের যে সমস্ত পরিচয় উপস্থাপিত করলাম, সেরূপ আর একটি প্রাচীন স্থান যথা গৌড়ের রাজধানীর প্রথম সময় হতে ওইরূপ ধারাবাহিকতার প্রমাণ পাইনি। বল্লালসেনের সময়েই তার গোড়াপত্তন বা চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল বলেই মনে হয়। খুব অনুসন্ধান না নিলে সঠিক করে বলা মুস্কিল।

বল্লালসেনের মাতুলালয় ছিল গড়মন্দারণের রাজপরিবারে। মল্লভূম অঞ্চলের দু'চারজন স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের মুখে শুনেছিলাম, লোচন পণ্ডিত গড়মন্দারণ রাজদরবারে ছিলেন। মাতুলরাজদরবারে লোচনের সঙ্গীত শ্রবণ করে বল্লালসেন মুগ্ধ হন এবং মাতুলের সম্মতি নিয়ে তাঁকে গৌড়ে নিয়ে যান।" খৃষ্টীয় ১১৬০ শতাব্দীতে বল্লালের রাজ্যপ্রাপ্তির সময়েই লোচন পণ্ডিত তাঁর 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পরিচয়ের উপর তাহলে বিচার করে বলা যায়, গ্রন্থরচনা তিনি বহু পূর্বেই করেছিলেন। সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা উদ্ধৃত পরিচয় সম্মত একথাও সত্য বলে বিবেচিত হবে যে, লোচন আরো যে সব সঙ্গীতের গ্রন্থরচনা ওই গ্রন্থের পূর্বে সমাধা করেছিলেন, তা গৌড়ে বসে হয়নি। লোচন যদি গৌড়েরই বাসিন্দা হতেন, তাহলে তাঁর সঙ্গীতের চর্চা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সেখানে আগে থেকেই থাকত। কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ের ইতিহাসে সে খবরের সন্ধান কিছুই পাওয়া যায়না এবং সেখানে তাঁর শিক্ষাগুরুর বা ঘরাণায়ও কোন পরিচয় নেই। যদি থাকত, তাহলে তাঁর 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থে সে সম্বন্ধে কিছু না কিছু উল্লেখ থাকতই। এবং আমরা তা জানতে পারতাম ক্ষিতিমোহনবাবুর বিস্তারিত প্রবন্ধের মধ্যে। যদি বলা হয়, লোচন, তাঁর পরিচয় গোপন রাখলেন কেন? এর যথাযথ উত্তর দেওয়া খুব শক্ত। তবে দেখা যায়, সঙ্গীতগ্রন্থরচয়িতারা তাঁদের গ্রন্থে নিজের পরিচয় রাখা আবশ্যক মনে করেন না। এজন্য বেশ কিছুকাল পরে তাঁদের জন্মবৃত্তান্তাদি নিরাকরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সেই অসাধ্য সাধনের জন্য যদি দূরদৃষ্টি দিয়ে সম্ভাব্য তথ্যের উপর বিচারবুদ্ধিকে নিয়োগ করা যায়, তাহলে আমি মনে করি, এইসব বিষয়ের সত্য নির্ণীত হয়ে যেতে পারে। পরিচয় না রাখার দৃষ্টান্ত অনেক ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতির মধ্যেও আছে রচয়িতাদের ভনিতা না থাকায়।

লোচনের বংশ উপাধি পণ্ডিত থাকায়, মল্লভূমই যে তাঁর জন্মস্থান একথা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে। লুইপাদ হতে প্রবর্তিত ধর্মঠাকুরের পূজাদির ভার যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের পদবী দেওয়া হয়েছিল পণ্ডিত। সেই থেকে এখনও পর্য্যন্ত যাঁরা ধর্মঠাকুরের পূজা করে আসছেন তাঁরা, এবং তাঁদের বংশের সকলেই নামের শেষে পণ্ডিত বলে পরিচিত। বিষ্ণুপুরের শাঁখারী-বাজারে এইরকম একটি ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে। এই দেবতার অব্রাহ্মণ পূজারীবংশ, উপাধিতে পণ্ডিত নামে পরিচিত। একমাত্র উক্ত পূজার ক্রিয়াকর্ম নিয়েই এইরূপ উপাধি চলে আসছে। উপাধির এইরকম পরিচয়, ওই ঠাকুরের পূজাধিকারীরা ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়ের উপর দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং, লোচনের নামের শেষে এই পণ্ডিত উপাধি থাকায়, তাঁর জন্মস্থান নির্দ্ধারণে মল্লভূমের উপরই গুরুত্ব পাচ্ছে। আগেই বলেছি শূন্যপুরাণ রচয়িতা রমাই-এর বংশ পদবীও পণ্ডিত। তাঁর গ্রন্থের রাগ-তাল সম্বলিত পদাবলীর প্রতিপাদ্য বিষয়ও মূলতঃ ধর্মঠাকুরকে নিয়েই।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা—লুইপাদকে ধরে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন এই মল্লভূমেই বিশেষ করে দেখতে পাওয়া যায়। আমার খুব বিশ্বাস, লুইপাদও দক্ষিণ রাঢ় তথা মল্লভূমেরই মানুষ ছিলেন। ধর্মপূজা সম্পর্কে একটা কথা,—এই পূজায় জাতিত্বের বিচার নেই। উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণ, সব শ্রেণীর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মানুষরাই এই ঠাকুরের পূজা করতে পারেন। দেবতা নিয়ে জাতিভেদ থাকা যে অনুচিত, তার এটি একটি বিরাট ও মহান দৃষ্টান্ত।

জাতিগত পণ্ডিত উপাধির এইসব প্রমাণ পরিচয় পেয়ে আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্যরূপে এই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই পদবীর উৎপত্তি যে কারণের উপর, সেই কারণের উপরই লোচন পণ্ডিতের পণ্ডিত উপাধির পরিচয়টি সুস্পষ্ট। প্রায় সকলেই জানেন, সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করলে, উপাধিরূপে নামের পূর্বেই পণ্ডিত কথা ব্যবহার হয়, পরে নয়। একমাত্র পাঠশালার শিক্ষকদের নামের পরে পণ্ডিত বলে ডাকা হত এবং হয়ত এখনও হয়। এই সম্বোধন দিয়ে ডাকার সঙ্গে রমাই পণ্ডিত ও লোচন পণ্ডিতের পণ্ডিত পদবীর কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। উক্ত পদবী গ্রহণ সম্পর্কে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হল, তাতে লোচন পণ্ডিতকে মল্লভূমবাসী বলে স্বীকার করতে পারা যায় কিনা, দৃষ্টিবান তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিচার বিবেচনা করে দেখবেন।

আগেই জানিয়েছি, আমাদের দেশে অনেক প্রাচীন বিষয়ের সঠিক পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে, তার সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রচারের মূল সূত্র ধরে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণমূলক বিবরণ পাওয়ার একান্ত অভাব থেকে গেছে, বিশেষ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। সঙ্গীত গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে অনেকের গ্রন্থেও তাদের জন্মস্থানের পরিচয়াদি পাওয়া যায়না, যেমন লোচনের গ্রন্থে।

পূর্ব প্রসঙ্গের ওপর একটা প্রশ্ন আসতে পারে—আটশ' পঞ্চাশ বছর আগে লোচন পণ্ডিতের দ্বারা গৌড়ের রাজধানীতে কি সঙ্গীতচর্চার প্রাচীন পরিচিতির পীঠস্থান ও কেন্দ্র গড়ে উঠত না? এর উত্তরে আমার মনে হয়, তিনি যদি সুযোগ সুবিধা পেতেন এবং সেখানে এর ক্ষীণকায় ধারাও থাকত, তাহলে শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত চর্চার সহজ পরিচয়ে বিষ্ণুপুরের পুরোভাগেই তার স্থান থাকত। কিন্তু সে পরিচয় না থাকায় এই কথাই বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে যে, লোচনপণ্ডিত শুধু দরবার গায়করূপেই সেখানে ছিলেন।

তাঁর বংশ পরম্পরারও কোন পরিচয় সেখানে ছিলনা; থাকলে সেই পরিচয়ের প্রেরণায় সঙ্গীতচর্চার ধারাকে প্রবাহিত করে রাখার প্রচেষ্টা করে যেতে তিনি নিশ্চয়ই অবহেলা করতেন না। এই দিকটার বিচারেও পূর্বপ্রদত্ত জন্মস্থানাদি নিরাকরণের পথ সুগম করছে। অর্থাৎ গৌড়রাজধানীতে তিনি একাই ছিলেন পরিবারবর্গকে স্বদেশে রেখে। তারপর তাঁর গৌড়েই বা নিজ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রামে মৃত্যু ঘটে এবং বহুকাল পরে তাঁর নিজগ্রাম থেকে কিংবা প্রদ্যুম্নপুর রাজের নিকট সংরক্ষিত হয়ে থাকার সময় গ্রন্থটি উধাও হয়ে যায়,—তখনকার রাজার উত্তর প্রবেশাগত কোন সংগীতপ্রিয়-কুটুম্বের দ্বারা। কোন প্রকারে গ্রন্থের কথা তাঁর কানে পৌঁছে গেছল। সেই ব্যক্তি পরিচয়ের সন্ধান পেয়ে হয়ত লোচনের গ্রামেও গিয়ে থাকবেন। এই মন্তব্যের গুরুত্ব আছে, কারণ ক্ষিতিমোহন বাবু বলেছেন খৃঃ ১৬৬৭ সালের কাছাকাছি উক্তগ্রন্থ উধাও হয়ে গেছল এলাহাবাদের নিকট কোন গ্রামে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে সময় এই গ্রন্থ উধাও হয়েছিল তা বল্লালসেনের রাজ্যপ্রাপ্তির সময় থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর পরে। গৌড় থেকে এতকাল পরে তাঁর গ্রন্থ উধাও হয়ে গেল— একি কখনও সম্ভব ? এলাহাবাদ অঞ্চলের লোকেরা উক্ত গ্রন্থের পরিচয় কি করে পেতে পারে, এবং তার উপর আকর্ষণের এত বড় রকমের গুরুত্ব ও মূল্যের কথাই বা তারা আগে থাকতে বুঝতে পারল কি করে, যার জন্য তারা ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দের সময় গৌড়ে গ্রন্থটি চুরি করে নিয়ে গেল ? সুতরাং সব দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে আমি লোচন সম্বন্ধে যে পরিচয় তথ্য প্রদান করলাম তা সত্য বলে গ্রহণযোগ্য হবে এই আমার বিশ্বাস।

লোচন পণ্ডিত সম্বন্ধে এত বিস্তৃত আলোচনা করবার আবশ্যক হল, এইজন্য, তাঁকে এবং তাঁর গ্রন্থকে পেয়ে বাংলাদেশে শাস্ত্রীয়সংগীত চর্চার প্রাচীন পরিচয়ের ওপর মস্তবড় নিদর্শন সৃষ্টি করে আমাদের গর্ব্বান্বিত করেছে ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কবি জয়দেব

দক্ষিণ রাঢ়ভূমের মধ্যে বিশেষ করে মল্লভূমের প্রথম পরিচয়ের সময় থেকে রাগসংগীতচর্চার যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছি, সে সময়ের অনেক পরেও অর্থাৎ উক্ত কবির সময়েও বীরভূমের কোন স্থানে প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ কোন দিক দিয়েই রাগসংগীত চর্চার-সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই এই স্থানে কবি জয়দেবের বংশ পরিচয়ের উপর সংগীত শিক্ষা সম্বন্ধে যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তথ্য পেয়েছি এবং তার মধ্যে যে সব যুক্তি রয়েছে সেগুলি এখন উপস্থাপিত করছি।

বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের অধ্যাপক শ্রীপুলীনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন জয়দেবের পরিচয় সম্বন্ধে তাঁর পূর্বপুরুষ থেকে সংগৃহীত সংবাদে জানালেন—"জয়দেব আমাদেরই পূর্বপুরুষের বংশসন্তান ছিলেন। জয়দেবের এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিল,—সেই ভাইএরই বংশধর আমরা। জয়দেব ভক্ত-সাধকের পর্য্যায়ে উপণীত হওয়ার পর উপাধিতে গোস্বামীরূপে পরিচিত হন। তাঁর বিগ্রহ ৺শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ আমাদের বাড়ীতে বছরে ছ'মাস থাকেন, বাকী ছ'মাস কেন্দুবিল্লগ্রামের (বীরভূম) মন্দিরে পূজিত হন। আমাদের আদি বসবাস বা জন্মস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ সীমানার বেল্‌গা-তগিপুর নামক গ্রামে। তারপর আমার থেকে ছ'পুরুষ আগের শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বশুর সম্পত্তি লাভ করে দুর্গাপুরের নিকটবর্তী ধবনী গ্রামে চলে আসেন। দামোদর নদের বন্যা প্রকোপও স্থানত্যাগের অন্যতম কারণ ছিল। পূর্বে বহুকাল ধরে প্রথমোক্ত গ্রামেই পূর্বপুরুষরা বসবাস করেছিলেন। এখন ধবনী গ্রামই আমাদের জন্মস্থানের পরিচয় জ্ঞাপক স্থান বা দেশ।

জয়দেব তাঁর পিতার দ্বারা ক্রয় সম্পত্তি পেয়ে কেন্দুবিল্ল গ্রামে চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

তিনি বাল্যকালে আমাদের সেই আদি বাস্তগৃহের গ্রামে যখন ছিলেন তখন থেকেই সংগীত-প্রিয় হয়ে ওঠেন এবং কোন এক সংগীতজ্ঞের কাছে তাঁর সংগীত শিক্ষা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে এ কথাও শুনা যায়, তিনি এই শিক্ষালাভ করেছিলেন মল্লভূমেরই কোন একস্থানের সংগীতজ্ঞের কাছে। এই সমস্ত পরিচয়ের বিবরণ বিশেষ করে আমি আমার জেঠামহাশয় শ্রীপতিচরণ মহাশয়ের কাছে শুনেছি, আপনি যদি আমার সংগে আমাদের গ্রামে যেতে পারেন তাহলে আমার প্রদত্ত বিবরণ যে অতিসত্য তার প্রকৃষ্ট সমাধান পেয়ে যাবেন তাঁর কাছে।"

আমি পুলীনবাবুকে বলেছিলাম, এতবড় জ্ঞাতব্য সংবাদ আপনারা প্রচার করেননি কেন? উত্তর দিলেন—'কিছুকাল আগে এক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কিভাবে জানতে পেরে আমাদের গ্রামে গিয়ে জেঠামহাশয়ের কাছে এই বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ করে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের নিজেদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তরফ থেকে পরিচয় জ্ঞাপন আর হয়ে উঠেনি'।" বললাম, এও এক নিদারুণ ঔদাসীন্য। আপনার মত বিদ্যান ও যোগ্যব্যক্তি যদি অতবড় মহান সাধক-কবির যথার্থ পরিচয়কে অপ্রকাশ রাখতে পারেন, যার মধ্যে আছে আপনাদের বংশগৌরব, তাহলে আগেকার মানুষদের বংশপরিচয় ও ইতিহাস সংরক্ষণে অবহেলা ও উপেক্ষায় আশ্চর্য্য হবার কি আছে, পরিতাপ করা ছাড়া।

জয়দেবের সংগীত শিক্ষা বিষয়ে যে খবরটুকু পেলাম, তাতে দেখা যাচ্ছে, বর্দ্ধমান জেলার ওই অঞ্চলবর্তী স্থানসমূহে সংগীতজ্ঞ থাকা ও চর্চার বিকাশ যে ঘটেছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত কবির আদিগ্রাম বেলগা-তগিপুর থেকে বাঁকুড়া জেলার সম্পর্ক অতি নিকট, ব্যবধান কেবল দামোদর নদ মাত্র। তখন উক্ত সমস্ত অঞ্চলই মল্লরাজাদের অন্তর্গত ছিল বলেই জানা যায়। যাতায়াতের সহজ সুযোগ থাকায় তাঁর পক্ষে মল্লভূমের কোন সঙ্গীতজ্ঞের কাছে শিক্ষায় বাধা সৃষ্টি করেনি। অনুসন্ধানের চিন্তাদৃষ্টি প্রসারিত করে একথাও মনে উদয় হয়, জয়দেবের বংশ আমাদেরই বংশের কোন একটি শাখা। তাই সংগীতের প্রভাব তাঁর মধ্যে সহজভাবেই এসেছিল। শাণ্ডিল্যমুনির সন্তান থেকে যে দু'জনের দ্বারা বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সৃষ্টি, তাঁরা হলেন রত্নেশ্বর ও দাশরথি (দাস বাড়ুজ্যে)। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্রেই একই বংশের সন্তান। তাই একথাও মনে হয়, জয়দেবের সংগীতশিক্ষা ও তার চর্চা আমাদের বংশের সে যুগের কোন সংগীতজ্ঞের কাছে হওয়া এবং জয়দেবের বংশের সংগে আমাদের বংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা কিছু আশ্চর্য্যের নয়।

জয়দেবের জন্ম পরিচয়াদি বিষয়ে যাঁরা অন্যমত পোষণ করেন, তাঁরা আমার প্রদত্ত বিবরণ সত্য কিনা তা উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট কিংবা উক্ত গ্রামে গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বড়ু চণ্ডীদাস

মল্লভূমে রাগসংগীতচর্চার উপর আর একটি পরিচয় আছে প্রাচীনত্বের স্থানে বিশেষভাবে অবস্থিত হয়ে। চর্চাকারী ব্যক্তি হলেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এঁর আবির্ভাব ঘটে, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে। এঁর রচিত বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে তেত্রিশটি রাগ ও অনেকগুলি তাল সংযোজিত হয়ে আছে। এই প্রকাশিত গ্রন্থ পাওয়ার অসুবিধে নেই। এতগুলি রাগ তালের উপর চর্চার পরিচয় রাগসংগীতের বিশেষ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার এক বিরাট নিদর্শণ হয়ে আছে। কিন্তু এখন ওই গ্রন্থস্থিত অনেকগুলি রাগ ও তালের পরিবেশন পরিচয় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, আগেকার ভজন-সাধন উপযোগী বিবিধ-ভাবে রচিত রাগ সংগীতের গানও। এর কারণে মনে হয়; ধ্রুপদাদি গান আসার পর তার নূতনত্বের নূতন রসাস্বাদে এবং তার সংগে অলংকরণ ঐশ্বর্য-সমূহ আকৃষ্টকর হওয়ায় পুরাতনের সৃষ্টি সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করে রাখার উপর কর্ত্তব্যে অবহেলা এসে গেছল। এখন যেমন ধ্রুপদের মত রাগসংগীতের এত বড় বস্তুও অনাদৃত হয়ে খেয়াল গানের আধিপত্য এসে গেছে ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিল্পকলার উৎকর্ষের মুলে রাগ সঙ্গীতের প্রভাব

মহান চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কাছে একজন চিত্রাঙ্কন বিদ্যা-শিক্ষার জন্য গেছল, অবনীবাবু তাকে বলেছিলেন, অন্তরে বিশুদ্ধ সংগীতের প্রভাব আছে ? গলায় সুর ভাঁজতে পার ? চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী হতে হলে রাগসংগীতের প্রভাব থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ছেলেবেলায় শুনতাম উচ্চাঙ্গ সংগীত ভাল না বাসলে তাকে ভদ্রলোক বলত না। এই দুইটি মন্তব্যের মধ্যে প্রকৃত সত্য আছে।

বিবিধ শিল্প কলার উৎকর্ষের মুলে অনস্বীকার্য্য রূপে রাগসংগীতের প্রভাব থাকে। তাই দেখা যায় যেখানে রাগরূপের উপর বিশুদ্ধ সংগীতের সুর প্রবাহিত হয়ে চলতে থাকে সেখানের জনগণের মন সংগীতময় হয়ে রাগরূপের চিত্রসমূহ মনের অগোচরেও অঙ্কিত হয়ে যায়। এবং তারপর থেকে বিভিন্ন শিল্পকলার উৎকর্ষ কামনার প্রেরণা জাগায়। রাগরূপের বিভিন্ন মূর্ত্তি সেইসব শিল্পচর্চারত ব্যক্তিদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে বহির্ভাগে শিল্পচাতুর্য্যের বিবিধ কৌশল এনে দেয়।

এমনি এক বিরাট নিদর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চশত বৎসর পূর্বে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমাংশে। সেখানে সুবৃহৎ সংস্কৃতি কেন্দ্রের বহু নিদর্শন মনে হয় এখনও আছে। সেখানে বহু নর-নারীর সঙ্গীতরত ও নৃত্যরত মূর্ত্তিতে অপূর্ব শিল্প চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাছাড়া এক বৃহৎ শিলালিপির তলদেশে উক্ত সন তারিখ লিখিত ছিল। ওই শিলালিপি এবং কয়েকটি অপরূপ মূর্ত্তি কয়েক বছর আগে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ রাঢ়ের বাঁকুড়ার সন্নিকট শুশুনিয়া পাহাড়ের সানুদেশে এবং তৎপার্শ্ববর্তী পুখন্না গ্রামের (পূর্বনাম পুষ্করণ) বিখ্যাত বর্মন রাজা সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার কীর্ত্তিগুলির নিদর্শন ইতঃস্তত ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এইসব প্রাচান শিল্পকলাদি চর্চার মূলে বিশুদ্ধ সঙ্গীতেরই যে প্রভাব থাকে সে কথা আগেই বলেছি এবং এ কথা বহু মহান ব্যক্তিরা এবং রোম ও গ্রীসের প্রাচীন বড় বড় মনীষীরাও বলে গেছেন তাঁদের গ্রন্থে।

সুতরাং প্রমানিত হচ্ছে, দক্ষিণ রাঢ়ে বিশুদ্ধ রাগ সংগীতের চর্চা বহু শতাব্দী হতে অবিচ্ছেদ গতিতে চলে আসছে। এরূপ পরিচয়ের তুলনা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই এই আলোচনার এক স্থানে লিখেছি, বোধহয় এই রাঢ় অঞ্চলে আর্যদের দ্বারা সামগানের মাধ্যমে রাগ সংগীতের চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। কেন লিখলাম তার প্রমাণে দেখিয়েছি হাজার বছর আগে লুইপাদের রাগ সংগীত শিক্ষার আচার্য যিনি ছিলেন, আবার তার গুরু, এই রকম ভাবে ধারাবাহিক আচার্য্যদের শেষ পরিচয় কোথায় গিয়ে মিশেছে সে কথা ভাবতে গেলে উল্লেখিত সঙ্গীত কেন্দ্রের কথাই বিশ্বাস যোগ্য রূপে মনে করিয়ে দেয়।

লুইপাদ তাঁর চর্য্যাপদের রাগ-তাল গুলি নিজেই সৃষ্টি করেছিলেন একথা মনে করাই চলেনা, কারণ সেই রাগ-তাল গুলির মধ্যে অনেক গুলিই প্রাচীন শাশ্বত রাগ। তাছাড়া সৃষ্টি শক্তি থাকলেও সেই শক্তি লাভের জন্য গুরু থাকতে হয়॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধ্রুপদাদি গানের সৃষ্টিতত্ত্ব

সংগীতের যে যে বিষয়ের উপর বিষ্ণুপুর ঘরানার পরিচয় এল, যথা— ধ্রুপদাদি গান, রাগসংগীতের অন্য সমস্ত শ্রেণীগত বস্তু, বহুবিধবাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তা কোন্ সুযোগের মাধ্যমে অধিগত হয়ে বিপুল চর্চার উপর সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে ঘরাণা, কেন্দ্র ও পীঠস্থান রূপে প্রতিষ্ঠিত হল তার সঠিক ইতিহাস কেউই অবগত নন। একথা ভূমিকা পৃষ্ঠায় জানিয়েছি।

এখানের ঘরাণা ইতিহাস যে একজন বিখ্যাত সঙ্গীত গুণীর দ্বারা লিখিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে, তাকেই প্রায় সকলে সঠিক মনে করে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এমন কি পরবর্ত্তী কোন কোন লেখক বিষ্ণুপুর ঘরাণার পরিচয় রাখতে গিয়ে সেই তাঁর দেওয়া ইতিহাসকেই উদ্ধৃত করেছেন। বড় বড় ব্যক্তিরাও সভা সমিতিতে বিষ্ণুপুর ঘরাণার উদ্ভব সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে ওই প্রদত্ত ইতিহাসে যে সংবাদ আছে তাই জানিয়ে দেন। ইতিহাস লেখক অভ্রান্ত, এই বিশ্বাস রেখে, প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। এই রকম অনেক বিষয়েই আমরা অনায়াসে সস্তা অভিজ্ঞতা নিয়ে চলি।

যাইহোক, কিন্তু ঘরাণা সৃষ্টিতত্ত্বের তাঁর দেয় পরিচয়টি বাস্তব ভিত্তিক যে নয়, কল্পনাপ্রসূত, সে খবর আমাদের বংশের দু'চারজন ছাড়া আর কেউই জানেন না। আমি জেনেছিলাম বর্ত্তমানের ১৯৭৬ সাল হতে প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে।

যিনি এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তিনি আমার সঙ্গীত গুরু মেজকাকা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন,—"আমাদের ঘরাণা পরিচয় না থাকার জন্য মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছিল, অনেকেই উন্নাসিকতা দেখিয়ে বলতেন, "বিষ্ণুপুর ঘরাণার কোন কৌলীণ্য মর্য্যাদা নেই, তাই আমি তানসেন বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে বাহাদুর সেন নামসৃষ্টি করে মল্লমহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথের দ্বারা উক্ত গায়ককে আনিয়ে বিষ্ণুপুর ঘরাণার সৃষ্টিপরিচয় স্থাপিত করি। তারপর থেকেই এই ঘরাণার প্রতি বেশ শ্রদ্ধা এসেছে...।" আমি এই কথা শুনে খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, যে দেশে গদাধর, রামশঙ্কর, যদুভট্ট, নিতাই নাজির, বৃন্দাবন নাজির এবং আমাদের বংশের পূর্বতন ব্যক্তিদের মত বিখ্যাত গায়ক গুণী সৃষ্টি হয়েছে, সেই পরিচয়ই কি সব চেয়ে বড় পরিচয় নয়? তাঁরাও তো গুরু পরম্পরারই শিষ্যছিলেন! নায়ক গোপাল, বৈজু, তানসেন, এঁদের ঘরাণার পরিচয় আমাদের কাছে কি প্রমাণ নিয়ে আছে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাই হোক—আমি মনে মনে স্থির করলাম-বিষ্ণুপুর ঘরাণার সৃষ্টি কি ভাবে, কোন্ উপায়ের মাধ্যমে হয়েছিল তার তথ্য আবিষ্কারের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করতেই হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমতঃ পিতামহের সান্নিধ্যে এসে জানতে চাইলাম তিনি এই বিষয়ের সত্য পরিচয় জানেন কি না।

তাঁর কাছ থেকে পেলাম প্রকৃত ইতিহাস, যা পূর্বপুরুষ থেকে পরিচয়ের মাধ্যমে এবং নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতাতে তাঁর নিকট সংগৃহীত হয়েছিল। পিতামহের তখন কার বয়সের চেয়েও অনেক বেশী বয়সের ব্যক্তিদের কাছেও যাই, তাঁদের এ সম্বন্ধে যদি কিছু জানা থাকে এই আশায়। তাঁদের কাছে যা পেলাম তাতে বেশ বুঝলাম পিতামহের দেওয়া পরিচয়ের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। তারপর কোলকাতার আহিরী টোলায় থাকতেন সঙ্গীত বিশারদ নীল মাধব চক্রবর্ত্তী, তাঁর সংগে দেখা করি। এই চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য গদাধর চক্রবর্ত্তীর নাতি এবং মহারাজা স্যার জ্যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গীত গুরু ছিলেন।

আমি যখন ১৯২৪ সালে মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুরের কাছে গায়ক ও যন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হই, তখন উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বয়স চুরাশীর মত। সে দিন তার কাছেও ঘরাণা ইতিহাস সম্বন্ধে যে কথা শুনলাম তাতে পেলাম আগের সংগ্রহের সংগে হুবহু মিল। এই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আশ্রয়ে থেকে আল্লাউদ্দীন খাঁসাহেব গান সেতার ও এসরাজ বহু দিন ধরে শিখে ছিলেন। একথা খাঁসাহেবও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন,—যখন তিনি আমার কলিকাতাস্থ বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রিটের বাড়ীতে গিয়েছিলেন পুত্র আলি অকবরকে সংগে নিয়ে। খাঁসাহেব সকলের সাক্ষাতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন "এঁরা হচ্ছেন আমার গুরু বংশ এবং গুরুর তুল্য।" যাক এসব কথা, আমি পিতামহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বহু পশ্চাত থেকে ঘরাণা সৃষ্টির এতবড় পরিচয় মেজকাকা কেন আপনার কাছে জেনে নিলেন না?

উত্তরে বললেন,-'তা কি করে জানব! গোপেশ্বরের ইতিহাসটি আমি পড়িনি, তোমার কাছেই শুনলাম। আমি বলেছিলাম, ঘরাণা ইতিহাসের সৃষ্টি তত্ব যে ভাবে উদ্ভুত হয়ে ক্রমশঃ এত বিরাট পরিচয়ে এসেছে সর্ব শ্রেষ্ঠ ঘরাণা সম্পদের নজীর হিসেবে, সেই পরিচয় অপ্রকাশ রেখে কাল্পনিক পরিচয়ই থেকে যাবে? তিনি বলেন,—"সবই বুঝি, কিন্তু ইতিহাস লেখকের সংগে তোমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে বিরাট সম্পর্ক, সেই দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকতেই হবে।" আমি বলেছিলাম, সব কিছু শুনে এবং বিচার করে আমার অন্তরের ন্যায়, ধর্ম ও বিবেক বলছে, এত বড় সৃষ্টিতত্ত্বের ঘরাণা সত্যকে প্রকাশ না করার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই, বরং দ্বিধাহীন হয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে কর্ত্তব্য পালনই বড় কথা। তিনি বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত নিয়োনা, ব্যাপারটা খুবই গুরুতর।

আমিও ভাবলাম অপেক্ষা করে দেখি, ইতিহাসের এই ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় কিনা, কিন্তু মাথা ঘামালেইবা কি হবে, সৃষ্টি তত্ত্বের আসল পরিচয় ও সংবাদ উদ্ধার করতে কে পারবে ?

সুতরাং ঘরাণা ইতিহাসে যে বিস্ময়কর ও বিরাট পরিচয় আছে তাকে প্রকাশ করার মহান দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে, এই ভেবেই আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে বাধ্য হলাম।

আমার লেখা ইতিহাসের সবকিছু সংবাদ শুনে অনেকেই বলে ছিলেন, আমি যখন প্রকৃত ইতিহাসটি ছাপাব তখন যেন আগের ইতিহাসটির অন্ততঃ প্রারম্ভিক পরিচয়টি উদ্ধৃত করে দিই। তাঁদের এই মন্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব আছে বুঝলাম। তাই জানাতেই হল। সেই ইতিহাস এইভাবে সুরু হয়েছে, যথা—"যে সময় একমাত্র পা-এ হাঁটা রাস্তায় দিল্লী পৌছতে তিন মাস সময় লাগত, সেই সময় অর্থাৎ খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে মল্লমহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ লোক পাঠিয়ে দিল্লী থেকে তানসেন বংশধর নামে খ্যাত মস্তবড় ধ্রুপদ গায়ক বাহাদুর সেনকে মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন ধার্য্য করে নিয়ে এসে বিষ্ণুপুরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চ্চার গোড়াপত্তন করেন। তারপর তাঁর অবর্ত্তমানে প্রধান ছাত্র গদাধর চক্রবর্ত্তী রাজ দরবারে গায়নাচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন......।"

লেখক মহাশয় রঘুনাথ সিংহের রাজত্ব করার কাহিনী যদি জানতেন তাহলে এই ভাবে লেখার পরিকল্পনা আসত না। দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ মাত্র আট বছর রাজা হয়ে থেকে তার মধ্যেই লাল বাঈ ঘটিত ব্যাপারে তাঁকে নিহত হতে হয়। এই আট বছরের প্রথম থেকে যুদ্ধে ও বিদ্রোহাদি দমনে তাঁকে সর্বদা নিযুক্ত থাকতে হয়েছিল। এই রকম নানান বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে গেছে তাঁর জীবন। সে সময় ধ্রুপদ সঙ্গীতকে নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা মনে জাগ্রত হবার কথাই নয়। তাছাড়া সে গানের গায়কীপদ্ধতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেমন, শুনতে কিরূপ ভাললাগে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা না রেখেই লোক পাঠালেন পা'এ হাঁটিয়ে পাইক-পিয়াদার মত মানুষকে, সেও তেমনি অভিজ্ঞ, পাঁচশ' টাকা মাইনে ধার্য্য করে নিয়ে এল বাহাদুর সেনকে! এর বেশী আর এ বিষয়ে প্রশ্ন আনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ, লেখক মহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন কল্পনার কথা। তিনি যদি কল্পনাটিকে এই রকম ভাবে খাড়া করতে পারতেন, যথা—মল্লরাজারা দিল্লীশ্বরের মিত্র রাজ্য রূপে থাকায়, যে সময় পাঠান সেনাপতি কোতলুখাঁকে দমন করবার জন্য সম্রাট আকবর্ তাঁর প্রধান সেনাপতি মানসিংহকে পাঠান, তখন তিনি এসে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে সেনানিবাস স্থাপন করেন। সেই সময়কার মল্লমহারাজ, সেনাপতি মানসিংহের সংঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিপুল সম্বর্দ্ধনা সহকারে বিষ্ণুপুর রাজদরবারে নিয়ে এসে বিবিধ ভাবে আপ্যায়ন করেন। তাঁকে রাজদরবারের গায়ক-বাদকদের সঙ্গীতও শুনান হয়। মানসিংহ তানসেনের পরিচয় দেওয়ায় মল্লরাজ খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন ওই ধ্রুপদ গান জানা বিশেষ উপযুক্ত একজন গায়ককে পাওয়ার জন্য। মানসিংহ প্রতিশ্রুতি দেন এবং দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে তানসেনের প্রধান ছাত্র যথানামের ব্যক্তিকে বিষ্ণুপুর রাজ সমীপে পাঠিয়ে দেন শিবিকায় করে সংগে সিপাহী দিয়ে।" লেখা এইরকম হলে সবদিক দিয়েই ভালহত এবং সঙ্গত পরিচয় বজায় থাকত, তাছাড়া ঘরাণা সৃষ্টির পরিচয় চারশ বছরের অধিকই হয়ে নামের যথার্থতা বজায় থাকত। তবে ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই ॥

দশম পরিচ্ছেদ

সাক্ষাতে ইতিহাস জ্ঞাপন

আমার লিখিত ইতিহাসটি শুনিয়েছিলাম সঙ্কোচ সহকারে সঙ্গীত গুরুকে তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে। তিনি মনযোগ দিয়ে সমস্তটি শুনে বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে ছিলেন, তারপর মৌনভঙ্গ করে বলেন,—আমার বাংলা খেয়ালের বইটা লেখা হয়ে পড়ে আছে, বসুমতী পত্রিকার সম্পাদকের সংগে কথা কয়েছি, যদি ছাপানার ভার তাঁরা নেন তাহলে ইতিহাসের আসল বস্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যা এখন তোমার লেখায় পেলাম সে গুলি ওই গ্রন্থে প্রকাশ করব।" আমি খুব সন্তুষ্টচিত্তে চলে আসছিলাম, তখন ডেকে আবার বললেন, "যদি আমার দ্বারা পরিবর্ত্তন করা আর না ঘটে উঠে তাহলে তুমিই এর ভার নেবে। তোমার মত সংগ্রহের দ্বারা আসল ইতিহাস লেখাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু মনের ভুলে পরিচয়টাকে বড় করে তুলে ধরতে গিয়ে ছোটই হয়ে গেছে।" তাঁর শেষের কথা গুলো আমাকে খুব বিচলিত করে দিয়ে ছিল। মনে হয়েছিল থাক তার দরকার নেই গুরুকে এমনভাবে প্রকাশ্যে নামানর। কিন্তু পরক্ষণেই বিবেক যেন শাসন মুখি হয়ে বলতে লাগল 'এটা তোমার দুর্বলতা, কর্ত্তব্যে বিচলিত হবে কেন? ভুল হতে পারে কিন্তু গুরুতো কর্ত্তব্যই করতে গেছেলেন, তুমি তাঁর শিষ্য ভুল সংশোধন করবার তোমার দায়িত্ব আছে, যখন তোমার কাছে সমস্ত সত্য সমুপস্থিত হয়েছে। এবং গুরু অনুমতিও দিয়েছেন।'

আমাদের বংশের এক বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এই বিষয় শুনে বলোছলেন, 'এ-নিয়ে তার ঘাঁটা ঘাঁটি করে দরকার নেই, ইতিহাস কল্পিত হলেও যখন তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন তাই থেকে যাক্।' চতুর্দিকেই নিরুৎসাহ। কিন্তু এই অভিপ্রায় শুধু আমার কাছেই নয়, যে সব বিশিষ্ঠ ব্যক্তিরা আমার লেখা ইতিহাস শুনেছিলেন, তাঁদের কাছেও খুবই অনভিপ্রেত, অনুচিত ও কর্ত্তব্য পালনে প্রতিরোধকর মনে হয়েছিল। স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে অবশেষে একান্ত কর্ত্তব্য বোধে আসল ইতিহাস আমাকেই প্রচার করতে হল। গুরু যদি এই সংশোধনের কাজ করে দিয়ে যেতে পারতেন তাহলে আমার পক্ষে সবদিক দিয়ে খুবই ভাল হত। তাঁর লেখার মধ্যে যে কথাটা মনকে খুব পীড়াদেয় তাহল, কল্পনার সাহায্যে বাহাদুর সেনকে আনার অত্যুগ্র কামনার জন্য তিনি আমাদের ঘরাণা বংশের ধারাবাহিক পরিচয়কে পর্য্যন্ত বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন, বাহাদুর সেনের শিষ্যপরম্পরার জের টেনে তাঁর পিতা অনন্তলালকেই সম্মুখে স্থাপিত করার জন্য ॥

ঘরাণার ইতিহাস

একাদশ পরিচ্ছেদ

আগে অনেক সাধু মহাত্মা ব্যক্তি ধ্রুপদগান সৃষ্টির পর সেই গান শিক্ষা করে তার আধ্যাত্মিক প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে সুরব্রহ্মের সাধনায় নিমগ্ন হয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকতেন। যেমন তানসেন গুরু হরিদাস স্বামী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী, স্বামী সত্যানন্দ, যুগরাজ, সুরদাস প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরিব্রাজক সাধুও থাকতেন।

তার মধ্যে স্বামীসত্যানন্দই আমাদের ঘরাণায় ধ্রুপদ গানের প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা। ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে আসার মত তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। তা কি ভাবে, সেই পরিচয় দেওয়ার মধ্যেই আছে প্রকৃত ইতিহাস পরিচয়ের প্রথম অংশ ধ্রুপদাদি গানের উপর। সে আজ (১৯৭৬) সাল থেকে প্রায় ছ'শ' বছর আগে। এক পরিব্রাজক সঙ্গীতজ্ঞ সাধু মহারাণী অহল্যাবাঈ রোড ধরে শ্রীক্ষেত্র ধামে যাবার পথে মল্লভূমের সীমানাভুক্ত একগ্রামে উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন কিয়ৎদূরে প্রদ্যুম্নপুর নামে এক রাজধানী আছে এবং কথা প্রসঙ্গে সেখানের রাজার কাছে সঙ্গীতজ্ঞ থাকার কথাও শুনেন। সঙ্গীতের চর্চা কি রকম হয় তা জানার আগ্রহ নিয়ে সেখানে রওনা হন। সেখানে প্রথমেই সাক্ষাৎ ঘটে তখনকার রাজদরবারে গায়কপদে থাকা আমাদের পূর্বপুরুষের সংগে। আমাদের সেই বংশধর এই পরিব্রাজক সাধুর সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় পেয়ে অতি শ্রদ্ধাসহকারে নিজগৃহে নিয়ে গিয়ে যথোপযুক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। পরে এক সময় তাঁর মুখে ধ্রুপদগান শুনে রাগরূপের অপূর্ব রচনাশৈলী ও ভাষার ভাবে মুগ্ধ হয়ে এই গানের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। নূতন পদ্ধতির এই গান শুনবার ব্যবস্থা করেন রাজ দরবারে। সেই আসরে রাজা প্রভৃতি সমগ্র শ্রোতারা সাধুর গানে অতিশয় আনন্দ পান। সকলের একান্ত অনুরোধে সাধু কিছুদিন সেখানে থেকে যান। আমাদের সেই পূর্বপুরুষ সবিনয়ে আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বামী-সত্যানন্দ—অর্থাৎ ওই সাধু আনন্দ সহকারে কয়েকটি আদি রাগের ধ্রুপদ শিক্ষা দেন। গানগুলির সবই নায়কগোপাল ও বৈজুবাওরার রচিত ছিল। তখনকার সময়ে রাগসংগীতকে ধরে বেদের স্তোত্র, এবং সংস্কৃতে রচিত যে সব গান গাওয়া হত তার কয়েকটি উক্ত সাধু শিখে নেন আমাদের সেই পূর্বপুরুষের কাছে।

এরপর থেকেই অল্প অল্প করে ধ্রুপদ গানের চর্চা এবং প্রচার প্রদ্যুম্নপুরে আমাদের বংশের গায়কদের দ্বারা হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, শ্রীক্ষেত্রধামে গমন কালীন আর একজন সাধু সঙ্গীতজ্ঞের দ্বারা অন্য এক স্থানে ধ্রুপদাদি গান চর্চার উৎপত্তির বিষয়। স্থানটি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হল বর্ত্তমানের পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত ঘোঙ্গানামে একটি গ্রাম। এখানে এক সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন সঙ্গীত প্রিয় সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি রাগ-সঙ্গীতকে ধরে ভগবৎ আরাধনা করতেন। সে আজ ৯৭৬ সাল হতে প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগেকার কথা। সেখানে একদিন ওই রকম এক পরিব্রাজক সাধু তাঁর উদ্দেশ্য স্থানে গমনকালীন পথ পার্শ্বের ওই গ্রামে উপস্থিত হন এবং গ্রামের সেই ব্রাহ্মণের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় ক্রমে জানতে পারেন সাধু একজন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ, ধ্রুপদ গান করেন। একান্ত প্রার্থনা জানাতে বৃক্ষতলে বসে দোতারা বাজিয়ে একটি ধ্রুপদ গান শোনান। সেই গানের সুরও ভাবের মহিমাকর্ষণে গ্রামবাসীদেরও টেনে এনে মুগ্ধ করে। গানের সামগ্রিক ভাবরূপ ও সুরের প্রবাহরস ব্রাহ্মণের মনকে বিহ্বল ও আপ্লুত করে দেয়। তিনি একান্তভাবে ভক্তিসহকারে তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে পাদ্য, অর্ঘ প্রদান পূর্বক তাঁর কাছে ধ্রুপদগান শিক্ষার একান্ত বাসনা জানান। পরিব্রাজক সাধু ব্রাহ্মনের এবম্বিধ ব্যবহারে আকৃষ্ট হন। পরক্ষণেই জানতে পারেন ওই ব্রাহ্মণও রাগসঙ্গীতে সাধন-ভজন করেন। সাধু তাঁর কাছে বেশ কিছুদিন থেকে অনেকগুলি ধ্রুপদ ও ভজনগান শিক্ষা দিয়ে গন্তব্য স্থানে চলে যান। আবার কিছুকাল পরে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সেখানে উপস্থিত হয়ে আরো কিছুদিন থেকে ধ্রুপদে তালিম দিয়ে যান।

সেই থেকে এই বংশে ধ্রুপদাদি গানের চর্চা ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। পরে এঁদের বংশেরই দু'একজন এক সময় বিষ্ণুপুরে গিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নানান শ্রেণীগত গান, বাদ্যযন্ত্র এবং কত্থকী নৃত্য প্রকরণ শিখে আসেন। এই সমস্ত বস্তু তাঁদের বর্দ্ধিত বংশ-সন্তানদের প্রত্যেককে বংশপরম্পরায় শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। গীত, বাদ্য ও নৃত্য, এই তিনটির চর্চা একসঙ্গে রাখায় এই সঙ্গীতজ্ঞ বংশ ঘোঙ্গার কত্থক বংশ নামে পরিচিত হয়। আমি যখন তের-চৌদ্দ বছর বয়সে ঠাকুরদার সঙ্গে পুরুলীয়া গিয়েছিলাম তখন ওই কত্থক বংশের এক গায়কের কাছে ধ্রুপদে বিশেষ তালিম পাওয়া এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়! তিনি আমাদের থাকার স্থানে প্রায়ই এসে আমাদের গান শুনতেন এবং তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতেও প্রায় নিয়ে যেতেন। ধ্রুপদ গানের উপর অতীত, অনাঘাত ক্রিয়ার নিয়ম তিনি জানতেন না, আমার কাছে চৌতাল ও ধামার গানের উপর তার ক্রিয়ার প্রকরণ শিখে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিয়েছিলেন। এখানে আমরা আঠার দিন ছিলাম। সেই ভদ্রলোকের নাম ছিল আশুতোষ রায়। ইনি পাখোওয়াজও ভাল বাজাতে পারতেন!

আশুবাবুর মুখে একদিন শুনলাম তাঁর গুরুর পিতা ছিয়াশী বছরের বৃদ্ধ গায়ক আসবেন তাঁর বাড়ীতে। আমরা সেদিন উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি বৈঠক খানার ফরাসে বসে আছেন। আশুবাবু তাঁকে আমাদের সপ্রশংস পরিচয় দিলেন। কথা প্রসঙ্গে আমার পিতামহ সেই বৃদ্ধ গুণীকে তাঁদের ঘরাণা পরিচয় জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করায় তিনি আদ্যপান্ত যে সব পরিচয় প্রদান করলেন সেই পরিচয়ই যথাযথভাবে আগে জানিয়েছি। আমাদের একান্ত বাসনা পূরণের জন্য তিনি একটি গৌড়সারঙ্গের চৌতাল তালের ধ্রুপদ শুনালেন। গলা অবশ্য তখন পড়ে গেছল, তত্রাচ শুনে মনে হয়েছিল রাগের উপর সুস্পষ্ট দখল ও মীড়-গমকগুলি গুণীজনোচিত। ওই গানটি আমারও জানা ছিল।

বৃদ্ধ গুণী বিষ্ণুপুরের গুণীদের নাম করে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন। আমার পিতামহ তাঁকে বললেন, "আপনাদেরই বংশের কেউ পুরুলিয়ায় আমার ছোট ছেলে অম্বিকাচরণের গান শুনে আপনাদের গ্রামে নিয়ে যান।"

এই কথা শুনে বৃদ্ধ বললেন, "আহা কি চমৎকার অম্বিকা বাবুর গান! যেমন রসাল তেমনি প্রয়োজনীয় সুর বিন্যাস ও তান, খুব পণ্ডিতও, শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যায় আমাদের দেশের পণ্ডিতদের মুগ্ধ করেছিল।"

ঠাকুরদা' জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের বংশে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের যিনি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম আপনার জানা আছে?"

তিনি বললেন, "তাঁর নাম ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ।" তারপর আমার গান শুনতে চাইলেন।

তখন মধ্যাহ্ন কাল বলে আমি তানসেন পুত্র হুরি বিলাসসেনের রচিত সারঙ্গ রাগের একটি খাণ্ডার বাণীর চৌতাল, পরে ওই রাগের একটি খেয়াল শুনিয়েছিলাম। বৃদ্ধ গুণী গান শুনে আমাকে খুব আশীর্বাদ করেন এবং বলেন, "পাশের ঘরে বসে শুনলে এত কম বয়সের গান বলে মনে হবে না,—যদি চেহারা আগে না দেখা হয়।"

এঁদের বংশের গায়করাই বরাবর গিধৌড়, পঞ্চকোট, ঝরিয়া, কাতরাশ প্রভৃতি রাজাদের গায়ক রূপে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। আমি পঞ্চকোট,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঝরিয়া ও কাতরাশ এই তিনটি রাজবাড়ীতে কথকবংশের গায়কদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে এসে এঁদের গান শুনেছিলাম। তখন আমার বয়স চৌদ্দ থেকে উনিশের মধ্যে। এঁদের গানে যে বস্তু ছিল তাতে ধাক্কাবহুল মীড়, গমক এবং তালের মারপেঁচেই বেশী। স্বাদরসের সম্পর্ক না থাকারই মত। শোনা যায় এঁরা রসসমৃদ্ধ গায়কী ত্যাগ করে এক খাঁ সাহেবের দুর্দান্ত দাপটি গায়কীকে নকল করেছিলেন। আমার কম বয়সের সময় দেখেছি, তখনকার রাজা, জমীদারদের মধ্যে অনেকের ধারণা ছিল ওই রকম করে গাওয়াই হল ধ্রুপদের আসল মূর্ত্তরূপ। মনে হয় এই জন্যই কথক বংশে এবং কোন কোন ধ্রুপদ গায়কদের ওই পদ্ধতি অনুসরণীয় হয়েছিল। এঁদের গায়কীতে মীড়ের ঢেউ-এর মধ্যে দিয়ে সুরের আঁই আঁই শব্দের ভেতর যে কথা থাকত তার অক্ষর বুঝা অসাধ্য ছিল। এঁরা বলতেন, "কথা যদি বুঝা যাবে তাহলে হিন্দী ধ্রুপদ-খেয়ালের কৌলীন্য কি রইল? তাহলে তো একদম ভেতো গান হয়ে যাবে।" এসব কথা তখন হা-করে শুনতাম, এখন কথাগুলো মনে পড়লেই হাসি পায়। তানসেন তাঁর রচিত এক ধ্রুপদগানে বলেছেন,— "শুধমুদ্রা—শুধবাণী—সাঁচিস্বরণ আলাপ করেঁ।...।" অর্থ, মুদ্রাদোষ শূন্য হয়ে, স্পষ্টবাণী উচ্চারণ করে এবং বিশুদ্ধ সুরের দ্বারা স্বরবিস্তারের মাধ্যমে গাইবে...।

ওই কথক ঘরাণার পরিচয়টির মধ্যেও আছে বিষ্ণুপুর ঘরাণার সঙ্গীত চর্চার দূরত্বের পরিচয়। এই ঘরাণার সবিশেষ সংবাদ আমি আমার গুরুর কাছে পেয়েছিলাম॥

বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের আগমন ও বিপুল আকারে ধ্রুপদাদি গানের সংগ্রহ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিশেষভাবে জানা যায়, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মল্লরাজাদের পর্য্যায়ক্রমে পরের পর বেশ কয়েক পুরুষের যে সংখ্যায় ছিলেন মল্লরাজ জগৎমল্ল, সেই তিনি একান্ত প্রয়োজন বোধে বিষ্ণুপুরের পাহাড় ভঙ্গীমাময় বিস্তৃত বনভূমির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপর দুর্গাদি নির্মাণ ও নগর গড়ে তুলবার জন্য ওখানের উত্তর প্রান্তসীমায় বিষ্ণুপুর নামে যে ছোট গ্রামটি ছিল, সেখানে সাময়িকভাবে থাকার মত গৃহাদি নির্মাণ করিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের ও গৃহপরিজনদের নিয়ে আসেন, এবং সেই সংগে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরও। আমাদের পাড়াকে প্রথমে গায়ক পাড়া, পরে ওস্তাদ পাড়া নামে পরিচিত থাকে।

প্রদ্যুম্নপুরে মল্লরাজ আদি রঘুনাথের পূর্বের রাজাদের সময় থেকে আমাদের বংশের বহু উর্দ্ধতন পুরুষরা সেই রাজাদের কাছে গায়কও পণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। ওই পদ মল্লরাজাদের পতনের পূর্ব পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল।

তারপর বিষ্ণুপুর যখন অচিরে নগরের মত গড়ে উঠল এবং রাজধানী নামে পরিচিত হল, তখন. থেকে নানান দেশের মানুষ ৺পুরী যাত্রার পথে বিশ্রাম মানসে এখানে আসতে থাকে। ৺পুরীগামী অহল্যাবাঈ রোড বিষ্ণুপুর সহরের দক্ষিণ প্রান্ত সীমার দিকে থাকায় এখানে তখন যাতায়াতের পথ সুগম হয়ে গিয়েছিল। আগেই জানিয়েছি মাহারাণী অহল্যাবাঈ ৺কাশীধাম থেকে ৺পুরী ধাম পর্য্যন্ত ওই রাস্তা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই থেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের ধর্ম প্রাণ মানুষরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য শ্রবন করে তাঁর দর্শন কামনায় যেত। বহু রাজা, মহারাজা, সাধু-সন্তদের অন্তরে দর্শন কামনা অত্যুগ্র হয়ে যে উঠেছিল তার প্রমাণ পরিচয় এই বিবরণের মাধ্যমে বিশেষরূপে পাওয়া যাবে। ওই দেব দর্শন কামনার আকর্ষণের উপর সেই সময় থেকে যে সব সঙ্গীতজ্ঞ, সংগীতসাধক-সাধু-সন্ত বিষ্ণুপুরে বিশ্রাম ইচ্ছায় আসতেন, তাঁদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে আমাদের ঘরাণার পূর্ব পুরুষরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধাসহকারে গৃহে আনয়ন করে অতি আগ্রহের সহিত অনুরোধ জানিয়ে দু'চার দিন রেখে দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ধ্রুপদাদি গান শিখে নিতেন। তাঁরাও সানন্দে বিতরণ করে যেতেন। এইভাবে গানের চর্চা ও সংগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর মহারাজ বীরহাম্বীরের সময় থেকে এই সংগ্রহের সুযোগ যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন থেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে রাজা, মহারাজাদের শ্রীক্ষেত্রধামে যাতয়াত বিষ্ণুপুরবাসীর কাছে বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা যেতেন একমাত্র রাস্তা ওই অহল্যাবাঈ রোড ধরেই। তাঁদের সংগে থাকত রাণীরা, পুরমহিলারা, সিপাই,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সান্ত্রী, বহুলোক লস্কর, বেশ কয়েকটি করে হাতী-ঘোড়া, শিবিকা এবং গায়ক-বাদক, বাঈজীও নর্ত্তকী প্রভৃতি।

তাঁরা বিষ্ণুপুর একটি রাজধানী এই সংবাদ অবগত হয়ে বিষ্ণুপুরের দক্ষিণপ্রান্তসীমায় তুরঙ্ক নামক বিরাট এক ময়দানকে বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান বুঝে ছাউনী ফেলতেন।

মল্লরাজারা সেই সব রাজাদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে যেতেন সম্বর্দ্ধনাও আপ্যায়ন জানাতে এবং খাদ্যাদি সর্ব বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিতেন। সময় বুঝে তাঁদের সংগে থাকা সঙ্গীতজ্ঞ, বাঈজীও নর্ত্তকীদের গীত-বাদ্য নৃত্যাদি শ্রবণও দর্শনের বাসনা জানান মাত্র সেই রাজারা সানন্দে ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁদের সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতিরাও প্রসন্নচিত্তে পরিবেশন করতেন। স্থানীয় চর্চারত ব্যক্তিরাও সেই সুযোগ পেতেন শ্রবনাদির জন্য। তাঁদের শিক্ষা লাভের একান্ত কামনা জেনে মল্লমহারাজরা আগত রাজা-মহারাজাদের সমীপে সে কথা উত্থাপন করা মাত্র তাঁদের সঙ্গীতজ্ঞদের নির্দেশ দিতেন শেখাবার জন্য। তাঁদের গায়ক-বাদক প্রভৃতি অকাতরে এই বিদ্যা দান করে যেতেন। কোন কোন গায়ক-বাদক, নর্ত্তকী এবং বাঈজীকে মল্লরাজার অনুরোধে উক্ত রাজারা বিষ্ণুপুরে রেখে যেতেন, আবার ফেরার পথে তাঁদের সংগে নিয়ে যেতেন।

প্রায় তিন-চারশ' বছর ধরে এই সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণুপুরে বহু গায়ক-বাদকের সৃষ্টি হয় এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের সমস্ত শ্রেণী বস্তুতে, নানাবিধ বাদ্যাদি যন্ত্রের চর্চা ও তার গৎ-এর সংখ্যায় এবং মৃদঙ্গবাদ্য প্রকরণের ছন্দ বোলাদিতে বিষ্ণুপুর ঘরাণা ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। তার সংখ্যাতত্ত্বের পরিচয় পরে জানাব।

এইসব পরিচয়ের মধ্যে অন্যতম বড় পরিচয় হল ভারতের প্রাচীন ঘরাণা সমূহের বড় বড় গুণী গায়ক-বাদকদের কাছ থেকে যে সমস্ত রাগরূপ সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে আছে নিয়ম নীতি ধারার বিশুদ্ধ সমন্বয় পরিচয়। এ, এক শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মূলক দলিলের মত। তাছাড়া রাগরূপের শাশ্বত নীতিধারার উপর বিখ্যাত প্রাচীন গুণীদের দ্বারা যে সমস্ত ধ্রুবপদ (ধ্রুপদ) গান রচিত হয়েছিল তার অধিকাংশই এই ঘরাণায় এসেছিল ওইরূপ সৌভাগ্য সুযোগের মাধ্যমে। একই ঘরাণা হতে যে নয়, বড় বড় ঘরাণা থেকেই সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সব বস্তু যে এসেছিল তার প্রমাণ স্বরূপ বাল্যকাল থেকে ভারতের বিভিন্ন ঘরাণার গায়ক-বাদকদের সান্নিধ্যে এসে দেখেছি, তাঁদের যে কোন রাগের দু'একটি করেই গান বা গৎ সংগ্রহ আছে। আর যদি দেখতে পাচ্ছি বিষ্ণুপুর ঘরাণায় ভিন্ন ভিন্ন গায়কী ও বাদন পদ্ধতির উপর প্রায় সমস্ত রাগের প্রত্যেক শ্রেণীগত গান ও গৎ-এর সংখ্যায় সাত-আটটি, এমন কি কোন কোন রাগের দশ-এগারটি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয়ে আছে, তাহলে বুঝতে হবে এই সব বস্তু একই ঘরাণার নয়। তাছাড়া সেই এক এক ঘরাণায় কানড়া গোষ্ঠীর অন্তর্গত আঠার কানড়ার মধ্যে, বার মল্লারের মধ্যে, তের প্রকার তোড়ী, নবম নট, সপ্তসারঙ্গ, এই সব গোষ্ঠী নিরাকরণের রাগগুলির মধ্যে দু'একটি করে থাকারই পরিচয় পেয়েছি। তাও এখন অনেক খেয়াল ও ধ্রুপদ গায়ক এবং যন্ত্রীরা অনেক রাগের আসল রূপ অর্থাৎ তার ধ্রুপদী রূপের যথাযথ পরিচয় না রাখার জন্য অন্য রূপে প্রকাশ করেন। এজন্য মনে হয় এঁদের আসল ঘরাণা পরিচয়ের একান্ত অভাব আছে।

প্রমাণের উপর দেখা যাচ্ছে বিষ্ণুপুর ঘরাণায় শ্রেণীগত গীত সৃষ্টির এক রকম প্রথম সময় থেকেই ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গান সংগ্রহ হয়ে এসেছিল। এই সব গান ও গৎ যাঁরা বিতরণ করেছিলেন তাঁরা গ্রহণকারীদের কিছু করে তালিমও দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

ভারতের কোন ঘরাণায় আজ পর্য্যন্ত এত বিষয়ের উপর চর্চা ও তার উপর কৃতিত্ব অর্জনের প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং তার সংগে গুণী পরিচয় মূলক একাধারে শ্রেণীগত সমস্ত গানের উপর, বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের উপর, সঙ্গীতের ক্রিয়াঙ্গ ও তত্ত্বাঙ্গের বিবিধ গ্রন্থ রচনার উপর, বহু সংখ্যক হিন্দী ও বাংলা গান রচনার উপর উচ্চস্তরের অধিকারও অন্যস্থানে দুষ্প্রাপ্য।

ঘরাণা ভাণ্ডারে সংরক্ষিত

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিষ্ণুপুর ঘরাণার সম্পদ ভাণ্ডার কুবেরের ভাণ্ডারের মত। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতজ্ঞসমাজ, গুণগ্রাহীগণ, পৃষ্ঠপোষক, বিদ্যালয়কর্ত্তৃপক্ষ এবং সরকার, কেউই এতবড় ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার ঘরাণা সম্পদকে সংরক্ষণের জন্য এবং শিক্ষা ও চর্চায় স্থান রাখার জন্য দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে বলে মনে করেন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই ঘরাণা ভাণ্ডারে অবস্থিত মোটামুটি সংখ্যাতত্ত্ব তুলে ধরছি, তা দেখে সঙ্গীত গুণগ্রাহী ও চর্চারত ব্যক্তিরা মনে হয় বিস্মিত হবেন।

তালিকা, যথা,—প্রায় সমস্ত রাগের ধ্রুপদাঙ্গের বড়বাণীর চারপদী চৌতাল তালের গান তিনশতর মত, অনুরূপ রাগের ধামার দুইশত, পঞ্চম সওয়ারী, আড়াচৌতাল, সুর ফাঁকতাল, ব্রহ্মতাল, ঝাঁপতাল, রূপক, তেওরা প্রভৃতি তালের গান সমস্ত মিলিয়ে শতাধিক। আর আছে 'সঙ্গীত' নামে বিরাট এক সাধনার পরিচয় মূলক বস্তু; আছে—ধারু, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, কওলকলওয়ানা, হপ্তরঙ্গ, স্বররঙ্গ, তালফেরতা, অষ্টাদশ কানড়া, দ্বাদশ মল্লার, ত্রয়োদশ তোড়ী, নয় প্রকার নট, সপ্ত সারঙ্গের ধ্রুপদাঙ্গের গান। বহু রাগের উপর বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল তিনশ' এর উপর, অধিকাংশ রাগের ছ' সাতটি করে। তেলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, রাগমালা, রাগের স্বরগ্রাম, ইত্যাদি সব মিলিয়ে শতাধিক। টপ্পা, ঠুম্‌রী, হোরী ঠুম্‌রী, ভজন, ঝুলন, কজরী প্রভৃতির গান প্রত্যেকটির অনেকগুলি করে।

আলিরেজা, মজিদ খাঁ, গোলাম মহম্মদ খাঁ (সুরবাহার স্রষ্টা), বাজপেয়ী প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত সেতার বাদকদের গৎ দুই শতাধিক, এক এক রাগের অনেক গুলি করে এবং কয়েকটি মূল্যবান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ইত্যাদি।

যে সব যন্ত্রের চর্চা বিপুল ভাবে হয়ে এসেছিল তার তালিকা,—বীণা, সুর-বাহার, সেতার, এসরাজ, শরোদ, কানন, জলতরঙ্গ, ন্যাসতরঙ্গ, নৌকোতরঙ্গ, সুরমণ্ডল ইত্যাদি এবং পাখোওয়াজ ও তবলাবাদ্য। এই বাদ্য দুটির বিভিন্ন তালের বোল পরণাদি বহু সংখ্যক আছে বিখ্যাত প্রাচীন বাদকদের রচিত নামের উপর পরিচয় নিয়ে। আমার সঙ্গীতগুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের অধিকাংশ বস্তুই আমাকে শিখিয়ে ছিলেন। তিনি বলতেন, ঘরাণা বস্তুসমূহ তোমাকে রাখতে হবে।'

সঙ্গীতজ্ঞদের নাম পরিচয় এবং প্রাচীন সাক্ষ্য

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদাদি সংগীত চর্চার প্রথম সময় হতে তার বহু পরেও সেখানের অধিকাংশ সঙ্গীতজ্ঞদের নাম পরিচয় পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁরা নামের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপযোগী সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হননি বলেই। এতবড় এক নূতন বস্তুর উপর উপযুক্ত পরিচয় রাখতে যে প্রতিভা ও শিল্প দক্ষতার প্রয়োজন থাকে ততটা হয়ত তাঁদের ছিল না। তাই সংগৃহীত শিক্ষার বস্তুগুলিই চর্চায় রেখে শিক্ষা দিয়ে এসেছিলেন। বিরাট সাধনার মত যে বস্তু প্রথম সময়ে লাভ হয়, তাকে আয়ত্তে আনবার জন্য বস্তুপ্রদানকারী গুরুদের কাছে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা ও তালিম পাওয়ার বিশেষ আবশ্যক থাকে। অতি অল্পদিনের মধ্যে সেই বস্তুর উপর উপযুক্ত শিল্পরচনার পরিচয় রাখা সম্ভব হয় না। তাই মনেহয় তাঁরা নাম রাখার উপযোগী কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি। জনসাধারণের কাছে সেইজন্য তাঁরা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে গেছেন! কিন্তু তাঁদের ধারাবাহিক চর্চা রেখে যাওয়ায় এবং ক্রমশঃ শুনতে পাওয়ার সৌভাগ্য বশতঃ সঞ্চয় হয়ে উঠেছিল শিল্পের ক্রিয়াঙ্গ শক্তি। অবশ্য এই শক্তি সকলের মধ্যে আসে না, আসতে পারে না॥

বিষ্ণুপুরে কয়েকশ' বছর আগে থাকতে গীত, বাদ্য, ও নৃত্যচর্চার আর এক সাক্ষ্য এখনও বিদ্যমান। তা হ'ল প্রাচীন মন্দির। যে সময় হতে মন্দির নির্মিত হয়েছে, তখন থেকেই মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে গীতরত, শরোদ, বীণা, সুরমণ্ডল, সেতার, মৃদঙ্গ, খোল প্রভৃতি বাদ্যরত এবং নৃত্যরত বহু মূর্ত্তি। তখন এ সবের চর্চা বহুল পরিমাণে ছিল বলেই এর প্রভাব তখনকার রাজাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, মন্দির গাত্রে ওই সব শিল্পমূর্ত্তির মধ্যে দিয়ে সুসজ্জিত, সুন্দর ও স্থায়ী করে রাখবার জন্য। একথাও সহজেই মনে আসে, মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীদেরও সঙ্গীতের ওই সকল বস্তুর উপর বহুল পরিমাণে দর্শন ও শ্রবন অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল। নতুবা এই সকল মূর্ত্তিকে তারা এমনভাবে প্রাণবন্ত ও সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারত না এবং তেমন প্রেরণা ও আসত না। শাস্ত্রীয়সঙ্গীত চর্চার প্রাচীন পরিচয়ে এটিও একটি বড় রকমের প্রমাণ॥

সংগৃহীত পরিচয় প্রসঙ্গে আর একটি আদর্শ ঘরাণা হতে ধ্রুপদ, খেয়াল প্রাপ্তির কথা বলা হয়নি। সেটি হ'ল বিহারের বেথিয়ারাজ ঘরাণা। এই ঘরাণার দু'জন রাজা, যথা, -নওল কিশোর ধ্রুপদ গান রচনায় এবং আনন্দকিশোর খেয়ালগান রচনায় অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। এঁদের রচিত গানের স্বরবিন্যাসে যে রকম ভাবময় বন্দেজ আছে তা সত্যই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপূর্ব ও মনমুগ্ধকর। সেই সুযোগের মাধ্যমেই এঁদের অনেকগুলি গান বিষ্ণুপুর ঘরাণায় এসেছিল। রাজা আনন্দ কিশোরের রচিত অতি সুন্দর স্বরসংযোজনার উপর চারপদী অর্থাৎ অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ, এই চার অংশকে ধরে দু'তিনটি খেয়ালগানও আমাদের ঘরাণায় এসেছে॥

পিতামহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে সব সঙ্গীতজ্ঞ শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের এইসব বস্তু বিষ্ণুপুরের গায়ক ও বাদকদের বিতরণ করে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম-ধাম কিছু জানা আছে কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'পিতার কাছে দু'চার জনের নাম, মাত্র কানেই শুনেছিলাম। মনে রাখবার মত আগ্রহ রাখিনি। ভবিষ্যতে এসব কাজে লাগবে, এ ধারণা তখনকার লোকের কারোরই ছিল-না। তাছাড়া, ওই সব সঙ্গীতজ্ঞদের থাকা বেশীদিন ছিলনা বলে, শেখার আগ্রহটাই ছিল অত্যুগ্র হয়ে। সঙ্গীতজ্ঞদের জাতি অনুযায়ী খাঁ সাহেব, ওস্তাদ, চৌবেজী, মিশিরজী ইত্যাদি নামেই সম্বোধন থাকত। মনে হয় রাজবাড়ীতে নাম-ধাম-ঘরাণা পরিচয় সংরক্ষিত ছিল। আমার পিতামহের আমলে মাম্‌তুমিয়াঁ নামে এক খেয়াল ও ঠুম্‌রী গায়ক এখানকার কাবাড়ীপাড়ায় স্থায়ীভাবে ছিলেন। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সময় আমি তাঁর কাছে কিছু খেয়াল ও অনেকগুলি ঠুম্‌রীগান শিখেছিলাম। আমি সেতার শিখেছিলাম, বাজপেয়ী ঘরাণার যন্ত্রীর কাছে শেখা আমার পিতামহের কাছে। তাঁর নাম কি ছিল, তা জেনে রাখা হয়নি। আমার পিতামহ শ্রীধর চন্দ্র আমার পিতাকে যেসব গায়ক-বাদকদের নাম বলেছিলেন, তার মধ্যে একজন ধ্রুপদে, আর একজন খেয়ালে খুব বড় ওস্তাদ ছিলেন। শুনা যায়, এঁরা গোয়ালীয়রের মহারাজার সঙ্গে এসেছিলেন। বয়স তাঁদের তখন বৃদ্ধত্বের কোঠায় ছিল। মনে হয় এঁদের নাম পিতা ও পিতামহ জানতেন॥'

মল্লরাজবংশের একটি ইতিহাস ইংরেজী ভাষায় লিখে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট নাগরিক অভয়পদ মল্লিক মহাশয়। পুস্তকের যে পরিচ্ছেদে ইনি বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদাদি সঙ্গীতের প্রচার-প্রতিষ্ঠার কথা লিখেছেন, তা পড়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—এই ইতিহাস কিভাবে সংগ্রহ করলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"গোপেশ্বর বাবুর দেওয়া ইতিহাসকেই আমি উদ্ধৃত করে দিয়েছি।" আমার লেখা ইতিহাসটি তাঁকে পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি সমস্তটি পড়ে ফেরত দেবার সময় বলেছিলেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তোমার লেখা ইতিহাসই সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক হয়েছে। বলেছিলাম, আপনি দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের ঘটনাবলী জেনেও ওইভাবে লিখিত ইতিহাসকে কি করে সত্য বলে মেনে নিলেন? উত্তরে বলেছিলেন,—'অতবড় সঙ্গীতজ্ঞ লিখেছেন বলে আমি পৃথকভাবে ভেবে দেখবার অবকাশ নিইনি, এটা আমার খুবই অসাবধানতার পরিচয় হয়ে গেছে। যাই হোক তুমি যখন তোমার এই বাস্তব লেখা প্রকাশ করবে তখন আমাকে একটু বাঁচিয়ে দিয়ো।' পরে বললেন,—'রাজবাড়ীতে গিয়ে বড় রাণী পট্টমহিষীর কাছে এই বিষয়ের কিছু সন্ধান তাঁর জানা আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে তিনি বলেন,—"ওই ঘরের পাটাতনে অনেক খাতাপত্র তুলা আছে, খুঁজে দেখ কিছু সন্ধান পাও কিনা।" আমি কয়েক ঘণ্টা ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটি লাল কাপড়ে বাঁধান খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখাতে পেলাম বড় বড় অক্ষরে 'সঙ্গীত বিভাগ,' মল্লাব্দ অষ্টমশতক, তারপর সমস্ত পৃষ্ঠার অক্ষর এমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে, এবং কাগজ পচে গিয়ে ছিঁড়ে যাওয়ায় তা থেকে কিছুই পড়তে পারলাম না. আমার পুস্তকে খাতার ওই দুটি কথাই তুলে দিয়েছি।' যাই হোক—মোটের উপর ওই খাতার 'সঙ্গীত বিভাগ' ও তার বর্ষ সনের পরিচয়টুকুও যথেষ্ট এবং প্রাচীনচর্চার পরিচয় জ্ঞাপক বলে স্বীকারে আসছে। 'সঙ্গীত বিভাগ' লেখাটির দ্বারা বুঝা যাচ্ছে বেশ কিছু সংখ্যক সঙ্গীতজ্ঞ থাকার কথা, এবং চর্চার পরিচয়ও অষ্টম মল্লাব্দে থাকায় সহজেই আমরা জানতে পাচ্ছি প্রায় পাঁচশ' বছরের আগে থেকে সঙ্গীত চর্চার খবর। প্রাচীন চর্চার প্রমাণ স্বরূপ এটিও একটি বড় রকমের দলিলই তাহলে বলতে হবে॥

বিষ্ণুপুরে বিভিন্ন বংশে চর্চার পরিচয়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিষ্ণুপুরে আমাদের প্রাচীন ঘরাণা বংশ এবং গদাধর চক্রবর্তীর প্রাচীন বংশের সঙ্গীত চর্চার বিশেষ পরিচয় থাকা ছাড়া আরো যে কয়েকটি বংশে চর্চার পরিচয় আছে এবং সেখানে বড়দরের সঙ্গীতজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে তাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যে প্রথমেই স্মরণযোগ্য আচার্য্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নাম। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। মল্ল মহারাজ এঁদের পূর্বপুরুষকে আনিয়েছিলেন রাজসাহী জেলার গ্রামাঞ্চল হতে শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদজ্ঞ হিসেবে।

রামশঙ্করের সঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে সেদিন বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট বংশের এক সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্যক্তি বললেন,—"রামশঙ্কর পশ্চিম থেকে আগত এক হিন্দুস্থানী খুব বড় ধ্রুপদ গায়কের কাছে শিক্ষা করেন, তারপর সেই গায়কের সংগে চলে যান, তাঁর কাছে অনেকদিন থেকে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন, পরে সেই স্থানেরই একজন বড় খেয়াল গায়কের কাছে খেয়াল ও টপ্পাগান শিখে দেশে ফিরে আসেন এবং দেশের কাছে সঙ্গীতে বিশেষ ঘরেণ্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। অচিরেই বহু ছাত্রকে শিক্ষা দিতে থাকেন। ইনি সংস্কৃত বিদ্যাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। এঁর তিনজন ছাত্র সঙ্গীতে বিরাট অধিকার লাভ করে তাঁকে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে মহান জ্ঞানী-গুণী রূপে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। সেই তিনজনের নাম, যথা—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুভট্ট এবং অনন্তলাল। রামশঙ্করের রচিত অতিউত্তম বন্দেজের উপর বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় ধ্রুপদ ও খেয়াল গান আছে। তন্ত্র-শাস্ত্রের উপর এঁর রচিত বিরাট আকারে পুঁথি আছে। এঁর পুত্র রামকেশবও খুব বড় দরের গায়ক ছিলেন। তারপর এঁদের বংশে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়ার প্রচেষ্টা কেউ রাখেন নি, তবে উপযুক্ত শ্রোতা আছে। কেউ কেউ বলেন, রামশঙ্কর গদাধর চক্রবর্ত্তীরই হাতে গড়া শিষ্য। কোনটি সত্য তা ঠিক করে বলা মুস্কিল॥

যদুভট্টের পিতামহ রামকিঙ্কর ভট্টও শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শী ছিলেন, তবে নাম পরিচয় তেমন ভাবে বিস্তৃত হয়নি। তার কারণ, আগেই বলেছি—যত বড়ই গায়ক-বাদক হোন, কোন বড় রকম পরিচিত স্থানে না থাকলে তাঁর যথাযথ নাম পরিচয় থাকে না। বড় বড় শিষ্যরা যদি বহির্মুখী হয়ে প্রচারে ব্রতী হন, অথবা তিনি নিজে যদি দেশ ভ্রমনের সামর্থ্য রাখতে পারেন তাহলে তাঁর নামের ব্যাপ্তি ঘটে। গদাধর, রামশঙ্কর, অনন্তলাল প্রভৃতি বড় বড় সঙ্গীত বেত্তাগণকে প্রকৃত ভাবে চিনিয়েছেন ক্ষেত্রমোহন, যদুভট্ট, রাধিকা-প্রসাদ, রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর প্রভৃতি বহির্মুখী বড় বড় গুণী শিল্পীরাই॥

যদুভট্টের শিক্ষার পরিচয় সম্বন্ধে শুনা যায়, ইনি তাঁর বিখ্যাত গায়ক পিতার কাছে শিখতে খুব আগ্রহী হয়েছিলেন, কিন্তু পিতা মধুভট্ট পঞ্চকোটের (মানভূম জেলার) রাজদরবারে থাকায় তাঁর মাতা সেখানে যেতে না দেওয়ায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যদুভট্ট ছিলেন অসাধারণ শ্রুতিধর, প্রতিভাশালী ও সুকণ্ঠী এবং রাগরূপ রচনায় দক্ষ শিল্পী। ইনি ধ্রুপদ ছাড়াও সুরবাহার, এসরাজ এবং মৃদঙ্গও ভাল বাজাতে পারতেন। শুনা যায় শেষের বাদ্যগুলি গদাধরের কাছে শিখেছিলেন। ঠাকুরদা'র মুখে শুনেছি, যদু কণ্ঠ-সঙ্গীতে ধ্রুপদ ছাড়া সঙ্গীতের অন্য শ্রেণী বস্তু গাইতে পছন্দ করতেন না, বলতেন বড় জিনিসের পর হালকা জিনিস আমার ভাল লাগে না। ঠাকুরদা' এ-ও বলতেন, গানে এই রকম উচ্চস্তরের গায়কী যদু ছাড়া আর কারো কাছে তখন শুনিনি, গান ধরলেই সকলকে বিহ্বল মুগ্ধ করে দিত।

যদুভট্ট ত্রিপুরা ও পঞ্চকোট মহারাজার দরবার গায়ক ছিলেন। এই দুই স্থান হতে 'তানরাজ' ও 'রঙ্গনাথ' উপাধি পেয়েছিলেন। এঁর রচিত অনেক-গুলি হিন্দী ভাষায় ধ্রুপদাঙ্গের গান আছে অপূর্ব বন্দেজের উপর। ইনি ভনিতায় নিজের ওই উপাধিই দিয়ে গেছেন। যদুভট্টের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটি সুন্দর পরিচয় দিয়েছিলেন গৌরীপুরের রাজা ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়। ঢাকার নবাব বিখ্যাত শরোদবাদক সাদিক্ আলি খাঁ এর কাছে শারোদ বাদ্য শিক্ষা করতেন। যদুভট্টর খুব নাম শুনে ত্রিপুরার মহারাজকে লোক মারফত্ অনুরোধ জানান তাঁকে পাঠিয়ে দেবার জন্য। যদু যথা দিনে উপস্থিত হন। নবাব বাহাদুর যদুর গান শুনে অতীব মুগ্ধ হন। খুব প্রশংসা সূচক বাক্যশুনে সাদিক আলি খাঁ বলেন, "কণ্ঠ তো ভগবান দত্ত, গানের সাধনা অনেক সহজ, যন্ত্র বাদ্য, বিশেষ করে শরোদবাদ্যকে ধরে শিক্ষা ও সাধনায় বড় হওয়া খুবই কঠিন।" এই কথা শুনে যদু নবাব বাহাদুরকে বলেন—"আপনি আমাকে একটি শ্যারোদ দিন, আমি পনেরো দিনের মধ্যেই আপনাদের শুনিয়ে দেবো কি রকম বাজাতে পারি।" নবাব বাহাদুর সানন্দে তাঁর নিজের শরোদটি দেন এবং খুব ভাল বন্দবস্তর উপর থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পঁনর দিনের দিন নবাব দরবারে সাদিক আলির উপস্থিতিতে যদুনাথ শরোদ বাজালেন দরবারী কানাড়ায় প্রথমতঃ আলাপ একঘণ্টা ধরে, পরে গৎ একঘণ্টা—বিভিন্ন বৈচিত্র্যের উপর তানালংকার ও ছন্দের ক্রিয়া দেখিয়ে, যা সাদিক্ আলির ও সাধ্য ছিল না। সাদিক্আলি খাঁ বুঝলেন এই রকম রাগ বিস্তার খুব ভালভাবে ধ্রুপদ জানার জন্যই সম্ভব হয়েছে। নবাব বাহাদুর এবং সভাসদবর্গ শুনে বিহ্বল মুগ্ধ তো হলেনই, সাদিক আলিও গভীর শ্রদ্ধান্তঃ করণে যদুর গলা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "আমার সেই উক্তি তুমি ভুলে যেও এবং ক্ষমা কোরো।।" ঠাকুরদা' বলতেন যদুর দিগ্বিজয়ী শক্তি ছিল। প্রথমে যদু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে তাঁর জোড়াসাঁকোর গৃহে থেকে রবীন্দ্রনাথকে বহুদিন গান শিক্ষা দেন। রবীন্দ্রনাথ একসময় 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় লিখেছিলেন,—"যদু বাংলার তানসেন বিশেষ।" সেই বাংলার তানসেন যদুভট্টের, এবং আচার্য্য গদাধর, রামশঙ্কর, ক্ষেত্রমোহন, অনন্তলাল, রাধিকা-প্রসাদ, রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর প্রভৃতি দিকপাল বিশেষ গুনী সঙ্গীতজ্ঞদের আমাদের দেশের সঙ্গীত সম্মেলনে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নাম দিয়ে তাঁদের নামকে স্মরণীয় করে রাখার মত কর্ত্তব্য আছে বলে মনে করেন না। সঙ্গীতের মত ব্রহ্মবিদ্যাকে ধরে থেকে আমাদের কেন সরল অন্তঃকরণ, মনুষ্যত্ব ও কর্তব্যবোধ আসবে না? তাহলে একে ধরে থাকার পরিচয় কি এলো!

আচার্য্য রামশঙ্করের অন্যতম প্রধান ছাত্র ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্রিয়াঙ্গ ও তত্ত্বাঙ্গের উপর শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। ইনি স্বরলিপির প্রকৃত প্রবর্ত্তক ও রূপদাতা। এঁর রচিত কয়েকটি অতি মূল্যবান গ্রন্থের নাম, যথা—'কণ্ঠকৌমদী,' 'সঙ্গীতসার,' 'যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা'। ইনি সংস্কৃতেও পণ্ডিত ছিলেন। রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এঁকে তাঁর শিক্ষাচার্য্য করে রেখেছিলেন।

বিষ্ণুপুরে নিতাই ও বৃন্দাবন নাজীর—এই দুই ভাই-এর ধ্রুপদ গানের উপর খুবই নাম-পরিচয় আছে। এঁদের শিক্ষা কার কাছে তা আমি ঠিক বলতে পারলাম না। যাঁর কাছেই শিখুন অসাধারণ বুদ্ধি-প্রতিভায় এঁরা গানে খুব বড় হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের বংশে সংগীতের চর্চা আর কেউই রাখেন নি।

আমাদের পাড়ার কেশব চক্রবর্তী ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ ধ্রুপদ গায়ক। এঁর

কেউ কেউ মনে করেন যদুভট্ট কোলকাতার গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি রামশঙ্করের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে শিক্ষা করেন নি॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গানে থাকত বড় বড় গমকের ঢেউ ও মীড়ের প্রাচুর্য্যই বেশী। ইনি খেয়ালও খুব দাপটের সহিত গাইতেন। এঁর পুত্ররা ধ্রুপদগান শিখেছিলেন।

আচার্য্য গদাধর চক্রবর্ত্তীর পরিচয় আগেই দিয়েছি, এঁর উর্দ্ধতন তিন পুরুষ বড় দরের ধ্রুপদ গায়ক ও বীণ বাদক ছিলেন। ওঁর বংশের মাধব চক্রবর্ত্তী পাখোয়াজ বাদ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁর প্রধান ছাত্র ছিলেন জগৎ চাঁদ গোস্বামী, ইনি রাধিকাপ্রসাদের পিতা। জগৎ চাঁদের ছিল চার পুত্র। বড় কীর্ত্তিচন্দ্র নাম করা পাখোয়াজ বাদক ছিলেন, যখন খাণ্ডারবাণীর দ্রুত তালের ধ্রুপদে চৌদুনের বোল তুলতেন তখন মনে হত যেন ইলেকট্রিক মেশীন চলছে। দ্বিতীয় পুত্র বিপিন চন্দ্রও ধ্রুপদগানে এবং এসরাজে পারদর্শী ছিলেন। এঁরই পুত্র জ্ঞানেন্দ্র প্রকাশ গোস্বামী। জ্ঞানেন্দ্র প্রথমে গানে আমার কাছে কিছুদিন ধরে হাতেখড়ির পর তার খুড়োমহাশয় রাধিকাপ্রসাদের কাছে শেখার সুযোগ পায়। জ্ঞানেন্দ্র ধ্রুপদ, খেয়াল, বাংলা খেয়াল, ভজন ইত্যাদি সব রকমের গানই আসর মাতান করে গাইতে পারত। কণ্ঠ ছিল অপূর্ব, রাগ সংগীতের উপর তার জনপ্রিয়তা ছিল আশ্চর্য্যকর। জগৎ চাঁদের তৃতীয় পুত্র রাধিকাপ্রসাদের পরিচয় পরে দেবো।

চতুর্থ পুত্র নকুল চন্দ্রও ভাল গাইতে পারতেন। এই বংশে এখন মাত্র গোসাঁইজীর দুই নাতিই গানের চর্চা করে। তাদের নাম তারাপদ, ও দুর্গাদাস।

দীনবন্ধু গোস্বামীর বংশেও তিন পুরুষ ধরে ধ্রুপদাদি গানের চর্চায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র গঙ্গানারায়ণ উচ্চস্তরের ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক ছিলেন। ইনি দিল্লীতে হাদু খাঁ'এর কাছে খেয়াল শিখে এসেছিলেন। এঁর গানে সেই জন্য খুব বেশী হলক্ তান থাকত। বিষ্ণুপুরে বিভিন্ন গায়কী ও বাদন ক্রিয়ার অভাব ছিলনা। বরাবর এই দু'টির উপর বিশেষ ভাবে প্রদর্শনী করে দেখাবার মত পরিচয় পেকে এসেছে॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অনন্ত লালের পরিচয়।—

ইনি আমার পিতামহের আপন জেঠামশায়-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। এঁর পিতা সঙ্গীতের চর্চা রাখেন নি। এজন্য আমাদের বংশধারার দুটি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাখার এই শাখাটির ছেদ পড়ে গিয়েছিল। অনন্তলালের দ্বারা সংযোগ স্থাপিত হয়।

অনন্তলাল প্রথমে তাঁর খুল্লতাত (আমার প্রপিতামহ) ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট সংস্কৃত, ভাগবত ও সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন, কিন্তু আমার প্রপিতামহ দেশে খুব কম থাকতেন বলে অনন্তলালকে আচার্য্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের কাছে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে সমস্ত বস্তু সংগৃহীত হয়েছিল তার প্রায় অধিকাংশই আচার্য্য রামশঙ্করের কাছে পেয়ে এবং বিশেষ করে নিজ ঘরাণার মাধ্যমে ইনি সংরক্ষণ করেছিলেন। অভাবনীয় ক্ষমতায় তিনি অত সংখ্যক গীতাদি সম্পূর্ণ আয়ত্তে রেখেছিলেন এবং শিক্ষা দেওয়ার ঐকান্তিক কামনায় অকাতরে দান করে গেছেন। এই ব্রত যদি তিনি না গ্রহণ করতেন তাহলে মনে হয় বিষ্ণুপুর ঘরাণার পরিচয় রবি অস্তমিত হয়ে যেত।

এঁর প্রধান ছাত্রদের মধ্যে দেশ বিখ্যাত গায়ক রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, জৈষ্ঠ পুত্র রামপ্রসন্ন এবং মধ্যম পুত্র গোপেশ্বর ও ভ্রাতষ্পুত্র অম্বিকা চরণ। তাছাড়া ছিলেন বিপিন বিহারী দেব ঘরিয়া, হারাধন দেব ঘরিয়া, পাখোওয়াজে বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র সরকার। বিপিন বিহারী সুরবাহার, সেতার এবং এসরাজেও পারদর্শী ছিলেন। ইনি কোলকাতার প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামানিকের গৃহ শিক্ষক ছিলেন আজীবন। হারাধন বিষ্ণুপুর সংগীত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এঁদের জৈষ্ঠ ভ্রাতা উদ্ধব চন্দ্রের একমাত্র পুত্র হরিদাসই এই বংশে সঙ্গীতের চর্চা রেখে ওই ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন।

অনন্তলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গীতাচার্য্য রামপ্রসন্ন ছিলেন বড়দরের ধ্রুপদ গায়ক এবং অদ্বিতীয় সুরবাহার, ও সেতার বাদক। তাছাড়া ন্যাসতরঙ্গ, জলতরঙ্গ, এসরাজ, বীণা, পাখোওয়াজ, তবলা প্রভৃতি বাদনেও দক্ষ শিল্পী ছিলেন। প্রাচীন বহু ধ্রুপদ ও খেয়াল ইত্যাদি গানের স্বরলিপি সহ এঁর রচিত 'সঙ্গীত মঞ্জরী' গ্রন্থটি রাগরূপের শাশ্বত নীতিধারার বাহকরূপে আদর্শ গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। এছাড়া এঁর প্রণীত মৃদঙ্গদর্পণ, পরিবাদিনী (সেতার) শিক্ষা ও এসরাজ শিক্ষার গ্রন্থগুলিও শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব মূল্যবান। উক্ত গুণীর সুরবাহার শুনে বরোদার মহারাজা তাঁর দরবারের প্রধান যন্ত্রীরূপে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিনি তখন মেদনীপুর জেলার নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খানএর শিক্ষা গুরু ছিলেন। রাজা প্রকৃত গুরুর মত তাঁকে মান্য করতেন বলে শিষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের ধর্ম রক্ষায় অতবড় পদ গ্রহণ করেন নি। এ এক বিস্ময়কর ত্যাগের নজীর। এই বিবরণটি নাড়াজোল রাজ গভীর প্রেরণা নিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে আমাদের কাছে কয়েকবারই বলেছিলেন। এবং মন্তব্যে জানাতেন; "ওস্তাদজীর (রামপ্রসন্ন) মত এ রকম কর্ত্তব্য পরায়ন ও ত্যাগের মানুষ দেখা যায় না।" বোমার মামলা ঘটিত ব্যাপারে নাড়াজোল রাজকে যখন মেদনীপুর জেলে বন্দী করে রেখেছিল তখন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর কাছে যাতায়াতের জন্য একজন আপন ব্যক্তিদের মধ্যে কাকে চান জিজ্ঞেস করায় রাজা বলেছিলেন কেবলমাত্র ওস্তাদজীকে আসবার অনুমতি দেওয়া হোক, তাঁর সুরবাহার শুনে আমি সব ভুলে থাকব।" এঁরা সত্যই গুরু শিষ্য একাত্ম হয়ে গেছলেন— প্রকৃত আদর্শের প্রতীক রূপে। নাড়াজোল রাজা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বলেছিলেন—"ওস্তাদজী যখন সুরবাহার বাজাতেন তখন জেলের প্রধান থেকে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা এসে একাগ্র হয়ে শুনতেন।" উক্ত রাজা এক সময় বড় কাকার বিষ্ণুপুর গৃহে এসে দু'একদিন ছিলেন। দেশবিখ্যাত মহিয়সী সরোজিনী-নাইডু, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একসময় সুরবাহার শুনে বলেছিলেন —শুনে আশ মিটলনা, মনে হচ্ছে সমস্ত রাত ধরে শুনি…।" কোলকাতার অন্তর্গত ইণ্টালীর জমীদার দেববাবু এলবার্ট হলের কনফারেন্সে আমাকে উক্ত বড় কাকার পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"একবার আমরা রামপ্রসন্ন বাবুর এবং ইনায়েত খাঁ এর সুরবাহার শুনবার আয়োজন করেছিলাম। বহু গুণগ্রাহী শ্রোতা উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রথমতঃ রামপ্রসন্ন বাবু আরম্ভ করেন। ঘণ্টাধিক ধরে ইমন-কল্যাণের আলাপ বাজিয়ে সমাধা করলেন। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। তারপর ইনায়েত খাঁ সাহেবকে আমরা বাজাবার জন্য অনুরোধ জানালাম। খাঁ সাহেব বললেন,—"ইন্‌কা পর ম্যায় ক্যা বজাউঙ্গা।" বাজালেন না।'

বড় কাকার সম্বন্ধে এরূপ বহু ঘটনা বলবার আছে। ময়ূরভঞ্জের মহারাজকে যখন সেতার শেখাতেন—তখন মহারাজা একদিন বড়কাকাকে বলেন— "আমার আকাঙ্খানুযায়ী আপনার কাছে ইমনের চারটি গৎ শিখেছি। যদি আরো শিখতে চাই তাহ'লে শেখাতে পারবেন?" বড়কাকা উত্তরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলেছিলেন—"আপনি সারাজীবন যদি ইমনের গৎ শিখতে চান তাহলে তা শেখাতে আমার কোন অসুবিধা হবে না।" রাগের ও তালের উপর প্রকৃত দখল থাকলে সংগে সংগে নূতন নূতন গৎ ও গান স্বষ্টি হয়ে যায়। এই শক্তি প্রকৃত গুণীদের মধ্যেই থাকে এবং তা থেকে এসেছে আমাদের বংশের বড়দরের সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই।

বড়কাকা আমাদের দেশের প্রত্যেকের কাছে ওস্তাদজী নামে পরিচিত ছিলেন। এই সম্বোধন অন্য আর কেউ পায়নি।

উক্ত সঙ্গীতাচার্য্যের চার পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ। ইনি প্রথমে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, পরে জামসেদপুরে গিয়ে সেখানেই বরাবর শিক্ষকতা করছেন। এঁর নাম পরেশ চন্দ্র।

দ্বিতীয় পুত্রও গায়ক ছিলেন। তৃতীয় পুত্রের নাম যোগেশ চন্দ্র। ইনি সেতার বাদনে খুবই পারদর্শী; ইনিও থাকেন জামসেদপুরে। এঁর এক পুত্র সেতারে তালিম পাচ্ছে। চতুর্থ পুত্রের নাম অশেষ চন্দ্র, ইনি একজন এসরাজ বাদনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, বিশ্বভারতীশান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনের অধ্যাপক। উক্তগুণীর জৈষ্ঠাকন্যার তিনপুত্রও সেতার বাদ্যের চর্চায় উন্নতি করেছে। বড়কাকার ছাত্রদের মধ্যে এখনকার বিশেষ পরিচিত গোকুলচন্দ্র নাগ। এঁর পুত্র মনিলাল বিখ্যাত সেতার বাদক।

অনন্তলালের দ্বিতীয় পুত্র আমার মেজকাকা সঙ্গীতগুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শাস্ত্রীয়সংগীতের উপর সুনাম সর্বজন বিদিত। সঙ্গীতে এঁর শক্তির বিপুলতা পরিমাপ করা যায় না। বহু গ্রন্থরচনার মাধ্যমে এঁর অবদান আদর্শ স্বরূপ হয়ে আছে। শ্রেণীগত বিবিধ বস্তুর মধ্যে বিশেষ করে কণ্ঠসঙ্গীতে পারঙ্গম ছিলেন। সুরবাহার, সেতার, এসরাজ, জলতরঙ্গ, ও পাখোওয়াজ বাদনেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। বহু বৎসর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ বাহাদুরের দরবারে প্রধান গায়ক ও যন্ত্রীর পদে ছিলেন। পরে কোলকাতায় ময়ূরভঞ্জ মহারাজার কাছেও বহুদিন ছিলেন। কোলকাতায় বহু বৎসর থাকার সময়ে এঁর যাঁরা ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন তাঁদের মধ্যে পাইকপাড়ার রাজা বিমল সিংহ, স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সহধর্মিনী লেডি প্রতিভা চৌধুরাণী, মিসেস কে, সি, দে, স্যার রাজেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী, এবং প্রেমলতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেবী, এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখনকার 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' নামক বিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কণ্ঠ সঙ্গীতের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র এঁর কাছে বহুদিন ধ্রুপদ শিখেছিলেন। উক্ত গুণী পরে বিষ্ণুপুরে স্থায়ীভাবে থেকে সেখানের সংগীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে ছিলেন। ইং ১৯১৯ সাল থেকে যে কয়েক বছর ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তির দ্বারা পশ্চিম ভারতে যে যে সময়ে 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন' হয়েছিল তাতে তিনি গায়ক হিসেবে সাগ্রহ আহ্বান পেয়ে যোগদান করেছিলেন। এমন কি মেম্বারের পদও পেয়েছিলেন। একমাত্র ভাতখণ্ডেজীর মত ব্যক্তিরা এবং পশ্চিমের বড় রাজদরবারের ধ্রুপদী এবং বীণকার গুণী দু'একজন ওই পদের অধিকারী ছিলেন। উক্তগুণী বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন থেকে 'দেশীকোত্তম' এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে 'স্বর সরস্বতী' উপাধি লাভ করেছিলেন। এঁর রচিত সঙ্গীতের গ্রন্থ 'সংগীত চন্দ্রিকা'-র প্রথম খণ্ডে ঔপপত্তিক বিষয় এবং দিবা প্রথম প্রহর হতে চতুর্থ প্রহরের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত রাগের বহু ধ্রুপদ গান প্রদত্ত হয়েছে। এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে রাত্রি প্রথম প্রহর হতে চতুর্থ প্রহরের মধ্যে সমস্ত রাগের উপর বহু সংখ্যক ধ্রুপদ গান এবং সমস্ত শ্রেণীগত বস্তুর গান ইত্যাদি। (পূর্ব্বোল্লেখিত 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' গ্রন্থেও পৃথক ভাবে ওই সব বস্তু দেওয়া আছে।)

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা সমৃদ্ধ বইগুলির নাম যথা—'সঙ্গীত-লহরী,' 'তান-মালা,' 'গীত দর্পণ,' ইত্যাদি। আরো অন্য প্রকারের কয়েকটি গ্রন্থ আছে। ইনি বহু সংখ্যক ধ্রুপদ ও খেয়াল প্রভৃতি গান অতি উত্তম বন্দেজের উপর রচনা করেছিলেন। এঁর অন্যান্য কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রীও সে যুগে বেশ নাম করেছিলেন। ছয় পুত্রের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশ চন্দ্র। ইনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ভজন ছাড়াও উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত প্রভৃতি সব রকম গানই গাইতে পারতেন, তবে আসরে বেশীর ভাগই ধ্রুপদ গাইতেন। ইনি খেয়াল ইত্যাদি গান আমার কাছেও শিখেছিলেন ও তালিম নিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডিন্'-এর পদে ছিলেন। এঁর ছয় পুত্রের মধ্যে কেউই সঙ্গীতের চর্চা করেনি। মেজকাকার অন্যান্য পুত্রদের নাম যথা,— নরেশ, গণেশ, নেপাল, আর একজনের নাম মনে নেই, এঁরা প্রত্যেকেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। আর একটি পুত্র জীবিত নেই, সে বেশ ভাল গাইতে পারত। এঁর স্ত্রীও ধ্রুপদ ভালভাবে গাইতে পারেন। মেজকাকার সম্বন্ধে আর একটি পরিচয় প্রদানের কথা মনে পড়ে গেল। ১৯২৫ সালে লক্ষ্ণৌতে 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন' হয়েছিল। ওই সম্মেলনে আমিও গায়ক হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ওই সম্মেলনে মেজকাকার সংগে থাকার স্থান সেণ্ট্রাল হোটেল থেকে প্রথম দিনের প্রাতঃকালের অধিবেশনে উপস্থিত হবার জন্য যখন মণ্ডপে যাচ্ছি, তখন একজন ইংরেজী ব্যাণ্ড মাষ্টারের মত পোষাক পরিহিত এক মুসলমান ব্যক্তি দ্রুতপদে আমাদের কাছে এসে মেজকাকা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে নতজানু হয়ে কুর্নিশ করে বললেন—"আপনার 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা' গ্রন্থের মধ্যে যে ফটো আছে তার সংগে আপনার চেহারার হুবহু মিল দেখে ছুটে এসেছি, আপনি আমার গ্রন্থগুরু,— আপনার 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা'র ধ্রুপদ সমূহ আমার রাগরূপের উপর জ্ঞান-বোধে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। প্রাচীন ধ্রুপদই হল শাশ্বত রাগরূপের প্রতীক পরিচয়, যা কেবল মাত্র এখন আপনাদের ঘরাণাতেই আছে। আমার নাম আলাউদ্দীন, মাইহার ষ্টেটে থাকি, রাজার ইচ্ছাক্রমে আমি ভারতীয় রাগরূপের উপর ভারতীয় যন্ত্রের দ্বারা ব্যাণ্ড পার্টি তৈরি করেছি। কন্‌ফারেন্সে আপনারা শুনে আমাকে একটু বলবেন কি রকম শুনতে লেগেছিল। আমি মনে করছি এরপর শরোদ বাদ্য অভ্যাস করব। আমি প্রধানতঃ চর্চা রাখি বেহালার উপরই এবং আসরে ওই যন্ত্রই বাজাই, কিন্তু এই যন্ত্রটির আজ পর্যন্ত ওস্তাদ সমাজে তেমন সমাদর নেই বলে শরোদের উপর পরিচয় রাখবার চেষ্টা করব বলেই মনস্থির করেছি।"

আলাউদ্দীন সাহেবের ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা খুব ভাল লেগেছিল। তিনি নিজেও সম্মেলনে একদিন বেহালা বাজিয়েছিলেন খুব তৈরির উপর॥

মেজকাকা অর্থাৎ আমার গুরুর প্রতিষ্ঠা, সম্মান, ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে আরো কয়েকটি পরিচয়।

স্বচক্ষে দেখে এসেছি সঙ্গীতের ক্রিয়াঙ্গের ও তত্ত্বাঙ্গের উপর এঁর বিপুল অধিকার এবং স্বরলিপি সহ শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের বহুবিধ গীতাদির দ্বারা নানান গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে, যে বিরাট অবদান ওনার তার উপর গভীর শ্রদ্ধা, উপযুক্ত সম্মান-স্বীকৃতি জানিয়ে এসেছিলেন ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি বড় বড় সঙ্গীত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেত্তাগণ। প্রকৃত গুণী কথার যে অর্থ, তার পরিপূর্ণতা এঁর মধ্যে ছিল। তার একটি অন্যতম পরিচয়, অধিকাংশ রাগের ধ্রুপদ ; খেয়াল তাঁর জানা ছিল বিভিন্ন তালের উপর ছ'সাতটি করে। শুনতে চাইলে তৎক্ষণাৎ শুনিয়ে দিতেন। এত সংগ্রহ ও মুখস্থ রাখার নজীর অন্য কারোর কাছে পাইনি। এঁর মত শিক্ষাদানে কামনাময় অথচ নিঃস্বার্থ মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ; ডেকে ডেকে শেখাতেন, বলতেন—মূল্যবান জিনিসগুলো সকলের মধ্যে থেকে যাক। কিন্তু তাঁর এত বড় কামনার উপর এখন 'হা-হতোস্মি' এই কথা উচ্চারিত হয় এবং একটা বড় রকম নিঃশ্বাস পড়ে যায়।

উক্ত মহান ব্যক্তির নীতি নিয়ম রক্ষার উপর কর্ত্তব্য পালন এবং সাধনায় অনুরাগ ও গাইবার প্রস্তুতি ছিল মহৎ দৃষ্টান্ত স্বরূপ। একবার শ্রীরামপুর নামক পরিচিত স্থানে সেখানের ধ্রুপদরসগুণগ্রাহীরা উক্ত গুণীর এবং আমার গান শুনবার জন্য যথোচিত আয়োজন করে নিয়ে যান। আসরে যে তানপুরাটি রাখা ছিল সেটি ডি-সার্পে (তখন আমরা ওই সুরেই গাইতাম) বাঁধতে গিয়ে পঞ্চম ও জুড়ির তারগুলো কেটে গেল, খুব পুরাতন ছিল বলে।

আসর অনুষ্ঠাতারা খুব ভাবনায় পড়লেন, আর একটি তানপুরা তখন জোগাড় করা মুস্কিল বলে। আমার ওই গুরু বললেন, খরজের তারটা তো আছে, ওতেই কাজ চালিয়ে নেবো, তেমন অবস্থায় পড়লে শুধু গলাতেও আসরে গাইতে অসুবিধা বোধ করব না। গাইলেন দু'ঘণ্টা ধরে ধ্রুপদ। আমাকেও গাইতে হয়েছিল ওই ভাবেই। প্রথম থেকেই স্বনির্ভর হবার উপদেশ পেয়েছিলাম। ওই দিন পাখোয়াজে সঙ্গত করেছিলেন বিখ্যাত মৃদঙ্গবিদ্ নগেনবাবু।

একবার গ্রে ষ্ট্রীটের (কলিকাতা) এক বড়লোকের বাড়ীতে বিবাহের বৌভাত উপলক্ষ্যে আমার ও ওই কাকার ধ্রুপদগানের ব্যবস্থা হয়েছিল। খাওয়ার উপরই আকর্ষণ যে ব্যবস্থার মধ্যে সর্বপ্রধান হয়ে থাকে সেখানে গানের আসর, তাও আবার ধ্রুপদ গানের মত গানের ব্যবস্থা করা বিড়ম্বনার নামান্তর। গৃহস্বামী এই গানে খুব অনুরক্ত ছিলেন তাই তাঁর মন টেনেছিল সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ জিনিস শুনাবার জন্য, কিন্তু ভাবেন নি কাদের শুনাব। যাইহোক—আমরা যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে আসরের বিরাট হল ঘরে ঢুকে দেখি এক কোণে যন্ত্রগুলি থাকার মত জায়গাটুকু বাদ দিয়ে স্থানে স্থানে চক্রাকারে বড় বড়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হোমড়া চোমড়া ব্যক্তিরা বসে গল্প-গুজব করছেন। আমরা বসেই আছি, তাঁরা শ্রদ্ধানুষ্ঠানে কীর্ত্তনীয়াদের যেমন ভাবেন সেইরূপই মনে হল তাঁরা আমাদের মনে করে নিয়েছেন। মেজকাকা পাখোয়াা বাদক কেবলবাবুকে বললেন—সুরটা বেঁধে আটাটা চড়িয়ে নিন—গাওয়া যাক। আমি বললাম কেউ বলছেনা গাইতে, শুধু শুধু বেনাবনে মুক্ত ছড়াবেন ? কাকা বললেন,— কেউ নাইবা শুনল, আমি ঘরে এই সময় সাধতাম—সেটা এখানেই সেধে নিই, শুধু শুধু সময় নষ্ট করব কেন ? গান ধরতেই দু'চারজন কাছে বসা ব্যক্তি আমাদের দিকে বিপুল দেহগুলি একটু সরিয়ে ডান হাত তুলে কৃপা নির্দেশের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন—হোক্—হোক্।

তখনও এই গান বুঝবার মত জ্ঞান বর্জিত হতভাগা লোক যে ছিলনা বড়দের মধ্যে তা নয়। আর একবার আমাদের ধ্রুপদগান শুনার ব্যবস্থা করার জন্য খুব আগ্রহ নিয়ে ভবানীপুর অঞ্চলের (কলিকাতা) দু'চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এলেন সুকীয়া ষ্ট্রীটে মেজকাকার বাসায়, আমি সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

কাকার সম্মতি সংগে সংগে পেয়ে তাঁরা জানিয়ে গেলেন শনিবার সন্ধ্যায় ঠিক ৬টার সময় গাড়ী নিয়ে আসবেন। কথামত যথা সময়ে সুকীয়া ষ্ট্রীটের বাসায় উপস্থিত হয়ে দেখি সঙ্গীতগুরু প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। ৬টা বাজবার পূর্বক্ষণে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন—আর বলছেন গাড়ী এল বলে। ৬টা বাজবার একটু পরেই চাকরকে ডেকে বললেন একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে। আমি বললাম আরো একটু অপেক্ষা করুন। বললেন, তা হয় না, নিশ্চয়ই তাঁরা কোন অসুবিধায় পড়েছেন, আসতে বিলম্ব হতে পারে, শ্রোতারা সময়ে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন—সেটা ভাল নয়, শুধু শুধু কারো সময় নষ্ট করে দেওয়া উচিত নয়। আমরা সেখানে পৌছনর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের গাড়ী এসে দাঁড়াল। যিনি আনতে গিয়েছিলেন তিনি বললেন, আপনার বাসায় পৌছা মাত্র শুনলাম আপনারা একটু আগেই রওনা হয়েছেন।

অনেকক্ষণ ধরে উভয়ের গান হল। তাঁদের গাড়ীতে পৌছে দেবার সময় ট্যাক্সির ভাড়া বাবদ টাকা দিতে যাওয়ায় কাকা কোন মতেই নিলেন না, বললেন ও খরচটা ন্যায়তঃ আমারই। এই কথা শুনে তাঁরা বিহ্বল হয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পড়লেন, দেখেছিলাম চোখগুলো সকলেরই চকচকিয়ে উঠেছিল।

যিনি এই রকম ব্যক্তি, যাঁর উপর গভীর শ্রদ্ধা ও বিপুল পরিচয়ের উপর সম্মান রেখে রাজ্যপাল থাকার সময় মাননীয়া পদ্মজা নাইডু অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী থাকার সংবাদ পেয়ে বাঁকুড়া থেকে বিষ্ণুপুরে গিয়ে দেখে আসেন, বিশ্বভারতীর সমাবর্ত্তনে দেশীকোত্তম উপাধি প্রদানের সময় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুজী মঞ্চের থেকে নেমে এসে উপাধি পত্রটি হাতে তুলে দেন, সেই গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তির পরিচয় রাষ্ট্রকর্ণধারদের যথাস্থানে পৌঁছল না। প্রকৃতভাবে পৌঁছলে রাষ্ট্রিয় মর্য্যাদা ও উপযুক্ত উপাধি নিশ্চয়ই পেতেন। তবে 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেলে নিতেন কিনা জানিনা, কারণ ওই উপাধি যত্রতত্র বিতরণ হচ্ছে, অর্থাৎ অতি সাধারণ গায়ক-বাদকদের মধ্যেও। যাই হোক—এ স্থলে এ কথাই বলব, পাওয়া বস্তুটা একমাত্র ভাগ্যের উপরই নির্ভর করে। যশ ও অর্থভাগ্যদেবতার যে দু'টি প্রধান বাহন আছে তারা হল তদ্‌বির ও ঢাক; এরা বিশেষ করে সঙ্গীতজ্ঞদের ক্ষেত্রে জুড়িঘোড়ার মত ভাগ্যদেবতাকে টেনে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয় যথাস্থানে। সুতরাং প্রচুর সামর্থ্য ও অনন্যসাধারণ শক্তি নিয়ে এইসব বস্তু না পাওয়ার উপর ক্ষোভ না থাকাই উচিত। তবে যেখানে ব্যবহারে নিন্দনীয় তারতম্য থাকে, সম্মানকে ক্ষুণ্ণ ক'রে, সেখানে প্রবল প্রতিবাদ জানান সকলেরই কর্ত্তব্য। এইরূপে আচরণের পরিচয় একটা তুলে ধরছি। ১৯৭৫ সালের 'বেতার জগৎ' পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় কতকগুলি গায়ক বাদকদের জমকাল ফটোর নীচে 'ওস্তাদ' 'পণ্ডিত' উপাধি দেওয়া হয়েছে, আর উক্ত বর্ণিত গুরুর একটি সাধারণ ফটোর নীচে বয়ঃ কনিষ্ঠের মত নামটিই শুধু আছে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সঙ্গীত নায়ক' রবীন্দ্রনাথের দেওয়া 'সুর সরস্বতী' এই উপাধির যে কোন একটি লিখবার জন্য কলম তুলতে মন না চাইলেও অন্ততঃ 'সঙ্গীতাচার্য্য,' কিংবা বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এই পরিচয় নামের পূর্বে দিয়ে অতবড় ব্যক্তির মর্য্যাদার দিকে তাকানর কি আবশ্যক ছিল না? এই এতবড় পার্থক্য রাখার হেতু ও অর্থ কি আছে তা বিশদভাবে জানবার দাবি নিশ্চয়ই আছে। এই দাবি শুধু এঁর জন্যই নয় প্রত্যেক শিল্পীর মর্য্যাদার জন্যও। কর্মকর্ত্তাদের এই দৌর্ব্বল্যতা ঘোরতর অপরাধ তুল্য। এই বিষয়ে বিচার যুক্তির জ্ঞান বোধ রাখার সামর্থ্য যদি না থাকে তাহলে নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার জন্য সকলের প্রতি সমভাব দেখিয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হয়। আমি আশ্চর্য্য হই, আমাদেধ সঙ্গীতজ্ঞ গোষ্ঠী এই রকম বহু বিষয়েই অমর্য্যাদাকর ব্যবহারের প্রতিবাদ না করে নির্বিকার ভাবে মুখ বুজে থাকেন। বুঝিনা, তাঁরা কোন্‌টাকে সংরক্ষণের উপযোগী মনে করেন, সম্মান—মর্য্যাদা, না গোবেচারি ভালমানুষ হয়ে থাকা? সঙ্গীতজ্ঞগোষ্ঠী আত্মসচেতন হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হোন এই একান্ত অনুরোধ॥

আমার গুরুর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকার' নূতন সংস্করণ সম্বন্ধে আমার তরফ থেকে কিছু বক্তব্য আছে। এখন যাঁরা এই গ্রন্থ সংগ্রহ করবেন তাঁরা অনেক বিষয়ে পূর্বেকার গ্রন্থে দেওয়া রাগরূপের প্রকৃত পরিচয় পাবেন না, কারণ তাঁর বড় পুত্র রমেশচন্দ্র বিচার বোধকে সরিয়ে; আধুনিক ছাঁচে ঢেলেছেন। এরূপ করাকে আমি গুরুতর অন্যায় মনে করি। বর্তমানের সংগে একাকার করতে গিয়ে প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে রাগরূপের স্মৃষ্টির বিশুদ্ধ পরিচয় আমাদের ঘরাণায় যা অব্যাহত ছিল তাকে লোপ করে দেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের মত কাজ হয় নি। এই গ্রন্থে আগের সংস্করণ এবং বড় কাকা রাধাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সঙ্গীত মঞ্জরী' নামক বৃহৎ গ্রন্থটির সংগে পরিচয় থাকলে সহজেই প্রত্যক্ষ হবে ভূলের চিত্রগুলি। অহেতুক পরিবর্ত্তনে আনা মনের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়॥

এখন আগেকার সূত্র ধরে অনন্তলালের তৃতীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় জ্ঞাপন করব। ইনি গীত-বাদ্যাদি শিক্ষা করেছিলেন দুই অগ্রজের কাছে। কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের বিবিধ বিষয়ের উপর এঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। তার মধ্যে সুরবাহার বাদ্যের উপর দক্ষতা ছিল উচ্চ স্তরের।

ধ্রুপদাঙ্গের রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল বীরপঞ্চক, শান্তি, মোহন, দোবাহার, লক্ষ্মী প্রভৃতি তালকে ধরে উক্ত যন্ত্রে তারপরণ সুন্দর ভাবে বাজাতে পারতেন। এরূপ ভাবে প্রায় লুপ্ত তাল গুলির উপর অধিকারের পরিচর আমি অন্য কোথাও পাইনি। এই সব পরিচয়ের মধ্যে বিশেষ করে থাকে গুণী ব্যক্তি কি রকম। উক্ত গুণীর আরো কয়েকটি পরিচয়, ইনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে কিছু দিন ছিলেন। তারপর তাঁর পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে আহ্বান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই ঠাকুর বংশের সংগে ঘনিষ্ট যোগাযোগ হয়। বহু বৎসর ধরে ওঁদের আদিব্রহ্মসমাজের সঙ্গীতজ্ঞের পদে ব্রতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'গীতলিপি' গ্রন্থটির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরলিপি সুরেন্দ্রনাথই করে দেন। উক্ত কবির নিজস্ব সুর সংযোজিত গানের প্রায় অধিকাংশই এঁর জানাছিল সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায়। কোলকাতায় একসময় দীর্ঘকাল ধরে ইনি সম্মান প্রতিষ্ঠার বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গৃহে যখন বিদেশাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসতেন তখন উক্ত গুণীকে সুরবাহার বাজিয়ে শুনাবার জন্য ব্যবস্থা থাকত।

ইনিও কোলকাতা হতে ১৯৪২ সালে মধ্যম অগ্রজের বিষ্ণুপুর আসার সময়েই ওখানে এসে সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সহ অধ্যক্ষের পদ গ্রহন করেন। মেজ কাকার অবসর গ্রহণের পর উনি অধ্যক্ষ হন। বিষ্ণুপুরের গৃহেই পঁচাশী বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে রাষ্ট্রিয় উপাধি 'পদ্মশ্রী' পেয়েছিলেন। এঁর একমাত্র সন্তান বিধবা বিন্দুবাসিনী দেবী বেশ কয়েক বছর ধরে উক্ত বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষিকার পদে ব্রতী আছেন। কণ্ঠে ধ্রুপদ, খেয়াল, রবীন্দ্রনাথের গান এবং বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে সেতার ও এসরাজ ভাল পরিবেশন করতে পারেন।

অনন্ত লালের বিখ্যাত ছাত্র স্বনামধন্য গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর বিরাট নাম চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ইনি কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর প্রধান গায়ক ছিলেন এবং বহরমপুরে মহারাজার প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়ের আচার্য্য ছিলেন। এঁর ছাত্রদের মধ্যে সুপরিচিত নাম, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, গোপেন ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সংগীতে প্রথম হাতে খড়ি হয় আমার কাছে। কোলকাতায় রাধিকাপ্রসাদের যে সব ছাত্র ধ্রুপদগানে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূতনাথ, নকুলচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি কম বয়সে মহিম বাবুর ধ্রুপদ শুনে অতিশয় মুগ্ধ হয়েছিলাম, যেমনি রসাল কণ্ঠ তেমনি ছিল গানের উপর সুরের ভাব ব্যঞ্জনা। ধ্রুপদের অন্তর্নিহিত ভাববস্তুকে বুঝে এবং তার সামগ্রিক পরিচয়ের অধিকার রেখে যদি গাওয়া হয় তাহলেই তার নিজস্ব রূপ ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ থাকবে এবং শ্রোতাদের এই গানকেই বেশী করে আকৃষ্ট করবে। মহিমবাবুর পুত্র ললিত মোহনও ধ্রুপদ গানে অদ্ভুত পারদর্শীতা লাভ করেছিলেন। তাঁর গাইবার প্রণালী যেমন সুন্দর ছিল, তেমনি গায়কীও। এঁর এক পুত্রও ধ্রুপদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গানে ক্ষমতা লাভ করেছেন। এ সবই বিষ্ণুপুর ঘরাণার পরিচয়। রাধিকা প্রসাদের অন্যতম যে ছাত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন—তাঁর নাম গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। এঁর যে কয়জন উপযুক্ত ছাত্র, তাঁরা সকলেই খেয়াল ও ঠুম্‌রীগানে সুপরিচিত। তাঁদের নাম, যথা,—তারাপদ চক্রবর্তী, (জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ বলেছিল তারাপদ আমার কাছে প্রথমে শিক্ষা করে) সুখেন্দু গোস্বামী, যামিনী ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেশ রায়, রথীন চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, এ, কানন প্রভৃতি। এঁরা এবং এঁদের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকেই বিষ্ণুপুর ঘরাণার সংগে সংযুক্ত। এমন কি অন্যান্য অধিকাংশ সঙ্গীত চর্চারত ব্যক্তিরাও। আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব যে বিষ্ণুপুর ঘরাণা,-সে কথা বিশেষ ভাবে জানিয়েছি। উক্ত খাঁ সাহেব বলেছিলেন-সঙ্গীতগুরু নীল মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় যদি আমাকে স্থান না দিতেন তাহলে আমাকে দেশে পালিয়ে যেতে হত। তিনিই আমার সফল দেবতা। স্বনামধন্য রাধিকাপ্রসাদ ধ্রুপদ-খেয়াল ও টপ্পা এই তিনেতেই সমধিক দখলকার ছিলেন এবং তার সংগে ভক্তিমূলক গান এক উচ্চস্তরের ভজনও। রামকেলী ও গান্ধারী রাগের দুটি হিন্দী খেয়ালের হুবহু বাংলায় রচিত রবীন্দ্রনাথের গান, উক্ত গুণী রেকর্ডে গেয়েছিলেন। তানযুক্ত ওই গান দু'টি তখন প্রত্যহ প্রাতে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত শুনতেন। গানদুটির কথায় সম্মুখ,-'স্বপন যদি ভাঙ্গিলে,' বিমল আনন্দে জাগরে।'

রবীন্দ্রনাথের সুরের ও রাগরূপের উপর দখল এবং সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ের পরিচয় যদি বিশ্বের দরবারে রাখা হয়, তাহলে একমাত্র তাতে বিষ্ণুপুর ঘরাণারই নাম থাকবে।

রাধিকাপ্রসাদ কোলকাতা পাথুরিয়া ঘাটার জমীদার ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের কাছেও ছিলেন গুরুর অধিক সম্মানের উপর। গানে যেমন তাঁর তৈরীর উপর সাত্ত্বিক ভাবরসের স্রোত ধারা প্রবাহিত হত, তেমনি ছিল ব্যবহারে ও মূর্ত্তির মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব। এই সব বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের কথা মনে হলে শ্রদ্ধার মাথা নেমে আসে। আমার প্রতি তিনি যে ধারণা রেখে লোকের কাছে পরিচয় দিতেন তাতে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম।।

অনন্তলালের আর এক ছাত্রের নাম অম্বিকাচরণ। ইনি আমার আপন কাকা। এঁর ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদির উপর দখল কত উচ্চস্থানে ছিল তার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিচয় আগে দেওয়া আছে খোঙ্গার কথক কংশের বৃদ্ধ গায়ক গুণীর প্রশংসা মুখর কাব্যের দ্বারা। ইনি সংস্কৃতে শুধু কাব্যতীর্থ ছিলেন বটে কিন্তু ব্যাকরণ বেদান্ত, তন্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। এঁর পিতা অর্থাৎ আমার পিতামহকে প্রায় সর্বদাই বাইরের আহ্বানে বিদেশে যেতে হত, তাই আমার ওই কাকা অনন্ত লালের কাছে প্রথম থেকে কণ্ঠ সংগীতে তালিম নেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ আমার পিতার কাছে সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যয়নে নিযুক্ত হন,পরে বিষ্ণুপুর তথা বাংলার মস্তবড় স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিতশিরমণি রঘুরাম ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। উক্ত মহান পণ্ডিতের উর্দ্ধতন বংশে যদুভট্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমার ওই কাকার তের, চোদ্দ বছর বয়সে গাওয়ার একটু পরিচয় ; একদিন আমাদের বৈঠকখানায় কাকা গান সাধছেন, ঘর থেকে অনন্তলালের কানে যেতেই তিনি মেজকাকাকে বলেন—গোপু ! রাধু (রাধিকা প্রসাদ) কখন এল ?

মেজকাকা বলেন—রাধুদা তো কই আসেননি ; অম্বুদা' গান করছেন।

অনন্তলাল বলেন—'অম্বিকা এত ভাল গান করছে, একেবারে রাধুর মত !' রাধিকা প্রসাদের বয়স তখন চব্বিশের মত। এই গল্পটি মেজকাকা অনেক সময় বলতেন।

এক সময় রবীন্দ্র নাথের কাছে গান ও পাণ্ডিত্যের উপর খুব স্বীকৃতিপান। তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ সকলেই কাকার সাত্ত্বিক গানে মুগ্ধ হতেন। আদি ব্রহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্যের পদেও ছিলেন। তবে বেশীদিন তিনি থাকেন নি। চলে আসবার কারণ জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন,—'আমরা যে বিদ্যার আরাধনায় আছি তার যথাযথ সম্মান রাখতে হলে বশ্যতা স্বীকার করা চলে না। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অন্ততঃ যদি সমস্তরেও থাকে তাহলে থাকার কথা তবুও বিবেচনা করা যায়। নিজেকে মনিবের মত ভেবে আমাদের প্রতি ব্যবহার রাখা আমাদের জন্য নয়।' একবার এক মহারাজা কাকার একমাস ভাগবত পাঠ ও গান শুনবার আগ্রহ জানিয়ে মোটাটাকা ধার্য্য করে ম্যানেজারকে দিয়ে চিঠি লেখান। উত্তরে কাকা জানান, 'আমি ব্রাহ্মন-বৈদ্য ও কায়স্থ ছাড়া কারো অর্থ গ্রহন করিনা, এজন্য যেতে অপারগ হওয়ায় দুঃখীত।'

এই সব কারনের জন্য কাকার গানের উপর বিপুলভাবে সাড়াজাগানর মত পরিচয় থাকা সত্বেও যথাযথ হয়ে উঠেনি। আমাদের ঘরানায় বাবা কাকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পর্যন্ত এই আদর্শ ও মর্যাদা রক্ষার সম্বন্ধ রেখে আসার জন্য এঁদের নামের পরিচয় বিস্তৃত হয়নি।

উক্ত কাকা প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং তন্ত্র-সাধনায় নিমগ্ন হন। এই সাধনায় উচ্চস্তরে উঠে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। অনেক সময়ে তাঁর সাধন ক্রিয়াকলাপে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। এঁর মৃত্যুও এক অন্তর আলোড়ন ও বিহ্বলকর এবং কামনাধন্যতার প্রতীক। সকালে, ছোট ছেলেকে দিয়ে বলে পাঠালেন বড়দা'কে (রামপ্রসন্নকে) একবার তাঁর কাছে আসবার জন্য। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন অম্বিকা আমাকে ডেকেছে? কাকা তাঁকে বললেন, 'আমি আজ চলে যাব,-আপনার কাছে থাকা দক্ষিনেশ্বরের মা'এর ফটোটি যদি নিয়ে আসেন সন্ধ্যার পর তাহলে বড় ভাল হয়।' বড় কাকা রামপ্রসন্ন মহাশয় সন্ধ্যার পর ফটোটি নিয়ে কাকার কাছে গেলেন; কাকা তখন ধ্যানে ছিলেন, ডাকতেই বললেন দাদা এসেছেন, ফটোটি আমার সামনে রাখুন এবং 'তাই শিবের নয়ন ভুলেছে···গানটি আপনি গেয়ে যান, আমিও সংগে সংগে গাই।'

গান শেষ হতেই বড় কাকা দেখেন কাকার দেহ দেয়ালের দিকে হেলে গেছে। আম্বিকা করে ডেকে বুকে হাত দিয়ে দেখেন অম্বিকা চলে গেছে। বড় কাকা উচ্চস্বরে কেঁদে বলেন তোকে আমরা চিনতে পারলাম না রে! তুই এত দূরে উঠে গেছলি-একেবারে মায়ের চরণ তলে পৌছবার মত হয়ে!

কাকার বড় পুত্র রামশঙ্কর কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী ও উপযুক্ত শিক্ষক। কোলকাতাতেই বরাবর আছেন সপরিবারে। কাকার অন্য পুত্ররা খুব কম বয়সে মারা যায়।

আমাদের বংশের আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ হরিচরণ পর্য্যন্তই নাম ও তাঁর পরিচয় জানা আছে। প্রদ্যুম্নপুর হতে আগত মল্লরাজার সংগে আমাদের যে পুর্ব পুরুষ এসেছিলেন তাঁর এবং তাঁর পরের পর বংশধরদের নাম আমি সংগ্রহ করতে পারি নি। পরিচয় সংরক্ষণে কর্ত্তব্যের উপর অবহেলাই এর একমাত্র কারণ।

বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীধর চন্দ্রের নাম পরিচয় যতখানি পাওয়া যায় ততখানি তাঁর পিতা হরিচরণ সম্বন্ধে পাওয়া যায় না। তার প্রাধান কারনে জানা যায় ধ্রুপদাদি গানের উপর তাঁর তেমন আস্থা ছিল না তিনি পূর্বপুরুষদের মত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিভিন্নরাগ তালের উপর বেদের স্তোত্র এবং সংস্কৃতে ও বাংলায় রচিত ভগবৎ আরাধনার গানই বেশী করে গাইতে পছন্দ করতেন। তাই ধ্রুপদাদি গানের নূতন রূপের উপর তাঁর প্রতিষ্ঠার পরিচয় ছিল না। অবশ্য তিনি এ সব গানও জানতেন এবং তাঁর পুত্র শ্রীধরচন্দ্রকে শিখিয়ে ছিলেন। শ্রীধরচন্দ্রও এই গানের উপর তেমন নাম করতে পারেননি। তাঁর কারণ, তিনি খুব প্রচার বিমুখ ছিলেন। ইনি সংস্কৃতেও সুপণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীধরচন্দ্রের কয়েক পুরুষ আগে থাকতে মাত্র এক একটি করেই পুত্র সন্তানের জন্ম পরিচয় থেকে এসেছিল। তারপর শ্রীধর চন্দ্রের তিন পুত্র হয়। বড় পুত্র গঙ্গানারায়ণ অর্থাৎ অনন্তলালের পিতার পরিচয় আগেই দিয়েছি। মধ্যম পুত্র নিরঞ্জন সংসারী হয়ে একটি কণ্যা জন্মাবার পরই সংসার ধর্ম ত্যাগ করে ঈশ্বর ভজনায় নিমগ্ন হন। তিনি সঙ্গীতে অধিকারী ছিলেন কিনা সে পরিচয় আমি তখন নিই নি। শ্রীধরের কনিষ্ঠ পুত্র (আমার প্রপিতামহ) ঘরাণা ঐতিহ্যের সম্পুর্ণ অধিকারী ছিলেন, তিনি যেমন গানে তেমনি ভাগবত পাঠে ও সংস্কৃত বিদ্যায় কৃতবিদ্য ছিলেন। আমার কম বয়সের এক সময় বিষ্ণুপুরের অশীতিপর বৃদ্ধ বিখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হৃষিকেশ সেনগুপ্ত মহাশয় আমার প্রপিতামহের গুণাবলীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"তোমার প্রপিতামহ ঈশ্বরচন্দ্রের মত এত উচ্চগানের গলা এবং খেয়াল ও বাংলা গানে পরিপাটি করে তান দিয়ে গাওয়া আমি আর কারো কাছে শুনিনি। এ পাড়ায় গান হলে ওপাড়ার লোকের কাছে পরিষ্কার ভাবে গান কানে আসত। ইনি তান বহুল গান বাংলা ভাষাতেই বেশী করে গাইতেন।" ঈশ্বরচন্দ্রের তিন পুত্র,—বড় রামকুমার (আমার পিতামহ) মেজ কার্ত্তীকচন্দ্র, ছোট উমেশচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী, একটি পুত্র ও একটি কণ্যা জন্মানর পর মারা যান। দ্বিতীয় পত্নীর দুই পুত্র, এবং দুই কণ্যা ছিল।

আমার পিতামহ রামকুমার যেমন ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ, তেমনি কথকাতা পাঠে কথক চুড়ামণি নামে পরিচিত ছিলেন, এবং তার সংগে উচ্চস্তরের খেয়াল, ঠুংরী গায়ক ও সেতার বাদক ছিলেন।

এঁর পরিচয় আগে কিছু দেওয়া আছে। বড় কাকা রামপ্রসন্ন পিতামহের কাছে সেতারে তালিম নিয়ে প্রায় একশত সং শিখেছিলেন। পূর্ব পুরুষদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বারা সংগৃহীত গৎ সমূহের সংরক্ষক আমার পিতামহই বিশেষ করে ছিলেন। ঠুম্‌রী গান ও তাঁর দ্বারা বেশী সংগৃহীত হয়। বড় কাকা এবং মেজকাকা এঁর কাছে অনেকগুলি করে খেয়াল,-ঠুম্‌রী শিখেছিলেন। পিতামহের আর একটা বিষয়ে বেশ কৃতিত্ব ছিল,—তিনি ছু'হাতের ফুৎকারে রাগের আলাপ ও গৎ বাজাতে পারতেন। এক সময় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পিতামহের হাতের এই ফুৎকারে দরবারী কানড়ার আলাপ শুনে আশ্চর্য্য হয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পিতামহের বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ স্থান ছাড়াও পশ্চিমের বহু বিশিষ্ট স্থানে বঙ্গবাসীদের আহ্বানে যাতায়াত ছিল। বিষ্ণুপুর ঘরাণায় তাঁর মত দেশ-বিদেশে ভ্রমণরত ব্যক্তি কেউ ছিলনা, পরবর্ত্তী সময়েও। এঁর মত মহৎ প্রাণ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি খুব কম দেখেছি। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর সময়ের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত—ভগবানের নাম স্মরণ করে চলে গেছেন। এঁর আপন কনিষ্ঠা ভগিনীও বেশ গাইতে পারতেন। ইনি খুব কম বয়সে বিধবা হয়ে আমার পিতামহের সংসারে আমৃত্যু ছিলেন সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদার উপর। আমার পিতামহী পাঁচ ও তিন বছর বয়সের ছুটি শিশু-পুত্রকে রেখে মারা যাওয়ায় পিতামহের ওই ভগিনীই তাঁদের মানুষ করেন সর্বতোভাবে সুশিক্ষার মাধ্যমে। খুব ভোরে উঠে ঘরের রোয়াকে বসে যখন তিনি ভজন গান গাইতেন তখন মনে হত যেন বাড়ীর পরিবেশ স্বর্গীয় হয়ে উঠেছে। পিতামহও চারদণ্ড রাত থাকতে রাগ সংগীতের উপর স্তোত্র পাঠ করতে করতে গৃহ হতে বহির্গত হতেন গৃহদেবতার পুষ্পচয়নের জন্য। তাঁর ছুই পুত্রও শয্যা ত্যাগ করে প্রস্তুত হয়ে গৃহভ্যন্তরে ধ্রুপদ ভজনায় নিমগ্ন হতেন। সময় সময় আমাদের প্রাচীর বহির্ভাগের পুর্ব দিকের গৃহ হতে বড় কাকার হাতে সুরবাহার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠত ললিত প্রভৃতি রাগের উপর। সঙ্গীতের উপর তখন যে পরিবেশ সৃষ্টি হত তাতে মনে হত যেন সামবেদীয় সঙ্গীত চর্চার মুনি-ঋষিদের গার্হস্থ্য আশ্রমের মত।

পাড়ার প্রায় অধিকাংশ গৃহ হতে সেই সময় চর্চারত ব্যক্তিদের কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্রুপদ গানের ভাব গাম্ভীর্য্যময় সুর ছড়িয়ে পড়ত। জানিনা রাগ-সংগীত চর্চার এই রকম পরিবেশ অন্য কোথায় আর ছিল কিনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গীতের এই রকম পরিবেশে এবং এই রকম বংশে আমার জন্ম পূর্ব জন্মের তপস্থার ফল বলে মনে হয়।

আমার পিতামহের হৃদয়ান্তঃকরণ কত মহৎ ও মানবতাপূর্ণ ছিল তার একটি পরিচয় না দিয়ে পারলাম না। বয়সের এক সময় পৌষ মাসে বাগবাজারে (কোলকাতা) গোকুল মিত্রের গৃহে রক্ষিত বিষ্ণুপুরের ৺শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ-এর সম্মুখে কয়েক দিন ধরে ভাগবত পাঠ করে যেতেন। একবার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আগের দিনে সন্ধ্যায় পাঠ সমাধা করে তাঁর মাতুল সম্পর্কীয় দাদা সেই নীলমাধব চক্রবর্তীর সংগে দেখা করে যখন ফিরছেন তখন অনেকখানি রাত হয়ে গেছে, তাঁর থাকার স্থান ৺মদনমোহন জীউ-এর মন্দির অভিমুখে যেতে যেতে পার্শ্ববর্ত্তী একটি স্থান থেকে নারী কণ্ঠের ডাক এল—ওগো শুনছ!

ডাক কানে আসতেই পিতামহ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করতেই নারীটি হাত নেড়ে তাঁকে কাছে আসতে বলে। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন হাঁ-গা, তুমি আমায় ডাকছ?

নারীটি বলে,—'আজ কিছুমাত্র উপার্জন হয়নি। কাল যে কি খাব তার মত একটিও পয়সা নেই—তুমি যদি এসো…।'

পিতামহ সেদিন পাঠের সময় যে কয়েকটি পয়সা প্রণামী স্বরূপ পেয়েছিলেন সেগুলি তাঁর সর্বদা হাতে থাকা হরিনামের ঝুলিতে রাখা ছিল। ওই দিন তখন রাস্তার কেরোসিনের আলোতে গুণে দেখেন বার আনার মত। সেগুলি নারীটির হাতে তুলে দিয়ে বলেন, মা! এই ক'টি পয়সা তুমি গ্রহন কর, এর বেশী আমার কাছে আর নেই, এই সংগে আমার এই শীতবস্ত্রটি দিচ্ছি তুমি দাঁড়িয়ে থেকে আর এই শীতে কষ্ট করনা। ভগবান তোমার প্রতি যেন কৃপা করেন।" এই বলে দাদু চোখ মুছতে মুছতে চলে আসেন।

পিতামহ যখন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হন তখন পশ্চাতে তাঁর একটি ছাত্র আসছিল। ওই দিক দিয়েই তার বাড়ী ছিল। ওই ঘটনার মুহূর্ত্তে সে হক্‌চকিয়ে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করে পরের দিন তাঁর সঙ্গীতগুরুকে অভিভূতর মত হয়ে ঘটনাটি প্রদান করে বলে—এরকম মহৎ মানুষও আছে!!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই ঘটনাটি আমি শুনেছিলাম উক্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে পিতামহের চরিত্রের গুণ কথন প্রসঙ্গে। পিতামহের কাছেও সংক্ষেপে এই ঘটনাটি শুনেছিলাম নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভাব ও সমবেদনা প্রসঙ্গে।

ঘটনাটি শুনে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম এবং পেয়েছিলাম মানবত্ব বোধের মহান শিক্ষা ও আদর্শ চরিত্রের পরিচয়॥

আমার পিতামহের দুই পুত্রের মধ্যে বড়র নাম শ্রীপতিচরণ, কনিষ্ঠের নাম অম্বিকাচরণ। শ্রীপতিচরণের দুই পুত্র, বড়রামসত্য, কনিষ্ঠ আমি। আমার পিতা ছিলেন বড় দর্শনের উপর বিরাট পণ্ডিত এবং গায়ক; পাখোয়াজও বাজাতে পারতেন,—

ভাগবত পাঠেও তিনি সব শ্রেণীর শ্রোতাদের মন্ত্র মুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। তিনি তাঁর পিতার কাছেই ধ্রুপদ—খেয়াল ইত্যাদি গান শিখেছিলেন। খুব শ্রুতিধর ছিলেন বলে বহু না শেখা গান শুনে শুনেই তাঁর আয়ত্তে এসে গেছল। কমবয়সেই তিনি হটযোগ সাধনায় আসেন, এই সাধনায় দীক্ষা নিয়েছিলেন কাঁশীর বিখ্যাত হটযোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে।—

যোগ সাধনায় মগ্ন থেকে মাঝে মাঝে বলতেন আমি আর বেশীদিন থাকব না। হলও তাই, চল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ এক রোগে আক্রান্ত হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যান রাগরূপের উপর স্তোত্র গাইতে গাইতে।

পিতার অনেকগুলি উচ্চ ভাবযুক্ত গান রচনা করা ছিল, তার মধ্যে কয়েকটি আমার মা মিষ্টি গলায় গাইতেন। শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম ও তার লীলা-বিষয়ক বস্তুকে ধরে বহু গ্রন্থের উপমা উদ্ধৃত করে তার উপর নিজ অভিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় রেখে একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন॥

প্রপিতামহ ঈশ্বর চন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের দুই পুত্রের মধ্যে বড়র নাম কার্ত্তিক চন্দ্র। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং গান, সেতার, এসরাজ বাদ্য, নাটক ও গান রচনায় পারদর্শী ছিলেন। এঁর রচিত 'হিড়ীম্ববধ', 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'রামের বনবাস' প্রভৃতি নাটকগুলি তখন আমাদের দেশের যাত্রায় অভিনীত হত।

হিড়ীম্ব ও ভীমের অলক্ষে ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে জুড়িদের গানের জন্য বাহার রাগের চতুরঙ্গ থেকে তার বাণীর প্রথম ভাব রচনার কথা সমষ্টিকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যথাযথ রেখে, এবং তার স্বরগ্রাম, তেলেনা, পাখোওয়াজের বোলের ছন্দ ও অক্ষরকে সমস্তরে রেখে যুদ্ধের উপযোগী কথার বিন্যাসে এমন ভাবে রচনা করেছিলেন যা বাস্তবিকই কৃতিত্বের অবাক পরিচয়। আর একটি বেশ মজার রচনায় আছে, কর্ত্তা গিন্নির ঝগড়া ও মারামারির বর্ণনা। এটি পাখোয়াজের বোলের মত শুনতে। এই দুইটিই যাঁরা আমার কাছে শুনেছেন তাঁরাই কৌতুক মুগ্ধ হয়ে খুব আনন্দ পেয়েছেন॥

কার্ত্তিক চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্র ছিলেন মস্ত বড় ভাগবত পাঠক, সংস্কৃত বিদ্যায় অধিকারী, গায়ক এবং গীতাদি রচনায় সুনিপুন। ইনি ভাগবত পাঠের বাখ্যায় বড় বড় পণ্ডিতকে মুগ্ধ ও অভিভূত করতেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা তাঁর ভাগবত পাঠ শুনবার জন্য নিয়ে গিয়ে তাঁর পাঠ শ্রবনে অতিশয় মোহিত হন। উমেশ চন্দ্র শুনেন যে রাজগৃহের দুর্গাপূজায় সাত আটশ' ছাগ মেষ, ও মহিষ বলি হয়। একথা শুনে তিনি বলি প্রথার বিরুদ্ধে এমন সব যুক্তির অবতারণা করেন যে, রাজা সেই সব অকাট্য যুক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করে বলির নৃশংস প্রথা তুলে দেন। মহারাজা এঁকে বহু টাকা দিয়েছিলেন।

উমেশচন্দ্র সম্পূর্ণ গীতাকে গানে রচনা করেছিলেন এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল নাড়াজোল রাজের আনুকুল্যে। গ্রন্থটির 'গীতাসঙ্গীত' নাম ছিল। এই গানের কয়েকটি আমি গ্রন্থাকারের কণ্ঠে শুনেছি। খুব ভাল লেগেছিল। গীতার অত শ্লোকের অতসংখ্যক গান রচনা করা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। ইনিও ৺কাশীর বিখ্যাত হট যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন—ওই ক্রিয়াকে ধরে তপস্যার জন্য। আমার আপন কাকাও দীক্ষিত হয়েছিলেন। উমেশ চন্দ্রের বংশে সঙ্গীত চর্চ্চাকারী ব্যক্তি তেমন কেউ নেই। একজন সেতার বাদ্যের চর্চ্চা করেন মাত্র।

এই সব পরিচয়ের মাধ্যমে আমাদের বংশ কিরূপ ছিল তা পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারবেন। আমাদের গৃহের বহু পুঁথি-পুস্তক বিষ্ণুপুর সাহিত্য-শাখা মন্দিরে সংরক্ষিত হয়ে আছে। আমাদের সঙ্গীতঘরাণা এবং চর্চ্চারত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যতটুকু পরিচয় পেয়েছি তাই প্রদান করলাম।

বিষ্ণুপুরে আমার প্রথম বয়সের সময় থেকে যে কয়েকজন পাখোয়াজ বাদককে দেখেছিলাম, তার মধ্যে তিনজন বিখ্যাত বাদক ছিলেন, তাঁদের নাম যথা, গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কীর্ত্তিচন্দ্র গোস্বামী এবং ঈশ্বর চন্দ্র সরকার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গিরিশ চন্দ্র প্রথমে ডালাইডিহার রাজবাড়ী, তারপর নাটোর মহারাজের এবং অগ্রদ্বীপের জমীদারদের মৃদঙ্গ শিক্ষক ছিলেন, শেষে নাড়াজোল রাজবাড়ীর বাদকরূপে নিযুক্ত হন। ইনি মৃদঙ্গ বিদ্যা শিক্ষা দানে প্রকৃত আচার্য্য ছিলেন। এই বাদন ক্রিয়ার উপর এতবড় পণ্ডিত আমি আর দেখিনি। এঁর যত সংখ্যক ছাত্র ছিল, প্রত্যেককেই বাদনে নিপুণ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরে ওই সময় অন্যান্য মৃদঙ্গ বাদক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম, যথা--হরিপদ কর্মকার নিত্যানন্দ গোস্বামী, বিজন বিহারী নন্দী, শ্যামলাল বৈদ্য, কেশব চট্টরাজ, নগেন্দ্র নাথ নন্দী। গায়কদের মধ্যে ছিলেন খেয়াল গানে অতুল কৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, ধ্রুপদে আমার ছাত্র ভোলানাথ নন্দী এবং আরো অনেকে। বর্তমানে বিষ্ণুপুরে গুরু প্রসাদ সরকার এবং চন্দ্রকান্ত সিংহ এঁরা খেয়াল ইত্যাদি গাইতে পারেন। শিক্ষকতা করেন ভাস্কর নন্দী প্রভৃতি। বিষ্ণুপুরে বাঈজীর সংখ্যা বড় কম ছিল না। প্রথম থেকে তার কয়েকজনের নাম যথা,—রাধা, হীরা, মেনকা, তিলত্তমা, মাতঙ্গনী, শচী প্রভৃতি। শেষের দিকে দু'জন বাঈজীর গান আমি শুনেছি। এঁরা খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী এই তিন শ্রেণীর গান খুবই ভাল গাইতে পারতেন। এঁদের নাম ভৈরবী ও লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষা করতে হয়েছিল। বাড়ীতে এলে বলতাম, আগে টপ্পা গান শুনাও। বলামাত্র গোপী যন্ত্র বাজিয়ে ধরে দিত শোরীমিঁয়ার টপ্পা, গমকী তানের ঢেউ এমন ভাবে তুলত, শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম। এখন তার কথা মনে হলেই চোখে জল এসে যায়। কত সাধনা করেছিল, তার পরিণামে রাজ্যের একেবারে পতনের পর তাদের ভিক্ষা বৃত্তি! বিষ্ণুপুরে বাঈজী পাড়া অনেক দিনই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এবং পরে নর্ত্তকী পাড়াও। আগে দেখেছি, যে কোন শুভানুষ্ঠানে নটীদের আহ্বান হত। তারা এসে প্রথমে দু'চারটে মাঙ্গলীক ভাব নিয়ে রচিত ধ্রুবদগান বিভিন্ন তালে গাইত এবং রাগ নির্বাচন সময়োপযোগী মত থাকত। এখনও মনে পড়ে, সুকণ্ঠ নিয়ে তাদের গাওয়া শুক্লবেলাবলী রাগের উপর ঝাঁপতালে 'শুভলগন শুভসদন ছত্রধর মাঈ···।' আড়ানা, ঝাঁপতালে—"শুভঘরি শুভদিন মহবত···।" বিবাহে সাহানা রাগে বিলম্বিত খেয়াল-"রাজদুলারিকা বনরা আইল···।" বেহাগ, তেতাল তালে 'বনরা জাগরে রৈন রঙ্গিলী' ইত্যাদি। সব বিষয়ের উপর এমন আদর্শগত নীতি নিয়ম ধরে সুন্দরভাবে রাগসঙ্গীতের পরিচয় ও প্রতিষ্ঠার তুলনা অন্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোথাও মেলা ভার। রাজারা যখন কোন উদ্দেশ্যে সমারোহের উপর বহির্গত হতেন, তখন সানাইয়ে এক রকম রাগ ও বাদ্য তাল বাজত, আবার প্রত্যাবর্তনের সময় অন্য আর এক রকম রাগ ও তাল বাজত। এইরকম নানান বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট রাগ-তালের পরিচয় ছিল এবং স্তোত্রাদিতেও গীত হত। এসব আমি নিজেও দেখেছি। ঠাকুরদা বলতেন, বিষ্ণুপুরের মন্দির সমূহে প্রাতঃকালে মঙ্গল আরতির সময় এবং রাত্রের আরতির সময় সময়োপযোগী রাগের সুরে দেবতার বন্দনা হত। রাজারা একান্তভাবে রাগসংগীতের পরিচয় যে কোন শুভানুষ্ঠানে রেখেছিলেন, এমনকি মন্ত্র ইত্যাদির উপরও। এ রকম নজীর বোধহয় আর কোথাও সৃষ্টি হয়নি। বিষ্ণুপুরে ঢুলীদারদের বাদ্যের ঠেকা, ক্রিয়াকাণ্ড অনুযায়ী পৃথক পৃথক ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। দূর থেকে শুনতে পেলেই বুঝতে পারি বাদ্যের এই ঠেকায় কোন্ বিষয়বস্তুর পরিচয় আছে। এটিও একটি অপূর্ব পরিচয়, যা অন্য কোথাও আছে বলে জানা যায়না।

কয়েক শতাব্দী ধরে মল্লভূমের চতুর্দিকে ধারাবাহিকভাবে ধ্রুপদাদি সংগীত চর্চার যে পরিচয় ছিল, আমার জানিত তার কয়েকটি স্থানের নাম ; যথা—ভেলাইডিহা ও সীমলাপাল রাজধানী, ছাতনা রাজধানী, রামগড় রাজধানী, মালিয়াড়া রাজধানী (এগুলি মল্লরাজাদের জায়গীরদার), কুঁচিয়াকোল এবং ইন্দাসের জমীদার গ্রামে (এ দুটি উক্ত রাজবংশের শাখা), সাত জোড়া, পাঁচাল, পাত্রসায়ের ; রাজগ্রাম, তেলিবেড়িয়া জমিদার গ্রামে, এবং কুম্ভস্থলীর নিকট এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে॥

বিশেষকরে আমার সংস্পর্শে আসা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন,—আপনাদের আদিও গৌরবোজ্জল ঘরাণাই শত শত বৎসর ধরে এখনও পর্য্যন্ত অমর বটবৃক্ষের মত শাখা-প্রশাখায় সমৃদ্ধ হয়ে বিস্ময়কর ও বিরাট রূপ ধারণ করে আছে। সর্বাঙ্গীনভাবে এতকাল ধরে ঘরাণার এরকম প্রাচীন পরিচয় বোধহয় আর কোন স্থানে পাওয়া যাবে না। তবে খাস বিষ্ণুপুরে গেলে এই স্বীকৃত পরিচয় পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক আগে থাকতেই ছিলনা, এবং এখনও নেই, তার কারণ, যদুভট্ট, ক্ষেত্রমোহনের সময় থেকে এখন পর্য্যন্ত সমস্ত বড় বড় সঙ্গীজ্ঞতদের বিদেশেই থাকতে হয়েছে। আপনাদের সকলকে নিয়ে যদি যথোপযুক্তভাবে দেশে রাখার ব্যবস্থা হত—সঙ্গীতের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহলে এর উপর দৃষ্টি আকর্ষণ হত প্রাচ্য, পাশ্চাত্য দেশসমূহের বড় বড় ব্যক্তিদের এবং তাঁদের মুগ্ধ করত শিল্পীগুণীদের সৃজনী শক্তিতে। আমাদের মনে হয় বাঁকুড়া জেলার মন্ত্রীরা, এম, এল, এ, রা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যদি এ বিষয়ের কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হতেন তাহলে এই গরিমার স্থায়ীত্ব রক্ষা সম্ভব হত। মল্লরাজত্ব চলে গেছে বলে এই এতবড় জিনিসও কি চলে যাবে ?

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

পরিবেশন নীতিধারা এবং চর্চার বিভিন্ন পরিচয়

(১) বিষ্ণুপুরে নানান ধরণের গায়কী ও বাদনপদ্ধতি আসার দরুণ চর্চারত ব্যক্তিদের পছন্দ মত গ্রহণেচ্ছুক করেছিল। তাই এই ঘরাণায় এই বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট কোন পরিচয় থেকে আসেনি। যদি থাকত তাহলেও এত সংখ্যক চর্চারত ব্যক্তিদের মধ্যে একই রকমের পরিবেশন পদ্ধতি থাকা সম্ভব হত না। নিজস্ব শক্তি, সামর্থ্য ও শিক্ষা-সাধনার সুযোগ সুবিধা এবং প্রতিভার উপরই নির্ভর করে প্রত্যেকের শিল্প সৃজনীর দক্ষতা। এই পরিচয়ই বিষ্ণুপুর ঘরাণায় বরাবর থেকে এসেছে। এটাই এখানের বিশেষ বৈশিষ্টতার পরিচয়। কারণ, গতানুগতিক কোন একটা পদ্ধতির পরিচয়ের উপরই এই বিরাট শিল্পবিদ্যা এখানে কেন্দ্রিভূত হয়ে নেই॥

(২) বিষ্ণুপুরে কণ্ঠসংগীতের চর্চার বিপুল পরিচয় যেমন থেকে এসেছে তেমনি তার সংগে যন্ত্রসংগীতের চর্চাও। প্রথম দিকে বীণা যন্ত্র ও তাউসের চর্চাই বেশী ছিল, তারপর বীণবাদনের চর্চা কমে গিয়ে সুরবাহার ও সেতারের চর্চা বেড়ে যায়। তাউসযন্ত্রটি (এর নাম এখন এসরাজ) নানান ক্ষেত্রে এবং সঙ্গীত ব্যবসায়ী অনেকের কাছে বিশেষ ভাবে গ্রহণ যোগ্য হয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং বিভিন্ন বিষয়ে খুব প্রচলন হয়েছিল। যেমন যাত্রায়, রামায়নে, চৈতন্য ও মনসামঙ্গলে, কীর্ত্তন ও ঢুলীসম্প্রদায়ে।

(৩) তখনকার ঢুলীসম্প্রদায়দের সুর ও তালের উপর সাধনার পরিচয় খুবই তারিফের যোগ্য ছিল। প্রত্যক্ষ করা, তাউসের সংগে খঞ্জনী বাদকের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ম্যাজিকের মত আশ্চর্য্যকর সাধনার যে পরিচয় ছিল, সে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর ; যথা,—খঞ্জনীবাদক গৎএর সংগে প্রথমতঃ তাল-ছন্দ প্রকাশ করার পর সেইসব ছন্দ পরে দুটো হাতে খঞ্জনী নিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঠুকা-ঠুকির উপর দেখিয়ে তারপর তাল ছন্দের উপর খঞ্জনী সংখ্যা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ছ' সাতটিতে লুফা-ফুলির দ্বারা তালের খেলা দেখিয়ে ক্রমশঃ কমিয়ে এনে শেষেরটিতে খুব দ্রুতলয়ের উপর ঠেকা-বোল চালিয়ে সমে সমাধা করত। ঢুলী ও তাউস বাদকদের মধ্যেও যথেষ্ট সাধনার পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু এত সাধনার উপর এই রকম কৃতিত্বের অধিকার রেখেও তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা কোনদিনই লাঘব হয়নি। এইসব চর্চার উপর পরিচয় থাকার মত এদের মধ্যে এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের কথা মনে হলেই ভাবি, কিসের প্রেরণায় এরা এত একনিষ্ঠ সাধক হতে পেরেছিল, লোভ-মান-মর্য্যাদা, ধনাদি ও প্রতিপত্তির কোন আশা থাকবে না জেনেও ! মনে হয় শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের বিপুল প্রচারের প্রভাবই এদের অন্তরকে ওই বস্তু পাওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করত, এবং উৎসাহ দানের জন্য শ্রোতার সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট।

আমার যুবাবয়সের সময় আমাদের দেশের যাত্রাদলের গেবিন্দ বৈরাগী, শচী নন্দন এবং কাঁনাই দাসের সুললিত ভরাট কণ্ঠের সাবলীল তান বিস্তার দিয়ে যাত্রার গান শুনে মনে হত এরা যদি সুযোগ পেয়ে খেয়াল গানের চর্চ্চা করত তাহলে প্রত্যেকে দেশ বিখ্যাত খেয়াল গায়ক হত। তারা কারো কাছে না শিখে শুধু নিজের প্রতিভায় ও কিছু শুনে এবং আবহাওয়ার গুনে স্বভাব শক্তিতে এত ভাল গাইতে পারত। একদিন যাত্রায় গোবিন্দ দাসের তব্‌লা বাজান শুনে অবাক হয়ে গেছলাম, আঙ্গুল গুলো যেন মেশিনের মত চলছিল, কোন কোন সময় মনে হচ্ছিল যেন অনেকগুলো ঘুঙ্গুর বাজছে, আবার কোন কোন সময় শুধু বাওয়ার উপর মনে হচ্ছিল যেন দ্রুতগতিতে কয়েকটি পায়রা ডাকছে। অথচ কারো কাছেই শিখেনি। তখন যাত্রায় জুড়ির গানে ধ্রুপদাঙ্গের গায়ন-পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু ছিল না। বালকরা যখন একসংগে গাইত তখন তাদের গানে তানের উপর ছাড় ধরতাই চলত এবং তারসংগে কীর্ত্তনের সুরও সময় সময় প্রকাশ পেত। যিনি শিক্ষা দিতেন তিনি খুব ভোরে ছেলেদের উঠিয়ে এনে আখড়ায় গলা সাধাতেন। আসল সাধনার সময়ই ভোরবেলা, কিন্তু এখন কেউ তা করে কি ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাদের দেশে জয়পুর নামে একটি খুব বড় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। এখানে মল্লরাজাদের দ্বারা প্রতিপালিত এক বিরাট ঢুলি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল প্রায় চারশ' বছর আগে থাকতে। এদের প্রথম বংশের প্রথম সময়ের সন্তানরা বিষ্ণুপুরের গায়ক- বাদকদের কাছে তালিম পেয়েছিল। সেই বংশ ধারায় শিক্ষা পেয়ে মনমোহন ডোম্ (এদের জাতিকে ডোম্ বলে) এমন উচ্চস্তরের বেহালা বাজাত যে, তা শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতাম।—

রাগরূপের উপর কি অদ্ভুত দখল যে সে করেছিল তা বলে বুঝান যায় না। এ রকম বেহালা বাদন আজ পর্যন্ত আমি শুনিনি। কিছুদিন সে আমার দাদামহাশয়ের গ্রামের যাত্রায় শিক্ষকতা করেছিল এবং যাত্রার দিনে বেহালা বাজাত গানের সংগে। একবার সকলের অনুরোধে সকালে যাত্রাভিনয়ের মধ্যেই সে ধরল আসল বিভাস রাগে আলাপ, করল বহুক্ষণ ধরে, সকলে তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল, আমি সে দিন তার হাতের রাগরূপ অঙ্কনের মাধুর্য্যে অভিভূত হয়ে গেছলাম, সুরের আবেগ যে ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তাতে আমার চোখে জল এসে গেছল। মনে হচ্ছিল ছড়ির টানে সুরের দেবতাকে কাছে নিয়ে এসেছে। বাজাবার সময় তারও চোখে জল আসছিল। একেই বলে সুরের সাধক। হরিডোম সানাইএ অতিসুন্দর রাগ রচনা করত। এদের বংশগত চর্চ্চার ধারায় ছিল সাধানাই একমাত্র মূলধন, গুরুমুখি তেমন ছিলনা। মল্লভুম অঞ্চলের ঢুলি সম্প্রদায়দের মধ্যে দেখেছি তাদের রাগরূপের উপরও যেমন দখল ছিল তেমনি ছিল তালবাদ্যের উপরও। পঞ্চম সওয়ারী, ব্রহ্মতাল, আড়াচৌতাল প্রভৃতি তালও তারা বোলপরণ দিয়ে বাজাতে পারত

(৫) কোন কোন লোকের ধারণা, বিষ্ণুপুর-ঘরাণার পরিচয় একমাত্র ধ্রুপদগানের উপরই। এই মন্তব্য সঠিক পরিচয় ভিত্তিক মোটেই যে নয় তা সঙ্গীতের শ্রেণীগত গানের তালিকায় এবং যে সব পরিচয় দিয়েছি তাতেই প্রমাণ হবে। তবে এ কথা সত্য যে, তখনকার মানুষের রুচি ও আগ্রহ আধ্যাত্মিক ভাব-ধারার উপরই সমধিক ছিল বলে ধ্রুপদের মধ্যে সেই বস্তু থাকায় এই গানের চর্চ্চাই প্রধানতম হয়ে ছিল এবং সৃষ্টি করেছিল বহু বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক। কিন্তু খেয়াল ইত্যাদি গান, ও বীণাদি যন্ত্রের চর্চারও কম পরিচয় ছিল না। যাঁরা ধ্রুপদ শিক্ষার পর অন্য কোন একটি উচ্চ বস্তুকে সাধনায় প্রধান করে নিয়ে সুনামে প্রতিষ্ঠীত হয়েছিলেন, তাঁরাও বিষ্ণুপুর ঘরাণার গৌরবোজ্জল ব্যক্তিরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিচিত হয়েছিলেন। যেমন রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়। এঁরা বিখ্যাত সুরবাহার ও সেতার বাদক রূপেই সবিশেষ পরিচিত ছিলেন, কিন্তু ধ্রুপদাদি গানের উপরও এঁদের যথেষ্ট অধিকার ছিল। গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও চল্লিশ বছর বয়সের অধিক সময়েও বড়দরের সুরবাহার ও সেতার বাদক রূপেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন, তারপর তিনি যন্ত্রবাদন ত্যাগ করে গানে ধ্রুপদী রূপে বিখ্যাত হন।

রাধিকা প্রসাদ প্রভৃতি সকলেই খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গানও অতি উত্তম ভাবে গাইতে পারতেন। বহু আসরে তাঁকে এবং আপন কাকাকে শুধু হিন্দী ও বাংলা খেয়াল ও টপ্পা গানই গাইতে দেখেছি। বিষ্ণুপুর ঘরাণারূপে আমন্ত্রিত হয়ে লক্ষ্ণৌএ ও মজফ্‌ফর্‌ পুরের নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে এবং দ্বিতীয়বার কাঁশীতে ওই সম্মেলনে আমি খেয়াল গানই পরিবেশন করে খেয়াল গানের চর্চার নজীর রেখেছিলাম। ১৯১৯ সালে ওইরূপ বেনারসের সঙ্গীত সভার প্রথম দিনে ধ্রুপদ এবং দ্বিতীয় দিনে সেতার বাজিয়ে ছিলাম। তাতে ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি বড় বড় সঙ্গীতবেত্তাগণ সন্তুষ্ট হয়ে ইনায়েত খাঁণও আমাকে যুক্ত ভাবে, সেতারে প্রথম স্থান দেন। এই সব প্রমাণ বিষ্ণুপুর ঘরাণার সব বিষয়ের উপর দখল থাকার বিরাট এক নজীর স্বরূপ থেকে এসেছে। বিষ্ণুপুর ঘরাণাকে রাগসংগীতের শাশ্বত নীতি ধারার বাহক বলে মন্তব্য করে লক্ষ্ণৌএতে ভাতখণ্ডেজী বলেছিলেন—রাগের বিশুদ্ধ পরিচয় সঠিক ভাবে জানাবার জন্যে কিছুদিন কোলকাতায় থেকে আপনাদের ঘরাণার ধ্রুপদ ও প্রাচীন খেয়াল গান সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে। গৌরীপুরের রাজা সংগীতজ্ঞানী ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' নামক মাসিক পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন,—বিশুদ্ধ রাগের পরিচয় জানতে হলে এখন এক মাত্র বিষ্ণুপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় গুণীদের কাছে যেতে হবে —কিংবা তাঁদের ধ্রুপদের গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে॥

(৬) কম বয়সে দেখেছি ধ্রুপদগানের চর্চার ব্যাপকতার পরিচয়ে প্রতিটি সম্রান্ত গ্রামেও অন্ততঃ একজন করেও ধ্রুপদগায়ক ও পাখোওয়াবাদক থাকতে। তখনকার সময়েও যদি গণনা করা হত তাহলে বোধহয় শতাধিক ধ্রুপদগায়ক এবং তদনুপাতে পাখোওয়াজ বাদক পাওয়া যেত। ভাল সংগীতের চর্চা বলতে তখন ধ্রুপদকেই বুঝাত এবং শ্রোতারাও আগ্রহ নিয়ে শুনত। যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোন পর্ব্বাদি, পূজাদি, শুভানুষ্ঠানে, এমন কি শ্রাদ্ধবাসরেও ধ্রুপদ গানের আসর হতই। বড় বড় পল্লীতেও এই ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক আসরে অন্ততঃ তিন-চারজন করেও ধ্রুপদগায়ক থাকতেন।

এখন কেবল ভাবি, কি ছিল, আর কি হয়ে গেল! সেইসব পরিচিত স্থানে এখন এই শ্রেষ্ঠ সংগীত ধ্রুপদ গান কি রকম তা বোধ হয় আর কেউ জানে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
আমাদের ঘরাণার গায়কী পদ্ধতি ও পরিচয়

আমাদের বংশের গায়কী রীতিতে প্রথম অবস্থায় কথার ভাবের উপর সুললিত ও সীমিত সুর অঙ্কনই প্রধান হয়ে ছিল। তারপর শিল্পোন্নতির পরিচয় আসে আমার প্রপিতামহ ঈশ্বরচন্দ্রের গায়কীর মধ্যে দিয়ে। একথা মনেহয় আগেই জানিয়েছি।

আমার শিক্ষার বয়সের সময় পিতামহের কণ্ঠে অদ্ভুত দ্রুততান শুনে আশ্চর্য্য হতাম। তান যে এত দ্রুত গলায় আসতে পারে সে ধারণা তখন ছিল না।

আমার পিতার কণ্ঠ ছিল দরদ মাখান, রাগরূপের উপর সুরের বৈচিত্র অঙ্কন করে সব রকম গানই ভালভাবে গাইতে পারতেন। আমার আপন কাকার পরিচয় আগেই দিয়েছি।

সম্প্রতি দেশের বাড়ীতে নানান পুঁথি-পত্র খুঁজতে খুঁজতে অতি-প্রাচীন গানের সংগ্রহ খাতা একটি পেয়েছি। খাতাটিতে বেশকিছু সংখ্যক সংস্কৃত ও বাংলা গান বিভিন্ন রাগ ও তালের নাম দিয়ে লেখা আছে। তালগুলি খেয়াল অঙ্গেরই বেশী। এই সব গানের মধ্যে কয়েকটি গান আমি পিতমহ, পিতা ও খুল্লতাতের মুখে বহুবার শুনেছি। এইসব গান তাঁরা তানালঙ্কারে ভূষিত করে গাইতেন। বাংলা গানগুলি গাইবার সময় শ্রোতারা বেশি করে মুগ্ধ ও আকর্ষিত হত। এইসব গানের দু'চারটে আমারই জানা আছে। আমার পিতা ও খুল্লতাতের আমল পর্য্যন্ত আমাদের টোলগৃহে যে সকল ছাত্র শুধু শাস্ত্রীয় সংগীত শিখত, তাদেরকে এইসব গানও শিক্ষা দেওয়া হত। কয়েকজন করে ছাত্র, থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থাই পেত,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আগেকার গুরু গৃহে থাকার মত এবং তারা কর্ত্তাদের কাছে পুত্রের মত আদর যত্ন পেত।

কলিকাতায় বিষ্ণুপুর ঘরাণার সম্পর্ক এবং অন্যান্য পরিচয়

১। প্রাচীন পরিচয়ের সংবাদ সূত্রধরে যতটুকু জানা যায়, তাতে রাজা-রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সময় থেকে বিষ্ণুপুর ঘরাণার সঙ্গীতজ্ঞদের কোলকাতা আসার পরিচয় আছে। উক্ত দুই মহান ব্যক্তি যে সব ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন তাতে পাওয়া যায় বিষ্ণুপুর ঘরাণায় প্রচলিত অনেক গানের সুরসম্পর্ক এবং তালাদির পরিচয়। শুনা যায় এঁদের রাগরূপাদির শিক্ষা উক্ত ঘরাণার গুণীদের মাধ্যমেই হয়েছিল। মহা-রাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের পিতামহ গোপীমোহন ঠাকুর যে পঞ্চাশটি বাংলা খেয়াল বিভিন্ন রাগের উপর রচনা করেছিলেন তার প্রত্যেকটিই বিষ্ণুপুর ঘরাণার হিন্দি খেয়ালের হুবহু সুর তালকে গ্রহণ করে। উক্ত মহারাজার দত্তকপুত্র মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের কাছে আমি যখন ছিলাম, তখন তাঁর ইচ্ছাক্রমে ওইসব গানের স্বরলিপি করে দিয়েছিলাম। গানগুলির সুর তাল সমস্তই সংরক্ষিত হয়েছিল সঙ্গীতাচার্য্য নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে। এই সমস্ত পরিচয়ের মধ্যে সময়কালের যে দূরত্ব আছে তা এখন হতে দু'শ বছরেরও অধিক। কোলকাতায় রাগসংগীত চর্চার পরিচয়ে বিষ্ণুপুর ঘরাণার অবদানই বিশেষরূপে স্বীকৃত হয়ে আছে।

২। আমার জানিত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দশক থেকে যে সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞ স্থায়ীভাবে কোলকাতায় থেকে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন তাঁদের নাম জেনে রাখার আবশ্যক আছে মনে করে উল্লেখিত হল। যথা, কাশীর প্রাচীন ঘরাণার বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক শিবনারায়ণ মিশ্র ও কাশীনাথ মিশ্র, বিখ্যাত খেয়াল গায়ক গুরুপ্রসাদ মিশ্র, বীণকার ও ধ্রুপদ এবং খেয়াল গায়ক গুণী লছমী প্রসাদ মিশ্র, বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক শিবনাথ ও পশুপতি মিশ্র এবং প্রতিষ্ঠাবান গায়ক রামকৃষ্ণ মিশ্র, (শেষের আগের দু'জন নেপাল দরবারেও ছিলেন)। মহারাষ্ট্র ঘরাণার বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক বিশ্বনাথ রাও, স্বনামধন্য খেয়াল গায়ক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (:নুলোগোপাল), সাময়িকভাবে খ্যাতনামা ধ্রুপদ গায়ক দৌলত খাঁ, শ্রেষ্ঠ টপ্পা গায়ক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রমজানখাঁ, টপ্পাবিশারদ রাম চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ঘরাণার বিখ্যাত সুরবাহার ও সেতার বাদক সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ, ইম্‌দাদ ও তৎপুত্র ইনায়েত খাঁ, (এঁরা পিতাপুত্রে ইন্দোর রাজদরবারেও ছিলেন), বিখ্যাত ব্যাঞ্জোবাদক কৌকুভ খাঁ, সরোদবাদক কেরামতউল্লা খাঁ, বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক-ভ্রাতৃদ্বয় কান্তাপ্রসাদ ও জীবনপ্রসাদ, ঠুংরী গায়ক পিয়ারা সাহেব, সরোদ বাদক আমীর খাঁ, স্থানীয় সরোদ বাদক ধীরেন্দ্রনাথ বসু; গায়ক সাতকড়ি মালাকার, ও অন্ধ নিকুঞ্জ, এসরাজ বাদক কালী পাল, বীণ বাদক প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদঙ্গাচার্য্য মুরারীবাবু, দুর্ল্ভ ভট্টাচার্য্য, নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীননাথ হাজরা, কেবলকৃষ্ণ অধিকারী প্রভৃতি। এবং খেয়াল গায়ক জামিরুদ্দিন খাঁ ও বাদল খাঁ, সারেঙ্গী বাদক ছোট্টে খাঁ ইত্যাদি। প্রথমসারির কয়েকজন গুণীসঙ্গীতজ্ঞ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে ছিলেন। ওই সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞরা বিষ্ণুপুর ঘরাণার রাগরূপের অঙ্কন নীতি-ধারার সংগে অভিন্ন ছিলেন। তাঁরা উক্ত ঘরাণার সঙ্গীতজ্ঞদের আন্তরিক সম্মান দেখাতেন।

৩। আগে গানের আসর বলতে ধ্রুপদ গানের আসর বোঝাত। দেখেছি কয়েকটি বাৎসরিক উৎসবে রাত্রির প্রথম সময় থেকে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত ধ্রুপদীরা পরের পর ধ্রুপদ গেয়ে আসরকে মাতিয়ে রাখতেন। প্রত্যেক আসরে আমার গানেরও ব্যবস্থা থাকত। বিস্তীর্ণ আসরে স্থানাভাব হলে বহু শ্রোতা দাঁড়িয়ে থেকে একাগ্র হয়ে শুনতেন। অনেকের পক্ষে এত বড় বস্তু বুঝবার মত সামর্থ্য না থাকলেও বড় জিনিষ শুনছি এবং শোনা প্রয়োজন এই বিচারবোধটুকু থাকার জন্য তাঁরা আগ্রহের সহিত আসরে আসতেন এবং ধৈর্য্যসহকারে শুনতেন। এমন কি কমবয়স্করাও এসে শুনত। এখন তাদের ভীড় অতি তরল গানের আসরেই থাকে। আগে বহু কলেজের ছাত্র ইউনিয়নে বাৎসরিক প্রতিযোগিতা হত, ধ্রুপদ, খেয়াল ও সেতার, এসরাজের। আমাকে পরীক্ষক হতে হত। কলেজ ও কলেজ হোষ্টেলে সরস্বতী পূজায় ধ্রুপদাদী গানের আসর হত। আমি বেশ কয়েক বছর ধরে চার পাঁচটি ওই সব স্থানে গেয়ে এসেছিলাম। যাতায়াত খরচ ছাড়া প্রত্যেক স্থানে অন্ততঃ কুড়ি টাকা করে দেবার ব্যবস্থা থাকত। তখনকার কুড়ি টাকা এখনকার চার শ' টাকার মত। এখন শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা খুবই বেড়েছে সত্য, কিন্তু এই সব আদর্শমূলক পরিচয় কোথায়! এই বিদ্যা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিক্ষা দ্বারা অন্তরে যে মহত্বের সৃষ্টি হয়, সে পরিচয় এখন দুর্লভ। ভাবা যায় না, বড় বড় বাৎসরিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে ধ্রুপদকে একরকম বাদ দিয়ে শিব রহিত যজ্ঞের মত গান-বাজনার যজ্ঞ চলছে। অর্থাৎ এই সব যজ্ঞের হোমাগ্নিতে ধ্রুপদরূপ গব্য ঘৃতই নেই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঘরাণার গান ও গৎ

বিষ্ণুপুর ঘরাণার খেয়াল ইত্যাদি গানের সুর ও বন্দেজ ভাল নয়, এ রূপ মন্তব্য কেউ কেউ করেন বলে শুনেছি। এই মনোভাব, দেশের ঘরাণার প্রতি থাকা নিকৃষ্ট মনেরই পরিচায়ক। বিষ্ণুপুর ঘরাণার শতশত গান, গৎ ইত্যাদি, সেখানের কঙ্করময় মৃত্তিকায় চাষ-আবাদ করে উৎপন্ন হয়নি, ভারতের বিভিন্ন ঘরাণার বিখ্যাত গায়ক-বাদকদের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। প্রমাণ পরিচয়ের উপর যে কোন বিচার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কাছে স্বীকৃত হবে, এখানের গীতাদি ও বাদন ক্রিয়ার বন্দেজ পদ্ধতির মধ্যে যে কৌলীন্য আছে তা আর অন্য কোথাও নেই। দূর থেকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ না করে সাক্ষাতে এলে এই নিন্দনীয় ধারণা ঘুচে যেতে বিলম্ব হবে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা, আলাপ, গান ও গৎ, এ সবের বন্দেজাদি, সৌন্দর্য্য ও রসসৃষ্টি এবং সুষ্ঠবৈচিত্র্যবিন্যাস নির্ভর করে উপস্থাপকের শিক্ষা, সাধনা ও কৃতিত্বের উপরই। কণ্ঠের ও যন্ত্রের স্বর সাধনাগুলো সাধনা করে করে যখন সেগুলো উজ্জ্বল ও মিষ্ট হয়ে রসাল হয় এবং শিল্প সৃজনীশক্তি আসে, তখন সেই সাধনার পদ্ধতিগুলো ভাব-আবেগের মধ্যে দিয়ে রচনা করে গেলে পাওয়া যাবে এক অপূর্ব পরিচয়। মনে হবে এও এক তৃপ্তিকর অনির্বচনীয় বস্তু। শুধু 'সা' সুরটার উপর দম রেখে ওঙ্কার ধ্বনি তুলে প্রত্যহ ঘণ্টাধিক তিন চার বার করে অন্ততঃ যদি পাঁচ-ছ' বছর সাধনা করা যায় তা হলে দেখা যাবে তার অলৌকিক শক্তির কাছে সব পরাভূত। সুতরাং গান, গৎ ইত্যাদির উপর ভাল-মন্দের সমালোচনা বা মন্তব্য অল্প জলের মাছদের মতই আসে মনের ক্ষুদ্রতা নিয়ে॥

(২) আমি আমার ঘরাণার বহু ধ্রুপদ ছাড়া খেয়াল গানও প্রত্যেক রাগের প্রায় আট দশটি করে শিখেছিলাম। এখন যেমন এক এক রাগের একই গান প্রায় সকলেই গেয়ে থাকেন, আমাদের ঘরাণার গায়কদের তা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করতে হয় নি, ভাণ্ডারে অভাব নেই বলে। একই গান গাওয়ার দৈন্যতা থাকবে কেন? একই রাগের বিভিন্ন গান বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের শিখিয়েও প্রয়োজন বোধে সেই রাগের গান দু চারটি রচনা করেও শিখিয়ে এসেছি। বন্দেজের পংক্তিতে তাদের স্থান ভালভাবেই থেকে এসেছে। রচনা করার আগ্রহ আমার বাল্যকাল থেকেই ছিল; তাই এ পর্য্যন্ত বিলম্বিত ও দ্রুত অঙ্গের হিন্দী খেয়াল বিভিন্ন রাগের উপর প্রায় আড়াইশ', অনুরূপ বাংলা ভাষায় দু'শ', এবং হিন্দী ভাষায় কয়েকটি রাগমালা, অনেকগুলি ভজন, ঠুম্‌রী, তার সঙ্গে তেলানা প্রভৃতি রচনার দ্বারা পুঁজির সংখ্যা বাড়িয়েছি কেবল প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দক্ষতার পরিচয় রাখার জন্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
গুণী নামের পরিচয় সম্বন্ধের উপর

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, তাঁর গৃহের সঙ্গীত সভায় বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতাদের সমক্ষে বলেছিলেন,—"আমার সঙ্গীতগুরু আচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় হলেন প্রকৃত গুণী, গুণী বলতে যা বুঝায় তার সমস্ত গুণই তাঁর মধ্যে সমুপস্থিত। অর্থাৎ একাধারে তিনি সঙ্গীতের তত্ত্বাঙ্গে যেমন পণ্ডিত, তেমনি কণ্ঠ সংগীতের শ্রেণীগত গানে এবং যন্ত্রসঙ্গীতের সুরবাহার, সেতার, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্যেও অতি সুনিপুণ শিল্পী। তাছাড়া স্বরলিপির প্রকৃত রূপদানের স্রষ্টা এবং স্বরলিপি সহ গ্রন্থাদি রচনায় অদ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ রূপকার।" তাঁর এই মন্তব্য সকলের কাছেই বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। এই সংবাদটি দিয়েছিলেন মহারাজা-স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর আমাকে একদিন উক্ত গুণীর কথা প্রসঙ্গে। মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, ও উক্ত রাজা, এই দুই ভ্রাতা ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতের বিরাট পৃষ্ঠপোষক এবং পরিচালনায় কর্ণধার সদৃশ। এঁরা রাগরূপের প্রাচীন ও অকৃত্রিম পরিচয় ধারার কৌলীন্য রক্ষাকারী ছিলেন। কোন কোন সময় যখন বহিরাগত সঙ্গীতজ্ঞরা কোলকাতায় আসতেন, তখন এঁদের উপস্থিতিতেই প্রথম তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশিত হত। সেই তাঁদের মধ্যে রাগরূপের পরিচয়ে যদি কোন ব্যতিক্রম থাকত তাহলে তাঁদের এঁদের কাছে প্রকৃত রূপের পরিচয়কে মেনে নিতে হত। উক্ত রাজারা রাগরূপের পরিচয় সংরক্ষণে কণ্ট্রোলারের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মত ছিলেন। অবশ্য তখন রাগরূপের পরিচয়ে বিভেদ ছিলইনা বলা চলে। এখন কর্ণধারের অভাব হয়ে পড়ায় সংগীত শাস্ত্রের ক্রিয়াঙ্গতরী দিকভ্রান্ত হয়ে যেদিক সেদিক ছুটছে। দু'এক জন নাবিক কি করতে পারে!

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহনের পরিচয় এস্থলে একটু দেওয়া আবশ্যক। ইনি তাঁর উক্ত গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করে সঙ্গীতে আদর্শ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ব্রহ্মার মতানুযায়ী রাগ-রাগিনীর চিত্র শ্লোকোক্ত ব্যাখ্যার উপর অতি উত্তমভাবে অঙ্কন করে প্রত্যেকটির সুর স্টাফ্‌নোটেশনের দ্বারা রেখে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। এটি এবং আরো তাঁর ইংরেজী ভাষায় শাস্ত্রীয় সংগীতের গ্রন্থ পাশ্চাত্য দেশে অতি সমাদৃত হয়। তিনি বিলেত থেকে সঙ্গীতে ডক্টর উপাধি এবং অন্যান্য বড় বড় স্থান হতেও সম্মান পত্র পেয়েছিলেন। এই পরিচয়ের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে বিষ্ণুপুর ঘরাণার অবদানের এক বিরাট সাক্ষ্য॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন স্থানের ঘরাণার সাম্বোধন ও গায়কী পদ্ধতি

ঘরাণার পরিচয় স্বরূপ যে কয়েকটি স্থানের নাম প্রচারিত হয়ে এসেছে তাতে প্রকৃত পক্ষে ঘরাণার অর্থ কি করে থাকে তা আমার কাছে দুর্বোধ্য। কারণ সেই সব স্থানের রাজা, মহারাজাদের কাছে—এমন কি সম্রাটের দরবারেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকেই বড় বড় গায়ক-বাদকরা এসে স্থান পেয়েছিলেন। সুতরাং নিম্নলিখিত স্থানগুলির ঘরাণা নামে পরিচয় পাবার স্বপক্ষে যুক্তি কোথায়? তানসেন হরিদাস স্বামীর কাছে শিখে প্রথমতঃ গোয়ালীয়রের মহারাজার কাছে এবং পরে সম্রাট আকবরের দরবারে ছিলেন, তাই বলে কি তিনি গোয়ালীয়র ও দিল্লী ঘরাণার গায়ক বলে পরিচিত হবেন? ঘরাণা বলতে তাঁর নিজস্ব বংশ পরিচয়ও কিছু মাত্র

জিজ্ঞাসা,—আচ্ছা বলুনতো! তারের যন্ত্রের শিল্পীরা যদি এককভাবে তাঁদের সাধনার পরিচয় রাখতে পারেন, তাহলে কণ্ঠসংগীতের শিল্পীরাই বা কেন অন্যের সাহায্য না নিয়ে মুদ্রাদোষ শূন্য হয়ে শুধু তানপুরা বাজিয়ে গাইবেন না? উত্তরে বলেছিলাম—স্বয়ম্ভরতার পরিচয় রেখে এই ভাবে গানই তো গাওয়া উচিত। আগেও তাই দেখে এসেছিলাম ওই নিয়মে অধিকাংশ গায়কদের গাইতে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছিল না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দিল্লীঘরাণা, গোয়ালীয়র ঘরাণা, আগ্রা ঘরাণা ইত্যাদি নামগুলির মধ্যে ঘরাণা সৃষ্টিতত্ত্বের যথার্থ পরিচয় মূলক কোন প্রাচীন সন্ধান আছে বলে যখন জানা যায় না তখন ঘরাণা সম্বোধনের কোন অর্থ থাকে কি? ৺কাশীর মিশ্র ঘরাণা এবং বিষ্ণুপুরের ঘরাণা বলতে ঘরাণার প্রকৃত যে পরিচয় ও অর্থ আছে সেইরূপ বহু পুরুষ ধরে চর্চার পরিচয় থাকলে তবেই ঘরাণা নামে অভিহিত হতে পারে। এক এক সময় বড় বড় স্থানে বহু গায়ক বাদক বিভিন্ন ঘরাণা বংশ থেকে বা কোন ঘরাণায় শিক্ষা পেয়ে সেই স্থানে বসবাস করার জন্য যদি সেই স্থানগুলির ঘরাণা নাম হয়, তাহলে বহুকাল আগে থাকতেই কোলকাতা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘরাণা।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা,—ঘরাণার পরিচয়ে গায়কী ও বাদন পদ্ধতিই একমাত্র নির্ভর নয়। কারণ—শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ্য, প্রতিভা ও রসবোধ অনুযায়ী গায়কী ও বাদন পদ্ধতি তৈরি করে নেন, নচেৎ গতানুগতিক ভাবে চললে একঘেয়ে হয়ে পড়ত, যা মোটেই সৃজনীশক্তির পরিচায়ক নয়। অবশ্য শিক্ষাগুরুর ক্রিয়াঙ্গ পদ্ধতিকে সংরক্ষিত করে রাখার বাসনা অনেকে রাখেন এবং কর্ত্তব্য ও ধর্ম বলেও মনে করেন। আবার দেখা যায়, সেই পদ্ধতিতে যদি রসলালিত্য ও শিল্প সৌন্দর্য্য না থাকে তাহলে কোন কোন প্রেমিক শিল্পী গুরুর পদ্ধতি অনুসরণে অনিচ্ছুক হন, যতই কেননা সেই পদ্ধতিতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় ও বিস্ময়কর বস্তু থাকুক। আমার মতে এ মনোভাব কিন্তু উচ্চমানের গুণীশিল্পী হবার আগ্রহের কথা নয়, দুই-ই চাই।

গোলামআলিখাঁকে পাঞ্জাবী ঘরাণা বলা হয়। জানিনা এই ঘরাণা পরিচয়ের সীমা কত দূরত্বে। যাই হোক, শুনেছি উনি ওঁর কাকা কাল্লেখাঁর কাছে শিখেছিলেন, কিন্তু কাল্লেখাঁর গায়ন-পদ্ধতির কিছুমাত্র ছাপ তাঁর মধ্যে ছিলনা। কাল্লেখাঁর গান আমি শুনেছি বহুবাজারের সন্নিকট এক বড়লোকের বাড়ীতে। তাঁর গানে ছিল দুর্দান্ত দাপটভাব এবং হৃদকম্প-কারী তান। গানে বীরত্ব প্রকাশের সময় আসরের অনেকখানি জায়গা তাঁর জন্য ছেড়ে দিতে হত।

শুনা যায়, বিখ্যাত গায়ক ভাস্কর রাও ছিলেন মহারাষ্ট্র ঘরাণা। বিষ্ণু দিগম্বর তাঁর কাছে শিখেছিলেন শুনেছি। এঁর গায়কী পদ্ধতী যেরূপ মাধুর্য্য মণ্ডিত এবং সীমিত ও সংযত তানাদির মধ্যে ছিল, তার কোন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিচয়ই পাইনি, এঁর ছাত্র ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, পটবর্দ্ধন, হংসরাজ, নারায়ণ রাও ব্যাস প্রভৃতির মধ্যে। প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ্যানুযায়ী ও পছন্দ মত গায়ন পদ্ধতি গড়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং ভাস্কর রাও ঘরাণার পরিচয় এঁদের মধ্যে কোথায়?

গায়ন ও বাদন পদ্ধতি বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রত্যেক চর্চারত ব্যক্তিদেরই পৃথক পৃথক ভাবে থেকে এসেছে। এটাই স্বাভাবিক ও নিজস্ব পরিচয় সম্মত ও সঙ্গত।

(২) রঙ্গীলা ও কিরাণা এই উচ্চারণে দুটি ঘরাণার নাম আজকালই শুনছি। আবদুল করিম খাঁকে কিরাণা ঘরাণার গায়ক বলা হয়। কিরাণা নাম কি অর্থে হল, এর মধ্যে উক্ত গায়কের পূর্বপুরুষের সঙ্গীতের এবং গায়কী রীতি-পদ্ধতির উপর নূতন কি-এমন পরিচয় বিশেষত্ব নিয়ে আছে, যা অন্য ঘরাণায় নেই? কেনই বা আগে, এমন কি ওই খাঁ সাহেবের মুখেও শুনিনি কিরাণা নাম? এই সব প্রশ্নের উত্তর কিরাণা নাম ভক্তদের কাছে জিজ্ঞাসা করেও পাইনি। আবদুলকরিমখাঁ এর গায়কীভঙ্গী সম্পূর্ণ নিজস্ব, তাও তা ঠুম্‌রীতেই। তাঁর খেয়াল গান বহুবার শুনেছি, নূতনত্বের আকর্ষণীয় পরিচয় তেমন কিছু পাইনি এবং উৎফুল্লতায় উচ্ছ্বাস তো আসেই নি। এক আধটুকু নূতন পেটার্ণ গায়কীতে যা পাওয়া যেত তা প্রত্যেক ভাল গায়কেরই নিজস্ব থাকে রূপায়নের মধ্যে। তার জন্য সেটাই ঘরাণার প্রতীক নয়।

ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকে রঙ্গীলা ঘরাণা বলা হয়। উক্ত খাঁ সাহেবের মুখে শুনেছি, তিনি প্রথমতঃ আলাবন্দ খাঁ সাহেবের কাছে (ইনি নৈমুদ্দীন ডাগরের পিতামহ) ধ্রুপদ ও আলাপ বহু দিন ধরে শিক্ষা করে, তারপর দিল্লীতে থাকা বড় মহম্মদ খাঁ এর কাছে দীর্ঘকাল ধরে খেয়াল শিখেন। ফৈয়াজ খাঁ আলাপ ও ধ্রুপদের শ্রেষ্ঠত্ব মনে-প্রাণে স্বীকার করেছিলেন বলেই অতবড় খেয়াল গায়ক হয়েও আসরে প্রথমতঃ আলাপ ও ধ্রুপদ পরিবেশন করে তারপর খেয়াল গাইতেন। এই নিয়ম পালনের মধ্যে তাঁর শিক্ষারও পরিচয় ছিল প্রত্যক্ষ হয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর রঙ্গীলা ঘরাণা নামে প্রচার করার উদ্ভট কল্পনা যাঁদের মাথায় এসেছে তাঁদের তারিফ করতে হয়— কল্পনা বিলাসীর মর্য্যাদা দিয়ে। ফৈয়াজ খাঁ-এর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম সময়ের অনেক গূঢ় রহস্য আছে, তা আর প্রকাশ করা উচিত মনে করলাম না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৩) পশ্চিমী ঘরাণা নাম উচ্চারণের উপর আমাদের জাতির অনেকের মধ্যেই যে উচ্চ স্বীকৃতির একটা শ্রদ্ধা-নমস্য ভাব আছে, তার জন্য আরো নূতন নূতন ঘরাণার নাম যদি সৃষ্ট হয়, তাহলে উৎফুল্লতা, আনন্দ ও গর্ব বেড়েই যাবে। এই গর্বের পরিচয় এত মহান্ যে, না শিখে, না গিয়ে পশ্চিমী অমুক ঘরাণায় বিশ বছর শিখে এসেছি বলে লোককে সহজে আয়ত্তে আনার সহজ সুযোগ আছে বলে তাঁদের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকে। বাঙ্গালী গুরুর কাছে শিক্ষা করে উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েও জাতে উঠবার জন্য কোন খাঁ সাহেবের কাছে অন্ততঃ নাড়াটা বেঁধে তাঁর কাছেই শিক্ষা বলে পরিচয় দিয়ে নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করেন। ভাবেন আসনের উপর জাঁকিয়ে বসবার এবং সম্মান ও অর্থ উপার্জনের এই শ্রেষ্ঠ উপায়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকের আবার চেখে বেড়ানর রোগ আছে। তাঁরা ধর্মের ষাঁড়ের মত ঘুরতে ঘুরতে নানান জায়গায় গিয়ে খাবলে খাবলে সখের উদরে কিছু পুরে নিয়ে আসেন। কেউবা আবার বিশ্বাসপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যে গুরু বহু যত্ন ও পরিশ্রম করে শিখিয়েছেন, তাঁর সেই সব মূল্যবান বস্তুকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে অনুকরণ ভক্ত হয়ে পাঁচ নকলে আসল খাস্তা হয়ে পড়ে। কেউবা সমুদ্র ছেড়ে ফোয়ারায় আকর্ষিত হয়। এই সব পল্লবগ্রাহীদের সব চেয়ে আদর্শ পরিচয় থাকে তারা গুণী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রণাম জানিয়ে নিজেদের ছোট করে না এবং শুনেছি ত্যাগ করা আসল গুরুর উদ্দেশ্যে পত্রের দ্বারাও বিজয়ার প্রণাম জানায় না।

(৪) আমি একান্তভাবে পরম নিষ্ঠার সহিত শিক্ষা-সাধনার দ্বারা আমার ঘরাণাকে যতটুকু বুঝেছি, তাতে জেনেছি এই ঘরাণার বস্তুসমূহ অতুলনীয় এবং শাশ্বত নীতিধারার প্রতীক। আমার সর্বপ্রধান অভিমত হল, যে গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়ে এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার উপর প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, পাওয়া যায় দিক নির্ণয়ের সন্ধান, সেই গুরু, শিষ্যের কাছে "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" কারণ তিনিই গুরু। প্রকৃত গুরু, পিতা এবং স্বামী এক ছাড়া দুই হয় না। এই মহান ধর্ম ত্যাগ করলে ভ্রষ্টাচার নামেই তার পরিচয় থাকবে। জ্ঞানদানকারী শিক্ষা গুরুকে আজীবন অন্তরের পূজার্ঘ দিয়ে যেতে হয়।

আমার ঘরাণার শিক্ষা বস্তুগুলির মধ্যে যে এক কামনাধন্য দর্শন রূপ থাকে তাতে আমি অভিভূত হয়ে যাই। যখন বিভিন্ন শ্রেণীবস্তুর গান গাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং গৎ বাজাই, তখন মনের সামনে ভেসে উঠে, যে সব গুণীরা এই সব বস্তু কণ্ঠে ও যন্ত্রে তুলতেন তাঁদের সেই মহান মূর্তি এবং তাঁদের পরিবেশিত বস্তুর অঙ্কনরূপ তখন মনে এসে গিয়ে সাধনাকে উদ্দীপ্ত করে, মনে হয় যেন তাঁরা আমাকে যথার্থ রূপায়নের ও লক্ষ্য পথের নির্দেশ দিচ্ছেন। আমি তখন এই বলে আশীর্বাদ চাই—যেন সুরের দেবতাকে বুঝতে পারি।

গুরুর রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি গান যখন গাই, তখন তার বন্দেজ বিন্যাসে মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। শেখান গানগুলো যখন গাই এবং গৎ-গুলো বাজাই, তখন তাঁর চরণ তলে বসে শেখার কথা মনে হয়ে গিয়ে কৃতজ্ঞতায় চোখ ছল ছল করে উঠে। মন তখন বলে, তুমি কৃপা না করলে আজ আমার কি অবস্থা হত!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ঘরাণার প্রকৃত অর্থ ও পরিচয়

ঘরাণার প্রকৃত অর্থ হল,—বেশ কয়েক পুরুষ ধরে ধারাবাহিকভাবে যে বংশে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চার সংগে প্রথম সময় থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত গুণী গায়কদের রচিত রাগ রূপের শাশ্বত নীতি ধারার ধ্রুপদ গান এবং তার সঙ্গে আলাপ প্রকাশক বীণাদি যন্ত্রের সবিশেষ চর্চার পরিচয় থেকে এসেছে এবং সেই সঙ্গে তত্ত্বাঙ্গের উপরও গভীর জ্ঞানের পরিচয় ও অবদান রাখার আদর্শ, দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে আছে, সেই বংশকেই প্রকৃত ঘরাণা বংশ বলা হয়। এই ব্যাখ্যা বরাবর গুণীজন সমর্থিত।

আগে অন্যান্য স্থানে ঘরাণা নামে যে পরিচয় ছিল—সেই সব ঘরাণার মধ্যে ওই সব পরিচয়ের প্রমাণ রেখে সেগুলি যথার্থ ভাবে নামের উপযোগী হয়েছিল কি না তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। ছিলই বলে ধরে নিতে হবে। যাই হোক, ওই সব ঘরাণার মধ্যে কোন কোন ঘরাণায় বহু পরে যখন খেয়াল গানেরও চর্চা আসে, তখন সেই ঘরাণার কোন কোন ব্যক্তি ধ্রুপদ ও বাদ্য যন্ত্রের চর্চার সংগে খেয়ালের চর্চার উপর বিশেষ জোর দিয়ে পরে ওকেই প্রধান করে নিয়ে বিখ্যাত খেয়াল গায়ক হয়েছিলেন। এঁদের পরিচয়ে সঙ্গতভাবেই ঘরাণায় নাম থাকত এবং উপযুক্ত সম্মানের লাঘব হত না। কারণ তাঁরা রাগ-রূপের শাশ্বত নীতিধারার সংগে পরিচিত হয়ে তার সত্যমূর্তিকে ধরে থাকতেন। তারপর ক্রমশঃ খেয়াল গানের চমকপ্রদ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপে আকর্ষিত হয়ে রাগ-রূপের বিশুদ্ধ পরিচয়ের প্রতীক ধ্রুপদ গানকেশিক্ষা-সাধনায় না রেখে অধিকাংশ ব্যক্তি শুধু খেয়াল গান কিংবা যন্ত্রের মধ্যে গৎ ও মনগড়া আলাপই শিক্ষা সাধনায় রেখে দেওয়ার জন্য রাগ-রূপের উপরে নীতি ও জ্ঞান রক্ষার গুরু দায়িত্ব পালনে তাঁদের অবহেলা আসতে লাগল। ক্রমশঃ এই জন্যই বেশ কিছু কাল হতে এই সব খেয়াল গায়ক ও যন্ত্রীদের দ্বারা নীতি-বিজ্ঞান বর্জিত আগাছা রাগের সৃষ্টি বেড়ে চলেছে। আগে প্রায় সকল স্থানেই রাগ রূপের পরিচয়ে যে সমন্বয় নীতি ধারার উপর স্বর সংযোজনা, বাদী-সংবাদী, কড়ি, কোমল ইত্যাদির নির্ধারণ ছিল তা ব্যাহত হয়ে চলেছে ওই কারণেই, খেয়াল খুসীর উপর। এই সব মনোভাব বেড়ে চলা দেখে জিজ্ঞাসা আসে এর ফল কি হয়ে দাঁড়াবে? এক সময় অনেকগুলি আগাছার মত রাগের সৃষ্টি হয়েছিল ছন্নছাড়া উদ্ভট প্রকৃতির গায়ক বাদকদের দ্বারা, সেগুলি অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই সব রাগের নাম পরিচয় আমার 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থে দেওয়া আছে। রাগ সৃষ্টি যদি সম্পূর্ণ পৃথক রূপ নিয়ে কানড়া, তোড়ী, ইমন, মালকোষ প্রভৃতি এই রকম রাগ রূপের মত উচ্চস্তরের হয়, তাহলে সবাই তাকে স্বাগত জানাবে।।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাগ রূপের পরিচয় প্রসঙ্গে

রাগ আলাইয়া, (শাস্ত্রীয় নাম—অলৈয়া) কতকগুলি প্রচলিত রাগরূপের উপর যে ভাবে স্বর ত্যাগ, স্বর পরিবর্ত্তন এবং স্বর সংযোগ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে কিছুমাত্র সঙ্গত বিচার ও ন্যায়-নীতি খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় সম্পূর্ণ খেয়াল খুসী ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক, আমার কাছে এই সব বিষয়ে সত্য নির্ভর যুক্তি ও বিচার কি আছে তাই জ্ঞাপন করছি প্রথমতঃ আলাইয়া রাগটিকে ধরে। এই রাগটির সৃষ্টি তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে বেশ বুঝা যায়, সাতটি স্বরকে ধরে সাধনার প্রথম পর্বে সেই যুগের কোন সাধক সুরের মূর্ত্তি গড়ার প্রয়াস নিয়ে তাঁর মনে যে একটি রূপ এল ক্ষুদ্রাকৃতিতে, তার তিনি নাম দিলেন 'লুন'। পরে এটি লুম নামে পরিচিত হয়। লুম নামের যা অর্থ তা কোন কিছুর মধ্যে ব্যবহার করা চলে না। ওর মানে হল লেজ, লুন মানে কর্ত্তন বা ছেদন। এ-ও ঠিক নামের উপযোগী কথা নয়। তবে মনে করা যেতে পারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপস্রষ্টা স্বরসপ্তকের অর্দ্ধাংশ নিয়ে পূর্বাঙ্গের উপর ওই সুরটি তৈরী করে ছিলেন বলেই ওই নাম দিয়েছিলেন। তারপর সপ্তস্বরের সমষ্টি নিয়ে উত্তরাঙ্গের উপর সুরের রূপ চিত্রিত করে তাতে যে মুর্ত্তি গড়ে উঠে, তার নাম করণ হয় 'অলৈয়া'। অলৈয়া নামের হিন্দি অর্থ নিছাবর, অর্থাৎ উৎসর্গ। নামটি খুব সঙ্গত ভাবে দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে হয় নামের অর্থ না জানার জন্যই অর্থহীন আলাইয়া নাম হয়ে পড়েছে। রাগ-সৃষ্টির তৃতীয় সংখ্যায় যে মুর্ত্তি গড়ে ওঠে আরোহণে মধ্যম-নিষাদ বাদ দিয়ে এবং অবরোহণে মধ্যমকে বর্জন করে তার নাম দেওয়া হয় বিভাস; এর অর্থ হল প্রকাশ। এই সুরে ধৈবতকে প্রধান করে তার সামগ্রিকভাবে ভাবমাধুর্য্যের পরিচয় যথেষ্ট এসে যাওয়ায় ওই নাম অর্থযুক্ত হয়েই যে এসে গিয়েছিল তা বেশ বুঝা যায়। তারপর আদি জাতীদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের সুরকে গ্রহণ করে যে সুরের রূপ উৎপন্ন হয়, তাকে ভূপালী নাম দেওয়া হয় এবং সেই সুরকে রাত্রের প্রথম সময়ে ব্যবহারের জন্য রাখা হয়। এই বিষয়ের এই পরিচয় আমার কাছে অতি সত্য রূপে ধরা দিয়েছে। তার অন্যতম কারণ হল, প্রথম সময়ে শুদ্ধ স্বরে গঠিত এই তিনটি রাগের উপরই তিন জাতি যথা—সম্পূর্ণ, ষড়ব ও ঔড়ব নামে পরিচিত হয়েছে অর্থবহ হয়ে। স্বরোদ্ভাবনের স্বভাব তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখলে এই সিদ্ধান্তে আসবে যে, কোমল স্বর দিয়ে রাগ সৃষ্টি বহু পরের। এইসব বিচার ভিত্তিক প্রামাণিক সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা থাকলে আলাইয়ায় কোমল 'নি' আসত না। ওই 'নি'এর ব্যবহার ধ্রুপদাদিগণের মধ্যেও নেই। তাছাড়া সহজ ভাবে বিচার করতে গেলেও দেখা যাবে কোমল 'নি'-এর ব্যবহার থাকতে পারে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নি-ধা-নি-সা, এই তিনটি স্বরের নামা ওঠা নিয়ে যে সুরের রূপ উৎপন্ন হয়, তাতেই প্রকৃষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়ে আছে তার প্রকৃত স্বরূপ কি! বিজ্ঞান সম্মত হয়ে রচিত রাগ সমূহকে তিন স্বরের দ্বারা পরিচিত করার যে সুন্দর এক আবিষ্কার আছে, তাতেও ওই রাগের ওই তিন স্বরই রাগরূপের মুখের মত হয়ে পরিচিত করেছে। এ সম্বন্ধে আরো যুক্তির কথা আছে, যথা—আলাইয়া রাগের প্রধানতম গতি হল উপর দিকে উঠে গিয়ে সেখানের তারাসপ্তকের 'ষড়্জ সুরে' গিয়ে পায় বিশ্রাম। চড়ার দিকে যে সব রাগরূপের বাদীস্বর 'সা' কিংবা 'নি' মুখসদৃশ হয়ে উত্তরাঙ্গ প্রধান হয়ে আছে, সেই সব রাগেও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নামা-ওঠার মধ্যে কোমল স্বরের ব্যবহার নেই। না থাকার তাৎপর্য্য লক্ষ্য করে এই মনে হয়, মস্‌জিদে আজান পাঠের সময় যেমন এক উদাত্ত প্রার্থনা থাকে, সেই উদ্দেশ্যের আশা রেখেই রাগ রূপ স্রষ্টারা ওই ধরনের রাগ গুলিকে উর্দ্ধমুখী করে রচনা করেছিলেন, তাই ওই সব রাগে কোমল সুরকে তাঁরা গ্রহণ করেন নি। বিচার ভিত্তিক এই মন্তব্য কারোর কাছেই কল্পনা উদ্ভূত বলে মনে করার মত নয়, মনশ্চক্ষুর দ্বারা তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট হবে। নানান সন্ধান ও নানান ভাবের মধ্য দিয়ে রাগরূপের সৃষ্টি হয়েছে, সেই হওয়ার মধ্যে যে বিজ্ঞানও দর্শনতত্ত্ব আছে তাকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করবার জন্য প্রচেষ্টা না রাখতে পারলে প্রকৃত সত্যকে বুঝবার মত সামর্থ্য আসবে না।

কোমল স্বর প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, আড়ানা, বাহার, এই দুটি রাগও তো উত্তরাঙ্গের উপর উর্দ্ধমুখী, তাহলে এদের সুরে কোমল স্বর কেন ব্যবহার হয়েছে? এর উত্তর,—আড়ানা রাগ আরোহণ মুখী হয়ে উঠে সত্য, কিন্তু সে 'সা' সুরকে ধরেই 'পা' সুরে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই জন্য এই রাগ আলাইয়ার ন্যায় রাগদের মত উত্তর মুখে প্রতিষ্ঠিত রাগ নয় বলেই আড়ানার বাদীস্বর পঞ্চম। এই রাগটি সারঙ্গের আরোহণ এবং কানড়ার অবরোহণ নিয়ে তৈরি, তাই ওই দুটি রাগের সংবাদী স্বরই এর বাদী স্বর হয়েছে। বাহারও যে সম্পুর্ণ উত্তরমুখী রাগ তা নয়। তাহলে এর বাদীস্বর মধ্যম হত না এবং পূর্বাঙ্গে কোমল গান্ধারের ব্যবহার থাকত না। পূর্বাঙ্গের মধ্যেও এই রাগকে ভাল করে চেনান যায় স্বর রচনার দ্বারা, যেমন—সামা, মাপা গামা, নিপামা, পাধামাপাগা, গামা, রে, সা, নি্ধ্ নি্সা, মা, নিপামা, গামা নিপা গামারে, সা, ইত্যাদি। প্রত্যেক রাগের মধ্যেই অতি সঙ্গত বিচার যুক্তি আছে, তা যদি না থাকত, তাহলে রাগ সংগীতের নাম শাস্ত্রীয় সংগীত হত না। সুতরাং রাগরূপের অকৃত্রিম রূপকে সংরক্ষিত করে রাখার দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। তাহলে চর্চারত ব্যক্তিদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পী ও জ্ঞানী নাম থাকবে না॥

(২) রাগ বিভাস,-যে বিভাসের রূপ প্রাচীন কালের বিখ্যাত গায়কদের রচিত ধ্রুপদাঙ্গের গানে, সদারঙ্গের খেয়াল গানে, প্রাচীন যন্ত্রীদের রচিত গৎ এ থেকে এসেছে এবং আমাদের দেশে যে সুরের পরিচয় বাউলদের, বৈরাগীদের, কীর্ত্তনে, যাত্রায়, রবীন্দ্রনাথের বহু গানে এবং আগমনী ইত্যাদি গানে থেকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এসেছে এবং শত শত বৎসর ধরে গায়ক-বাদকরা শিখে এবং পরিবেশন করে এসেছেন, সেই প্রধান স্বর সমষ্টি নিয়ে গঠিত বিভাসের রূপকে ত্যাগ করে ভূপালী রাগে 'রে' 'ধা' কোমল দিয়ে এক অদ্ভুত সুরকে বিভাস নামে কি করে পরিচিত করা হল তার সম্বন্ধে কোন যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাই নি। এ রকম সুরের পরিচয় আমি কোন প্রাচীন ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদির মধ্যেও পাইনি। যে সময় হতে নানান সুরের রূপ সংগ্রহ করে ক্রমান্বয়ে বহু প্রকার রাগের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেগুলিকে সংরক্ষণের জন্য বিধিবদ্ধ প্রণালী দ্বারা ধ্রুবপদ (ধ্রুপদ) গান রচনা করে সুরক্ষিত করা হয়েছিল, সেই সব গানই বিষ্ণুপুর ঘরাণায় সংগৃহীত হয়ে প্রচারিত হয়ে এসেছে এই দেশে। সুতরাং এই ঘরাণার গান সমূহে রাগরূপের অকৃত্রিম পরিচয় যেভাবে থেকে এসেছে সেই পরিচয়কে ত্যাগ করার মানে আসলের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যাঁরা এই রাগের পরিবর্ত্তিত সুরকে গ্রহণ করে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেককে আমি জিজ্ঞেস করেছি মতান্তরের স্বীকৃত স্বরূপ এর প্রাচীন চারপদী ধ্রুপদ শুনাতে পারেন কিনা? একজন মাত্র পারি বলে যে একটি গান আস্থায়ী অন্তরার মধ্যে শুনিয়েছিলেন, সেটি একটি আমাদের জানিত ভৈরবরাগের প্রাচীন খেয়াল। বুঝলাম, ঘরাণা পরিচয় শূন্য কোন নামকরা খেয়াল গায়ক বিভাসের প্রকৃত রূপ না জানার জন্য জানার পরিচয় দিতে গিয়ে ওই রকম সুর সংযোগ করে বিভাস বলে-প্রচার করেছেন। এই রকম ভাবে ছন্নছাড়া খেয়াল গায়কদের দ্বারাই পরিচয় শূন্য মতান্তর নাম দিয়ে অনেক রাগের আসল কলেবর বিনষ্ট হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এর মধ্যে কোন কোন মুসলমান ধ্রুপদ গায়করাও হয়ত আছেন॥

বিভাসের আসল নাম হল বিভাসা, বিভাসা মানে প্রকাশ। এই রাগটি শুদ্ধ স্বরে গঠিত, আরোহণে মধ্যম-নিষাদ বর্জিত, অবরোহণে শুধু মধ্যম বর্জিত, বাদী, সংবাদী ধৈবত ও গন্ধার। এই রকম সুরের উপর অনেকগুলি করে প্রাচীন ধ্রুপদাঙ্গের ও খেয়াল অঙ্গের গান আমাদের ঘরাণায় আছে॥

(৩) দেশকার,—ওই রকম ভাবেই আসল বিভাস এখন দেশকারে পরিণত হয়েছে। কেবল অবরোহণের 'নি' সুরটি উৎপাটিত হয়ে গেছে খুসীর ঝড়েই মনে হয়। এই বিভাসরূপী দেশকার মোটেই আসল দেশকার নয়। দেশকারের আসল রূপে নিখাদ যুক্ত হয়ে আছে, রূপ অনেকটা তার ভূপালীর মত। ঠাট, অর্থাৎ স্বরগতি এইরূপ—সা-রে-গা-পা-ধা-নি-সা-নি-ধা-পা-গা-রে-সা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাদী-সংবাদী গান্ধার ধৈবত। স্বরূপ এই প্রকার,—সা রে গা, পা রে, সারে সা নি্ ধ্ (নীচের) নি্ ধ্ (নীচের) গা রে, নি্ রে সা, ইত্যাদি॥

প্রায় দু'শ বছর হতে চলল মৌলাবক্স ঘিসে খাঁর স্বরলিপি সহ গ্রন্থে এই রাগের ওই রকম সুরে একটি তেওট তালের খেয়াল গান আছে। তিনি ঘরাণা ধ্রুপদীবংশের গুণী ছিলেন বলেই এই রাগের আসল রূপ গানে প্রকাশ পেয়েছে॥

(৪) মেঘরাগ,— বর্ষার আগেই যে মেঘরাগের সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রমাণ শাস্ত্রীয় গ্রন্থের শ্লোকেও পাওয়া যায়। এই রাগটির মেঘ নাম কেন হ'ল তার সম্বন্ধে বিচার যুক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌছন যায়,—বর্ষার পূর্বে কাল-বৈশাখীর রূপ ধরে আকাশে যে এক শিহরণ জাগানর মত রূপের সৃষ্টি হয় এবং আশা জাগায় বৃষ্টির সম্ভাবনার, তখনকার সেই দৃশ্য অবলোকন করে ভাব-বিহ্বলিত চিত্তে যে সুর সাধকের কণ্ঠে সারঙ্গর মত হয়ে ধরা দিয়েছিল, সেই সুরের রূপকে তিনি মেঘ নামে পরিচিত করেন। পরে ওই নামের উপর সেই তাকে ধরে আগেকার প্রাচীন গায়করা বহু ধ্রুপদাদি গান এবং বাদকরা গৎ রচনা করে গেছেন। এই রাগের রূপে আছে সবই শুদ্ধ স্বর, আরোহণে গান্ধার ধৈবত ব্যবহার নেই, জাতিত্বের পরিচয়ে আছে ঔড়ব যাড়ব হয়ে, অবরোহণে ধৈবত বর্জিত। এর বাদীস্বর মধ্যম। এই রাগে এখন কোমল 'নি' ব্যবহার হচ্ছে। এই ব্যবহার রাগরূপের সৃষ্টি তাৎপর্য্যকে বুঝতে পারার অভাব বশতই হচ্ছে। কারণ, আগেই জানিয়েছি, যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই রাগের জন্ম হয়েছে, তাতে তার মধ্যে কোমল ভাব অর্থাৎ কোমল স্বরের প্রবেশাধিকার থাকতেই পারে না। এই জন্যই উক্ত গানাদিতেও রচয়িতারা ব্যবহার করেন নি, তাঁরা এর সত্য রূপকেই সত্যের বিচারে রক্ষা করে গেছেন। সুতরাং রাগরূপের আসল পরিচয়কে রক্ষা করে যাওয়াই সকলের কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। বর্ষার সময়েই মল্লার রাগের সৃষ্টি হয়েছিল, একথা শাস্ত্রীয় গ্রন্থেও আছে। ওই সময়ের উপযোগী হয়ে যে মল্লার রাগের সৃষ্টি, তাতেও কোন কোমল স্বর নেই। কেন থাকলনা, তার কারণে এই মনে হয়, বর্ষার আরম্ভ থেকে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত থাকেনা কোমলতার রূপ. তাই কোমল স্বর ব্যবহার নেই। তখন থাকে দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ-এর ঝলক, বজ্রের ভীষণ শব্দ, এবং অনেক বিষয়ে ভয় ভীতি ইত্যাদি, সুতরাং সেই পরিবেশে এই রাগের উপর কোমল স্বরের স্থান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন থাকবে কি করে? পরে বর্ষার দুর্দান্ত ভাব আস্তে আস্তে কেটে যাবার সময় থেকে ওই দুটি রাগকে ধরে কোমল স্বরের প্রয়োগ রেখে সুর ইত্যাদি কোমল স্বভাবের অনেকগুলি রাগের সৃষ্টি হয়েছে—যে সময় থেকে সরোবরে কমল ও কুমুদিনীর রূপ বিকশিত হয়, শিউলী ঝরে পড়ে ধরিত্রীর বুকে ইত্যাদি॥

কতকগুলি রাগরূপকে ঋতুর সংগে এবং সময়ের সংগে সম্পর্ক রেখে উপযোগী করে প্রকৃত সাধকদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। এই নিয়মকে মেনে চলা সত্ত্বেও কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ বিচার বুদ্ধিকে সরিয়ে সময় সম্পর্ককে লণ্ড ভণ্ড করে রাগে রাগে জোড়া দিয়ে অন্যায় ভাবে পরিচয় রেখেছেন, 'ভৈরব বাহার' 'নট বেহাগ' 'নট ভৈরব' 'বসন্ত বাহার' ইত্যাদির দ্বারা। আমি ভাবতেই পারিনা, ভৈরবরাগকে প্রাতঃকালে এবং বাহার রাগকে রাত্রিকালে যখন আমরা ব্যবহার করে থাকি সময়ের উপযোগী বলে মেনে নিয়ে, তখন ওই দু'টি রাগ যুগ্মভাবে কি করে প্রকাশ পেতে পারে? তাছাড়া ওই দুটির রূপের এত তফাৎ যখন, তখন সমন্বয় সম্বন্ধই বা কি করে আসতে পারে! এরকম ভাবে যুগ্ম রাগের বেখাপ্পা সৃষ্টি ও পরিবেশন মোটেই বিচার সম্মত নয়।

মল্লার রাগের প্রকৃত স্বরগতি বা ঠাট, এইরূপ যথা,— সা-রে-মা-গা-মা-পা-ধা স́া-না-স́া-ধা-পা-মা-গা-মা-রে-সা। বক্রগতির রাগ, পঞ্চম-ঋষভ বাদী-সংবাদী। মধ্যম বলীস্বর।

মেঘ রাগের উপর আমি কোমল নি ব্যবহার করে দেখেছি, প্রাচীন ধ্রুপদ, খেয়ালে তার সুরের রূপে যে এক তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাবগাম্ভীর্য্য আছে তা ব্যাহত হয় কোমল 'নি' এর ব্যবহারে। মনে হয় যেন সজাগ শক্তি এলিয়ে পড়েছে। এই সব বিষয়ে অনুধাবনের বিশেষ আবশ্যক থাকে। পরিবর্তন তখনই করা চলে, যখন দেখা যাবে বিচার বোধের দ্বারা সঙ্গত কারণ আছে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, রাগরূপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও স্বভাবগত তার ভাব তাৎপর্য্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার আকাঙ্ক্ষা রাখতে পারলে তাদের অকৃত্রিম রূপকে ত্যাগ করার ইচ্ছে কোন মতেই আসবে না, তখন বোধশক্তির স্বচ্ছতা এসে গিয়ে সাবধান ও সতর্ক করবে ছায়ানটে, আলাইয়ায়; কেদার রাগে, মেঘ-রাগ ইত্যাদিতে কোমল 'নি' এবং রামকেলী ও কামোদে কড়ি যথায় ব্যবহার না করতে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই প্রসঙ্গে বিচার যুক্তির আর একটা কথা, একই রাগের একই রকম স্বরের অরোহণ-অবরোহণ অন্য কোন রাগে কদাচ হবে না। রাগ বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় কথা হল, রাগ রূপকে চিহ্নিত করবে তার আরোহণ-অবরোহণের স্বর সমষ্টির দ্বারাই। কিন্তু মেঘ ও সারঙ্গ রাগের স্বরগুলির আরোহণ-অবরোহণ একই ভাবে ফেলায় অত্যন্ত ভুল হয়েছে। এই ভুল মারাত্মক।

কারো কারো ধারণা আছে, (অপপ্রয়োগ হলেও) কোন একটি কোমল স্বরের উপরই সেই রাগের রসমাধুর্য্য নির্ভর হয়ে আছে। আমার মতে এ কথার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। সব কিছু নির্ভর করে শিল্পীর শক্তি-সামর্থ্য, উপস্থাপনার ভঙ্গী ও রসবোধের উপরই। যোগ্য শিল্পীর কাছে কড়ি-কোমলহীন রাগেও রসলালিত্যের অভাব থাকে না॥

(৫) বাগেশ্রী রাগের আরোহণে গান্ধার ব্যবহার রাগের রূপধর্ম্মী মোটেই নয়। সা-রে-মা-ধা, এইভাবে স্বরোত্থাপনের উপরই এর রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে প্রায় আটশ' বছর আগে থাকতে নায়ক গোপাল, বৈজু, তানসেন প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত গায়কদের রচিত ধ্রুপদ গানে, খেয়াল গান স্রষ্টা সদারঙ্গের খেয়াল গানে এবং প্রাচীন যন্ত্রীদের রচিত গৎএ।

ওইভাবে স্বরের ব্যবহার ছিল কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত এখানের বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যেও। অতিশয় যুক্তিসম্মতভাবে রাগরূপের পরিচয় যেভাবে থেকে এসেছে স্বর সংস্থাপনার নিয়ম নীতির উপর, তাকে ত্যাগ করে সা-রে-মা-ধা'র পরিবর্তে সা-গা-মা-ধা, করে উপর দিকে ওঠার কোন যুক্তিই নেই। কয়েকটি বড় রাগের রূপসহচর ও ঘরোয়া সম্পর্ক রেখে তদনুযায়ী রাগের সৃষ্টি করে রাগগোষ্ঠী নিরাকৃত হয়েছিল। যেমন অষ্টাদশ কানড়া, ত্রয়োদশ তোড়ী, দ্বাদশ মল্লার, নবমনট ও সপ্ত সারঙ্গ। বাগেশ্রীর গোষ্ঠী পরিচয়ে কানড়ার মধ্যে স্থান আছে। অতি সঙ্গত কারণেই এই স্থান নিরাকৃত হয়েছে। কারণ কোমল 'ধা' না থাকলেও ধ্রুপদাদি গানের মধ্যে যেভাবে স্বরসংস্থাপনার পরিচয় আছে তাতে বেশ বুঝা যায় ওই গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ আছে। কিন্তু আরোহণে 'রে' সুর বর্জন করায় মালকৌষ ঘেঁষা হয়ে গেছে এবং তার স্নিগ্ধ শান্ত ও স্বভাবগতের মত পূর্বাঙ্গ প্রধানের স্বরূপ বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে। বাগেশ্রীর অকৃত্রিম রূপের পরিচয়ে পূর্বাঙ্গ প্রধান স্বীকৃত। বাদীস্বর মধ্যমকে ধরে তিন স্বরে রাগকে চিহ্নিত করার নিয়ম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রক্ষায় সা-রে-মা, এই স্বর তিনটিই সেই পরিচয় প্রদান করবে। সা-গা-মা, করবে না, ওতে মালকৌষের রূপ স্পষ্ট হয়ে পড়বে। সুতরাং সব দিক দিয়ে বিচারে আরোহণে সা-রে-মা, এই স্বরই ব্যবহার হবে। যাঁরা এই বিচার বিশ্লেষণ মানবেন না, তাঁরা খেয়াল খুসীর রাজত্বে বাস করেন বুঝতে হবে। সা-রে-মা, স্বর আরোহণে রেখে যাঁরা এই রাগকে আঁকবেন তাঁরা আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করে বুঝবেন কত সুন্দর ও আবেগময়॥

এখন সা-গা-মা-ধা, করে সুরের রূপ আঁকার জন্য মালকৌষ রাগের পর্য্যায়ে পড়ে গেছে। এইভাবে স্বরের ব্যবহার রাখা যে অনুচিত তার এক যে বড় প্রমাণ আছে বিচার গত হয়ে, তাহল তিন স্বরে রাগ-রূপকে চিহ্নিত করার সুন্দর এক আবিষ্কার। আমি তার পরিচয় রেখেছি আমার রচিত 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থে প্রায় প্রচলিত অধিকাংশ রাগের। বিভিন্ন সুরকে ধরে তার আকৃতি বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এই সব সৃষ্ট বস্তু পৃথক পৃথক নামে পরিচিত হয়েছে। তার মূল পরিচয়কে আমরা বলি রাগরূপ। সুতরাং অন্যান্য জীব জন্তুর মত তাদেরও রূপে তিনটি অঙ্গ প্রধান হয়ে নিশ্চয় আছে বুঝতে হবে। কিন্তু তা অন্যান্য প্রাণীদের মত নিম্নাঙ্গ, মধ্যাঙ্গ ও উর্দ্ধাঙ্গের পরিচয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে নয়। রাগরূপের এই পরিচয় তার বাদীস্বরকে অবলম্বন করে কাছাকাছি আর দুটি স্বরকে ধরে মোট তিন স্বরেই তার রূপকে চিহ্নিত করে, রাগরূপের স্বভাবগত রূপকে রক্ষা করে। যে সব রাগে এ সম্ভাবনা থাকবে না বলে মনে হবে, সে সব রাগ নিয়ম-নীতি ও রাগ বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে রচিত হয় নি, এই বুঝতে হবে। সেগুলো নিতান্ত খেয়াল-খুসী নিয়ে হয়েছে। তিন স্বরের দ্বারা বাগেশ্রী রাগকে চিহ্নিত করতে সঙ্গতরূপে সা-রে-মা; এই তিন স্বরই সক্ষম। সা-গা-মা, এই তিন স্বরকে ধরলে মালকৌষকে চিহ্নিত করবে। সুতরাং আরোহণে 'রে' সুরকে ত্যাগ করে পরিবর্তে 'গা' সুরকে গ্রহণ করা কোন মতেই চলে না। ওই স্বর ওই ভাবে ব্যবহার করার জন্যে রাগের স্বভাবগত রূপকে ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বিচারকে বিঘ্নিত করেছে। সুতরাং প্রাচীন ধ্রুপদাদি গানে এবং গৎএ যেভাবে আরোহণে 'রে' সুরের ব্যবহার ন্যায় সঙ্গতরূপে আছে তাকেই গ্রহণ করে চর্চায় রাখা একান্তভাবে উচিত। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন মা-ধা-ণা-ধা, এই তিন স্বরেও এই রাগকে চেনা যাচ্ছে, তাহলে সেখানেই বা ওই পরিচয় থাকবে না কেন? এর উত্তর,—চেনা গেলেও নীতি-নিয়মের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপর তাকে চিহ্নিত করার স্থান নয়। কারণ বাগেশ্রী প্রকৃতপক্ষে পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ, তার স্বভাবগত রূপের উপর মধ্যম স্বরই হয়ে আছে মুখমণ্ডলের মত। সুতরাং ন্যায়সঙ্গতভাবে সা-রে-মা, এই তিন স্বরই তার আসল রূপকে চিহ্নিত করার পক্ষে উপযুক্ত। বাগেশ্রীর 'ধা' এবং অবরোহণের 'গা' এই দুটি বলী স্বরের মত। বলী স্বরের অর্থ হল, বাদী-সংবাদীর পর যে যে রাগে কোন কোন স্বরের প্রভাব তার অন্যান্য আরো স্বর অপেক্ষা অনেক বেশী থাকে তাকে বলীস্বর বলা হয়। যেমন কেদার রাগের পঞ্চম, ভৈরব রাগের ধৈবত-ঋষভ, ইমনের পঞ্চম, কানড়ার ধৈবত, গান্ধার ; ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যেমন রাম, লক্ষ্মণ, বাদী-সংবাদী, আর মহাবীর হনুমান বালীস্বর, একাধিক ভাবে সুগ্রীবকেও ধরা যেতে পারে।

কোন কোন খেয়াল গানের বলী স্বরের উপর সম্ আছে দেখে যদি মনে করা হয় ওই রাগের ওই স্বরই বাদী, তাহলে ওরকম মনে করা খুবই ভুল হবে॥

(৬) ললিত রাগ,—ললিত রাগের সৃষ্টি উদ্দেশ্যের উপর তার প্রভাবময় স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করেছে স্বর সংযোগ ব্যবস্থায় মধ্যমকে বাদী স্বর করে। মনে হয় যেন স্বভাবতই মধ্যম স্বর রাগ রূপের মুখমণ্ডলে স্থান নিয়েছে। কিন্তু এখন অনেকে যখন গান্ধারকে বাদীর মত দাঁড় করিয়ে রাখেন, তখন মনে হয়, রাগের স্বভাবগত রূপ ধর্মের সংগে তাঁরা পরিচিত নন। প্রত্যেক প্রাচীন গানে ও গৎএর দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝা যাবে গান্ধার মোটেই প্রবল স্বর নয়। এটাও জানা উচিত, সব রাগের আভ্যন্তরিক স্বরের প্রত্যেকটাকে ধরে বিস্তারও স্থায়ীত্ব দিয়ে প্রকাশ করা চলে না। তবে ইচ্ছে নিয়ে খুশী মত করা, সেকথা আলাদা। কিন্তু সে কাজ নিজের জ্ঞান ও বোধের একান্ত পরিপন্থী॥

(৭) রামকেলী,—ভৈরব থেকে রামকেলী রাগের উদ্ভব ও নামোৎপত্তি। এজন্য ভৈরবের পরই তাকে ব্যবহারের জন্য প্রাতঃকালের ধরিত্রীর সল্লোক্ষ সময়ে ধার্য্য করা আছে,—ভৈরব রাগের স্নিগ্ধতা কিছু সরিয়ে আরোহণে 'রে' সুর ত্যাগ করে পঞ্চমের উপর বাদীস্বর স্থাপন করে। কিছু-কাল থেকে রামকেলীতে কড়ি মধ্যম কি করে এবং কোন্ বিচার যুক্তিতে ব্যবহার হয়ে উঠল তা শুধু আশ্চর্য্যই নয় অভাবনীয়ও বটে। ভৈরব রাগের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মূর্তির কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে রামকেলী, যোগীয়া, কলিঙ্গড় প্রভৃতি রাগের জন্ম হয়েছিল—ভৈরবের রূপ ধর্মের প্রভাবকে রক্ষা করে। সুতরাং সেই প্রভাব সম্পর্কের বাস্তবতাকে গায়ের জোরে উৎখাত করার অনুচিত আগ্রহ যাঁরা না রাখবেন তাঁরা কখনই রামকেলীতে কড়ি মধ্যম ব্যবহার করবেন না। তাছাড়া যাঁদের শ্রুতিবোধ আছে তাঁদের কাছে কড়ি মধ্যম ব্যবহারের সময় মনে হবে রামকেলী রাগের মধ্যে যে স্নিগ্ধ সরসতার মাধুর্য্য আছে তার উপর অন্যায় আচরণ হচ্ছে এবং সেই উচ্চারিত সুরের রূপ প্রাতঃকালের ভাবময় পরিবেশের সংগে সম্পর্ক ছাড়া হয়ে গেছে। ওই রাগে ওই স্বর এত খাপছাড়া যে, প্রয়োগের সময় মনে হয় যেন প্রকাশকের কোন দায়িত্ব বোধ নেই। ভৈরব থেকে ওই রাগকে বাঁচিয়ে রাখার সামর্থ্যের অভাব বশত যদি ওই স্বরকে হেঁচড়ে টেনে আনা হয়ে থাকে, তাহলে আমি বলব, অমন করে রামকেলী গাইবার কি দরকার? ভৈরবের মত অমন যে রাগ, যার প্রকাশ শক্তি অফুরন্ত, ধ্যানগত হয়ে সাধনায় রাখলে নিত্য নূতন চিত্ররূপ ধরা দেয়, তাকে সাধনায় স্থান দেওয়াই তো প্রকৃতপক্ষে লাভজনক॥

(৮) ভৈরব রাগ,—ভৈরব রাগ পূর্বাঙ্গ প্রধান, এই রাগে ন্যায়সঙ্গতরূপে মধ্যম বাদীস্বর হয়ে আছে। এই হয়ে থাকার বিচারবোধ কারোর পক্ষেই না থাকার কথা নয়। কিন্তু এখন কোন কোন গ্রন্থ দৃষ্টে কেউ কেউ যখন বলেন এই রাগের বাদী-সংবাদী ধৈবত ও ঋষভ, তখন মনে হয় এঁরা নিজের জ্ঞানগত বিচার বুদ্ধির দিকে না তাকিয়ে 'হিজ মাষ্টার ভয়েস' হয়ে পড়েছেন। রাগ রূপের উপর দৃষ্টি দিলে সহজেই বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, যে-যে রাগের উপর প্রধান অর্থাৎ শুদ্ধ স্বর তার আরোহণ-অবরোহণে ব্যবহার হয় এবং স্থিতিশীল হতে পারে, সেই সেই রাগের বাদী স্বর কখনও কোমল স্বর হবে না, যতই তাতে কোমল স্বর থাকুক, শুদ্ধ স্বরই বাদী-সংবাদী হবে। এটা সাধারণ ব্যবহারের কথা নয়—রাগ বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা। দু' একটা উদাহরণ, যেমন—মালকোষ, কানড়া, আশাবরী, মুলতান, ভৈরবী, শ্রী, জৌনপুরী, ললিত ইত্যাদি। এই সমস্ত রাগের মধ্যে শুদ্ধ অর্থাৎ প্রধান স্বরের বাদী-সংবাদীর বিজ্ঞান সম্মত নির্দ্ধারণ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের না জানার কথা নয়। তাছাড়া প্রাচীন ধ্রুপদ, খেয়াল এবং গৎএও পাওয়া যাবে ওই পরিচয়।

(৯) মিশ্ররাগ—দিবা প্রথম প্রহরের প্রায় শেষ অংশের সময়ের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আলাইয়া রাগকে গ্রহণ করে তার রূপ সম্পর্কের সংগে মিলন ঘটানর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপযোগী মত রাত্রের কয়েকটি রাগের রূপাংশ গ্রহণ করে নূতন নামে এক সময় কয়েকটি রাগের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন—আলাইয়া রাগের উত্তরাঙ্গের মূল পরিচয়ের সংগে সম্পর্ক রেখে কামোদের পূর্বাঙ্গ নিয়ে 'সরফর্দ্দা' নাম দেওয়া হয়েছিল, এমনিভাবে পূর্বাঙ্গে ইমনের সুর নিয়ে গা, নি, এর উপর প্রাধান্য দিয়ে কড়ি মধ্যম ব্যবহার না করে নাম হয়েছে 'দেবগিরি' (দেওগিরি), তিলক কামোদের সুর যুক্ত করে 'শুক্লবেলাবলী', ছায়ানট ও দেশরাগের সুর মিশিয়ে 'কুকভা'। একস্থানে জানিয়েছি শুক্ল-বেলাবলী রাগের সংগে বেলবলী (বেলাওল) রাগের কোন সম্পর্ক নেই। প্রাচীন ধ্রুপদী বেলাওল বোধ হয় এখন কারোরি জানা নেই। যাকে বেলাওল বলা হয়, আসলে তা আলাইয়া। আসল বেলাওলের রূপে আছে পূর্বাঙ্গে ইমনকল্যাণ এবং উত্তরাঙ্গে আলাইয়ার সুর। শাস্ত্রের শ্লোকে তার পরিবেশনের সময় ধার্য্য হয়ে আছে আলাইয়ার অনেক পরে। রাগ রূপের প্রকৃত পরিচয় রক্ষায় এই সব সন্ধান রেখে তবে গ্রন্থ রচনা করতে হয়। যাই হোক, ওই মিশ্র রাগগুলির নাম উচ্চারণের পরে সরফর্দ্দাবেলাওল, দেওগিরিবেলাওল এইভাবে নাম সম্বোধন সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয়। রাগের মিশ্রণে যখন একটা নাম নূতন করে রাখা হয় তখন সেই নামই উচ্চারিত হয়ে থাকে, তার সংগে মিশ্রিত রাগ, দুটো বা তিনটের নাম ঘোষিত হয় না। যেমন—সারঙ্গ ও কানড়ার সুর নিয়ে আড়ানা, এইরকম ভাবে মিশ্রিত হলেও জয়জয়ন্তী, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি রাগ-গুলি একক নামেই পরিচিত। এমন কি ভৈরব রাগের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্বেও যোগীয়া, রামকেলী, কলিঙ্গড়া ইত্যাদি রাগগুলির নামের পূর্বে বা পরে ভৈরব কথা যুক্ত হয়ে নেই। সুতরাং বিচার বোধ রেখে এই সব বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক॥

(১০) বেলাওল রাগ,—যে যে রাগ নিয়ে বেলাবলী রাগের উৎপত্তি তার কথা আগেই জানিয়েছি। প্রাচীন ধ্রুপদ-খেয়ালেও ওই রকম সুরের রূপই সংযোজিত হয়ে আছে এবং তানসেন রচিত ধ্রুপদ গানেও। ওই রকম সুরেই আগের প্রাচীন ঘরাণার গুণীদের যে জানা ছিল তার একটি প্রমাণ তুলে ধরছি। ইং ১৯১১ সালে কাশিম বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর রাজপ্রাসাদে অন্নপূর্ণা পূজায় দ্বিতীয় বার সঙ্গীতের যে বিরাট আসর হয়েছিল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাতেও উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদী দৌলতখাঁ, অঘোর চক্রবর্তী, লছমীমিশ্রের পুত্র হরিদাস মিশ্র, বিখ্যাত খেয়াল গায়ক মজফ্ফরখাঁ ও নসীরখাঁ, বিখ্যাত ব্যাঞ্জো বাদক কৌকুভখাঁ এবং আরো অনেকে। এই আসরের দ্বিতীয় দিনের প্রায় মধ্যাহ্নে মেজ কাকা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুরবাহারের আলাপে উক্ত মতে অর্থাৎ রাগের আসল পরিচয় মতে বেলাওল রাগ পরিবেশন করেন। তাঁর বাদনে সকলেই খুব মুগ্ধ হন এবং বেলাওলের ওই সুরকেই তাঁরা জানেন বলে পরিচয় দেন। যাঁরা প্রাচীন ঘরাণা ও প্রাচীন ধ্রুপদ-খেয়ালের সংগে সম্পর্ক রাখতে পারেন নি তাঁরাই আলাইয়ার আসল রূপকে 'বেলাওল' করেছেন। দেখা যাচ্ছে অনেক বিষয়েই ভুল-ভ্রান্তি ও বিচার বিভ্রাট বিশেষভাবেই হয়ে পড়েছে। বেলাওলের আসল রূপ জানা থাকলে ঠাটের নামে আলাইয়াই থাকত। যদিও এক জায়গায় জানিয়েছি ঠাটের উপর গোষ্ঠী করণের কোন মানে হয় না। বৃন্দাবনীসারঙ্গ, কাফী ঠাটের অন্তর্গত, একথা শুনে আশ্চর্য্য লাগে—কতখানি অবাস্তব এই ভেবে॥

(১১) বসন্তরাগ,—বসন্তর মত একটি বড় রাগের আসল মূর্ত্তিকে ত্যাগ করে তার বাদীস্বর মধ্যমটিকে মাঝে মাঝে ধার করে নেওয়ার মত পরজের সুরে লাগিয়ে তাকে বসন্ত বলে পরিচয় দিচ্ছেন আজকাল অধিকাংশই চর্চারত ব্যক্তিরা। এঁদের যদি বলা যায় এই রকম সুরে রচিত দু' একটা প্রাচীন ধ্রুপদ শুনান তো বসন্ত নামের পরিচয় রক্ষায়, তাহলে তাঁদের পক্ষে একটা মনগড়া করে শুনিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। 'পরজ বসন্তকে' বসন্ত বলে প্রচার করা কি করে সম্ভব হল তা ভেবে আশ্চর্য্য হতে হয়। খুব বেশী দিনের কথা নয়, এখানে যে সব বহিরাগত জ্ঞানী সঙ্গীতজ্ঞরা ছিলেন তাঁরাও পরজ বসন্তকে বসন্ত বলার খবর পান নি।

একে পরজ-বসন্ত বললে বিচার যুক্তি থাকবে, এবং তাতে পরজের নিষাদ, গান্ধার বাদী-সংবাদীকেই এর উপরে রাখতে পারা যাবে, কিন্তু শুধু বসন্ত বললে বাদী-সংবাদীর পরিচয় কিভাবে আসবে? তারা সপ্তকের 'সা'কে বাদী করতে গেলে সংবাদী পঞ্চম হবে না, মধ্যমকে তো করাই চলবে না, কারণ পরজের সুরকে ধরে তার উপরই ব্যবহারের জন্য ওই স্বর বসন্ত থেকে নেওয়া হয়েছে এবং আরোহণ অবরোহণের দ্বারা রাগ রূপ পরিচয়ের সময় তার স্থান নেই। পঞ্চম সংবাদী হবে না, কারণ আরোহণে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তার ব্যবহার থাকে না। অন্তরাগের বাদী স্বরকে পৃথক ভাবে তুলে নিয়ে ব্যবহার করার অন্যায় নজীর এটির মত আর দ্বিতীয় কোন রাগে নেই, এবং থাকতে পারেও না। সুতরাং এই রকম নীতি ও বিজ্ঞান বহির্ভূত সুরকে বসন্ত বলে পরিচিত করা এক অদ্ভুত মনবৃত্তি। বিচার বোধ রেখে এই সুরটি কে পরজবসন্ত বলায় আপত্তি কি?

(১২) শুদ্ধ সারঙ্গ,—রাগের নাম শুদ্ধ সারঙ্গ দিয়ে যে এক সুরের প্রচার বেড়ে গেছে তাতেও তার নামের অর্থ একেবারেই শূন্য হয়ে পড়েছে। কারণ, রাগটির মধ্যে সুরের ক্রিয়া যে ভাবে থাকে তাতে আসল বৃন্দাবনী সারঙ্গএর রূপই প্রধান হয়ে, তারপর এতে উত্তরাঙ্গের দিকে রে-মা (কড়ি) পা-ধা-পা-মা (কড়ি) পা-নি-ধা-পা, মা (কড়ি) পা-ধা-পা, এই ভাবে সুরের রূপ থাকায় তাকে 'ইমন'ই বলা যায়। আবার যখন মা (কড়ি) পা-ধা-পা-মা-রে, এই ভাবে সুর প্রকাশ পায় তখন এসে পড়ে কেদার রাগের রূপ। সুতরাং একে শুদ্ধ সারঙ্গ বলা একেবারেই অনুচিত। রাগটি সঙ্কীর্ণ জাতির পর্য্যায়ের। একে রক্ষা করা হোক, কিন্তু মিশ্র সারঙ্গ নামে। শুদ্ধ সারঙ্গ বলতে বুঝাবে একমাত্র সারঙ্গকেই, যাকে বৃন্দাবনী সারঙ্গ বলা হয়॥

সারঙ্গ রাগটির জন্মতত্ত্বের পরিচয় জানার পর তার স্বভাবগত সুরে কোমল 'নি' ব্যবহার করা কি উচিত? ভূপালীর মত এরও আদি সুরকে রক্ষা করেই প্রাচীন গায়করা ধ্রুপদাদি গানে এবং যন্ত্রীরা তাঁদের গৎ এ সারঙ্গকে পরিচিত করে গেছেন। সুতরাং রাগরূপের সৃষ্টি তত্ত্বের স্বরূপকে যথাযথ ভাবে রক্ষা করে যাওয়াই সঙ্গত বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। আমার মনে হয়, আদি পরিচয় মূলক রাগগুলির স্বরূপ তত্ত্ব ও ধ্রুপদাদি গানে তাদের রূপ কিভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে সে সম্বন্ধে জানার ইচ্ছে না রাখার জন্যই স্বর সংযুক্তির বিভ্রাট ঘটে যাচ্ছে। অকৃত্রিক রূপকে রক্ষা করার পক্ষে এটা খুবই ক্ষতিকর বলে আমি মনে করি॥

(১৪) গৌড়সারঙ্গ,—এই রাগটিতে দেখা যায় গৌড় বা গৌড় মল্লার নামে যে রাগ আছে তার স্বর রূপের সংগে এর যেমন কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি সারঙ্গ রাগের সংগেও নেই। সুতরাং এই দুই রাগের সংগে সম্পর্কহীন হয়ে থাকা সত্ত্বেও গৌড় সারঙ্গ নাম কেন হল, তার সম্বন্ধে বিচার ভিত্তিক আমার মন্তব্য জানাব। তার পূর্বে এই রাগটি যে যে রাগের সুর ধরে রচিত হয়েছে বলে গুণীরা জানিয়েছেন তার কথা জানাই। তাঁরা বলেছেন,—এই রাগটির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুর বেহাগ ও কল্যাণ রাগকে ধরে রচিত হয়েছে। কিন্তু উত্তরাঙ্গে,ইমনের রূপও আছে। যাইহোক, মিশ্রিত রূপে সৃষ্টি হয়েও এর গঠন রূপ যেন নিজস্ব শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যেমন সুরট, ঝিঁঝিঁট, আড়ানা, ইত্যাদির মত। গৌড়সারঙ্গের রূপকে যে নিয়ম পদ্ধতির উপর আঁকতে হয়, তাতে বেহাগ রাগের প্রভাব তেমন থাকে না। নীতি নিয়মযুক্ত স্বরাঙ্কনেই তার প্রমাণ, যথা, সা-গা-রে-মা-গা, মা (কড়ি) পা-ধা-নি-র্সা-নি-ধা-পা-মা (কড়ি) পা-মা-গা, রে-মা-গা, রে-সা। পা-রে-সা, এই তিনটি স্বরের একসংগে প্রয়োগ রাগরূপের অন্যতম প্রধান পরিচয়। স্বর সমূহের এই নিয়ম প্রকরণের উপর রাগরূপ নির্ভর করে থাকলেও আকারে সে কম নয়। তবে এর বৃহৎ আয়তনকে ভালভাবে বুঝতে হলে অন্ততঃ দু'চারটি প্রাচীন চারপদী ধ্রুপদ জানা একান্ত আবশ্যক। এই অভাবের জন্যই দেখা যায় অঙ্কন সীমিত হয়ে পড়ে এবং স্বইচ্ছায় বাড়াতে গেলে রাগ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এবার এর নামটির অর্থ প্রতিষ্ঠিত করার স্বপক্ষে কি যুক্তি ও সন্ধান আছে, সে কথাই জানাব। যিনি এই রাগটি সৃষ্টি করে ছিলেন তিনি যে গৌড় দেশের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তাতে আমার ধারণা নির্ভুল বলেই মনে হয়। সেই সঙ্গীতজ্ঞ লোচন পণ্ডিতও হতে পারেন। এর সুরের সেই সুরকার সঙ্গীতজ্ঞ ওই স্থানের নামকে গ্রহণ করে সারঙ্গ অর্থে অনেকগুলি জীবের যে নাম আছে যথা—চাতকপক্ষী, ময়ূর, ভ্রমর, হরিণ, হস্তী, সিংহ, চন্দন, শঙ্খ, পুষ্প ইত্যাদি, তার মধ্যে তাঁর প্রিয় কোন একটিকে মনের মধ্যে স্থান দিয়ে তাদের সম্পর্কিত আদি বা গোত্রনাম সারঙ্গকে যুক্ত করে 'গৌড় সারঙ্গ' নাম দিয়েছিলেন। কেউ যদি বলেন, এতগুলি নামের মধ্যে তার একটিকে গ্রহণ করলেন না কেন? এর উত্তর—গৌড় নামের সঙ্গে ওর কোন একটিকে যুক্ত করলে তা শোভন ও অর্থসঙ্গত হত না, কারণ গৌড় হস্তী, গৌড় সিংহ, গৌড় মৃগ, এইরকম নাম দিলে শুধুমাত্র বুঝাত ওই জীবগুলি গৌড় দেশের। সুতরাং 'গৌড় সারঙ্গ' নামই সঙ্গত হয়েছে। অনেকে সারং বলেন। কিন্তু তা ভুল; কারণ সারং কথা একমাত্র জাহাজ চালকের উপরেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে, অন্য কোন অর্থে ব্যবহার হয় না। অভিধানেও সারং বলে অন্য অর্থে কোন কথা নেই। সারঙ্গ রাগের নামও ওই অর্থের উপরেই রাখা যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। গৌড় নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায়, মান্ধাতার গৌড় নামে এক দৌহিত্র ছিল, তিনি ওই স্থানে রাজ্য স্থাপন করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজের নামে দেশের নামকরণ করেছিলেন। এই স্থান পশ্চিম বঙ্গের মালদহ জেলায় অবস্থিত। কেউ যদি বলেন, গোড় সারঙ্গ রাগ তো বহুকাল থেকে অন্য দেশেও প্রচলিত আছে, তাহলে এই রাগ গৌড় দেশের হবে কেন ? এর উত্তর—আদান-প্রদান ও সংগ্রহের মাধ্যমে বহুকাল থেকে এক দেশের জিনিষ অন্য দেশে যাতায়াত যে করেছিল ও করে এসেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ঢাকাই মসৃলিন্ দুরদুরান্তরে রপ্তানি হত। বাণিজ্য করতে সিংহলে যাওয়ারও সংবাদ আছে।

শুধু গৌড় সারঙ্গ রাগই নয়, সন্ধান ও পরিচয়ের মাধ্যমে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে এদেশের সৃষ্ট কতকগুলি রাগের মধ্যে কয়েকটি রাগ ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে পৌছেছিল সে সম্বন্ধে আমার ধারণা নির্ভুল বলেই মনে করি। সেগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম যথা—পাহাড়িয়া (পাহাড়ী), সারঙ্গ, বিভাস, মালবী, পটমঞ্জরী, নারায়ণী। উক্ত রাগগুলি ধ্রুপদাদি সঙ্গীতে নিবদ্ধ আছে। হাজার বছর আগে লুইপাদের চর্য্যাপদ গানে, লোচনপণ্ডিতের আটাশ' বছর আগেকার গ্রন্থে, বড়ু চণ্ডীদাসের পাচ শ' বছর আগেকার শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন গ্রন্থে যে সমস্ত রাগ ও তাল আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই লোপ পেয়ে গেছে। আগেকারগুলির মত যদি ওই রকম ভাবে পৌছত, তা হলে মনে হর ধ্রুপদাদি সঙ্গীতে ওগুলিও বেঁচে থাকত। এদেশে ধ্রুপদাদি গান আসার পর তার চর্চার উপরই আগ্রহ ও আকর্ষণ এসে যাওয়ায় ওই অবস্থা ঘটে গেছে। এটা খুবই ক্ষতির কথা। প্রামাণিক সত্যের উপর একথা জোর দিয়ে বলা যায়, এই দেশে রাগ সংগীতের চর্চার পরিচয় সবচেয়ে প্রাচীন।

এ কথাও না বলে পারছি না, বহিরাগত হয়ে কোন নূতন জিনিস এলে আমরা নিজেদের সম্পদকেই শুধু নয় মানুষকেও ভূলে যাই, যতই কেননা মূল্য ও শক্তি উর্দ্ধে থাকুক। আমাদের বহির্মুখী মন যদি এত বেশী আচ্ছন্ন করে না রাখত তাহলে বিষ্ণুপুর ঘরাণার রাগ রূপের অকৃত্রিম সম্পদসমূহ এমনভাবে অবহেলিত ও অবজ্ঞাত হত না। এ যেন ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে করে ঠেলে দেওয়ার মত হয়েছে। ন্যায়-নীতি-বিজ্ঞান বর্জ্জিত রাগগুলো গেয়ে ও বাজিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা তাই হাঁ করে শুনছি এবং গ্রহণ করে নিচ্ছি। আর নিজের দেশের ঘরাণার জিনিষগুলো রক্ষা করলে এবং চর্চায় রাখলে যেন মহাপাতক হতে হবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১৫) পুরিয়া-কল্যাণ,—যে সুরকে 'পুরিয়া-কল্যাণ' বলা হয় তার পূর্বাঙ্গে পুরিয়ার রূপ ঠিকই আছে, কিন্তু উত্তরাঙ্গে কল্যাণ রাগের রূপ একেবারেই থাকে না, যা থাকে তা সম্পূর্ণ ইমন রাগের রূপ। তত্রাচ একে 'পুরিয়া-কল্যাণ' বলা হয় কি করে তা দেখে আশ্চর্য্য হই। শিল্পীরা নিজের পরিচয়ে এত অসাবধান কেন হবেন?

(১৬) 'বিলাসতোড়ী',—ভৈরবী রাগের প্রাচীন চারপদী ধ্রুপদ দু'চারটা জানা থাকলে বুঝে নিতে বিলম্ব হত না, এখন যাকে বিলাসতোড়ী (বিলাসখানি ভুল কথা) বলা হচ্ছে তা আসলে 'ভৈরবী'ই। আরোহণে মাঝে মাঝে মধ্যম স্বর বাদ দিয়ে সুরের যে এক রকম রূপ উৎপন্ন হয়; সে রকম সুর ভৈরবীর ধ্রুপদাঙ্গের গানেও আছে! এই রাগটিকে যদি ওই নামে রাখতে হয় তাহলে পুরো 'নি' এর ব্যবহার রেখে তার রূপকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করাই উচিত মনে করি॥

(১৭) 'নায়কীকানড়া,—বিলাসতোড়ী, দেশীতোড়ী, গুর্জরীতোড়ী, সুখরাইতোড়ী, ভট্টিহরি (ভাটিয়ারী) প্রভৃতি রাগের আসল রূপ যেমন মনগড়া হয়ে পাল্টে গেছে প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়াল না জানার জন্য, তেমনি আজকাল আবার 'নায়কী'তে 'ধা' সুর বাদ পড়ে গেছে। সুখরাই কানড়াতেই ওই সুর বাদ আছে। 'সুখরাই' না জানার জন্যই মনে হয় 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ে যাওয়ার মত হয়েছে। অবশ্য বহুর মধ্যেই এই উপমা দেওয়া যায়। 'কানড়া'র সঙ্গে সাহানারাগের রূপ পরিচয় জ্ঞাপক কয়েকটি বিশেষ স্বরাঙ্কন যুক্ত হয়ে নায়কীকানড়া নামে পরিচিত হয়েছে। সেই স্বরাঙ্কনের চিত্রগুলি এইরূপ—সা-রে-পা-মা-পা-গা-মা-রে-সা, রে-পা-মা-পা-গা, মা, রেনি্সা, মা-মা-পা-গা-মা, ইত্যাদি। 'গা' ও 'নি' কোমল॥

(১৮) শঙ্করারাগের উপর ঠাটের পরিচয়,—ঠাট সম্বন্ধে বিচার গত একটা কথা, কিন্তু তা দশঠাটের বিভ্রান্তিকর অবাস্তব ঠাটের কথা নয়, আসল ঠাট সম্বন্ধে স্বরগতির কথা। বক্রগতির রাগ ছাড়া অন্যান্য সরল গতির রাগের আরোহণ—অবরোহণে যখন ঠাট (যার প্রকৃত অর্থ কাঠামো) রচিত হবে, তখন তাকে কোন স্থানে বক্র করে দেখান কদাচ চলবে না। উদাহরণ দিয়ে শঙ্করারাগকে দেখাচ্ছি। এই রাগে পা-নি-সা, করে যাওয়ার যখন নিয়ম আছে এবং ধ্রুপদাদি গানেও পাওয়া যায় তখন পা-নি-ধা-নি-সা, এই রকম বক্র ভাবে আরোহণের উপর স্বরগতি নির্মিত হবে না। তা করতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গেলে নীতি নিয়ম বিরুদ্ধ হয়ে পড়বে। যদিও ওই পাঁচ সুরকে একত্রে প্রকাশের দ্বারা সুরের রূপ যেভাবে উৎপন্ন হয় তা রাগরূপের মুখাবয়বের মতই এবং নি-ধা-নি-সা, এই তিনস্বরে রাগরূপকে চিহ্নিতও করেছে, তত্রাচ স্বরাঙ্কন এই ভাবেই হবে, যথা—সা-গা-মা (কড়ি) পা-নি-সা-নি-ধা-পা-গা-রে-সা। ঠাট বলতে তার প্রকৃত যা অর্থ তা এই। এই অর্থের উপরই প্রত্যেক রাগকে পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করবে, অর্থাৎ আরোহণ—অবরোহণের স্বরগতি প্রত্যেকরই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে থাকবে স্বর সমূহের যাতায়াতের অধিকার নিয়ে। এই সব নীতি-নির্দ্ধারণের উপরই রাগবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই সব বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়।

অনেকে এখন এই রাগে কড়ি মাধ্যম ব্যবহার করেন না, কিন্তু আগের ধ্রুপদাদি সমস্ত শ্রেণীগত গানে এবং গৎএর ওপর আরোহণে ওই স্বর ব্যবহৃত হয়ে আছে। কড়ি মধ্যম বাদ দিলে জাতি নির্ণয় হবে না, চার স্বরে অর্থাৎ সা, গা, পা নি সা, এতে জাতি নির্ণয় হয় না। শঙ্করা ঔড়ব-ষাড়ব জাতির রাগ। অনেক ধ্রুপদে 'গা' সুরে একটু দাঁড়িয়ে পা কড়িমা-ধা-গা, এই রকম ভাবেও স্বরের ব্যবহার আছে। অনেকবারই বলেছি, রাগ সঙ্গীতের যে কোন শ্রেণীরগান বা বাদ্যযন্ত্র শিখতে হলে সংগে সংগে প্রত্যেকটি রাগের কয়েকটি করে প্রাচীন চারপদী ধ্রুপদ শেখবার আবশ্যক আছে—রাগের উপর প্রকৃত বোধ-জ্ঞান লাভেরজন্য। অবশ্য ধ্রুপদকে শুধু গলায় তুললেই যে জ্ঞান-বোধ এসে যাবে তা নয়; তার ভেতর রাগ রূপের স্বভাব ও উদ্দেশ্যগত সৃষ্টি তত্ত্ব কি আছে তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ধ্যান-চিন্তা রেখে তার রূপ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে হবে॥

(১৯) শুক্ল-বেলাবেলী,— যে সুরের নামে আছে শুক্ল-বেলাবেলী (সুখল্‌বেলাওল) তাতে বেলাওল রাগের নাম কি করে যুক্ত হল তার পরিচয় কিছু মাত্র উক্ত রাগের সুরে পাওয়া যায় না। আছে আলাইয়া ও তিলককামোদের মত সুর। তা ছাড়া রাগ মিশ্রনে ওর রূপ গঠিত যখন, তখন হয় স্বতন্ত্র নাম থাকতে হবে, নয়ত মিশ্রিত রাগগুলিকে একত্র করে উচ্চারিত হবে। ইচ্ছামত পরিবর্তন করতে গেলে শুভ্রআলাইয়াও কোন মতে হবে না। সুতরাং এর নাম শুধু শুক্লা রাখাই বিধেয়। নামের অর্থে পাওয়া যেতে পারে রাগ রূপ রচয়িতার স্ত্রী বা কন্যার নামে নামকরণ হয়েছিল। প্রত্যেক বিষয়ের উপর তার উপযুক্ত অর্থ,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যুক্তি ও সঙ্গত ব্যবস্থা থাকা চাই, যদি শাস্ত্রীয়সংগীত বলে পরিচয় দিতে হয়॥

(২০) 'তিলককামোদ',—রাগটিতে কামোদের কোন রূপাংশ নেই এবং তিলক বলে কোন রাগের নাম আছে কি না তা জানা যায় না। ওই নিয়মকে ধরে এর নাম থাকা উচিত 'তিলকসুন্দর'। তাহলে বুঝা যাবে এই রাগ রূপেকে যিনি তৈরি করেছেন তিনি নিজের নামেই হয়ত এর নামকরণ করেছিলেন॥

(২১) ভীম ও পলাশী নামে পৃথক ভাবে দুটি রাগের নাম ও সুর পাওয়া যায় না এবং নেই। অবশ্য এখন কেউ মনগড়া করে যদি বলেন আছে, সেকথা আলাদা। এই রাগটির সৃষ্টি তত্ত্ব হল, ঔড়ব জাতির আদি নাট রাগের আরোহণ এবং সিন্ধু রাগের অবরোহণের স্বর গ্রহণ করে এর রূপ তৈরি হয়েছে। নাটরাগের রূপ পরিচয়ে আছে আরোহণ-অবরোহণে রে, ধা, বর্জিত এবং কোমল 'গা' ও 'নি'। মনে হয় এর রচয়িতা নিজের নাম ভীম এবং দেশের নাম পলাশীকে যুক্ত করে ভীম পলশ্রী নাম দিয়েছিলেন॥

(২২) 'মারু বেহাগ',—মারুবেহাগ নামে রাগটির প্রচলন কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত খুবই বেড়ে গেছল। প্রায়ই শুনতে পেতাম, গাইবার সময় 'রসিয়াঁ' কথার বার বার পুনরাবৃত্তি। অবশ্য বিলম্বিত খেয়াল গানের মহড়ার একটা কথাকে নিয়েই অনেকে বারম্বার পুনরাবৃত্তির আতিশয্য ঘটিয়ে থাকেন, গানে আর কোন কথা আছে বলেই মনে হয় না। এঁদের গানে সুর বিস্তার ও তানাদিই একমাত্র স্থান পায়, গানের ভাব সম্পূর্ণভাবে মৃত হয়ে থাকে। মারু নামে যে এক প্রাচীন পরিচিতির উপর বিষ্ণুপুর ঘরাণায় অপরিসর রাগের গান আছে, তার সংগে ওই যুক্ত রাগটির মারু সুরের কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমানের এই সুরের যুগ্মরূপের কোন গান বা গৎ বিষ্ণুপুর ঘরাণায় আসেনি। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে মিশ্র সুরে গঠিত এর রূপটি বেশী দিনের নয়। আমার খুব বিশ্বাস, কোন খেয়াল গায়ক তাঁর দেশের নাম মারু থাকায় কিংবা তাঁর তনয়া বা স্ত্রীর ওই নাম থাকায় সেই নামকে ধরে বেহাগের সংগে ইমনের মত সুর মিশিয়ে নাম দেন 'মারু-বেহাগ'। কিন্তু আগেই জানিয়েছি মিশ্রণ রাগের নামে একটা রাগের নাম পরিচয় রেখে অন্যগুলোর নাম অনুল্লেখ রাখা চলে না, হয় নূতন নাম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিতে হবে নতুবা প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ রাখতে হবে। এই নীতি নিয়মকে অনুসরণ করে এই রাগটির নাম শুধু 'মারুময়ী' রাখাই সঙ্গত এবং শুনতেও ভাল লাগবে॥

(২৩) 'মিয়াঁমল্লার' রাগের মিয়াঁ নাম প্রসঙ্গে,—এই রাগটির সুর তানসেনের সৃষ্ট বলে পরিচিত। তানসেনের মিয়াঁ নাম সম্বন্ধে অনেকের যে জিজ্ঞাসা আছে, তা হল "তানসেন কি মিয়াঁ হয়েছিলেন? অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম তিনি গ্রহণ করেছিলেন কি? কি প্রমাণ আছে প্রকৃষ্টভাবে দলিলের মত? আমাদের ধারণা কোন মানুষ যখন ধর্মান্তরে যায়, তখন সেই ধর্মের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে এবং তার মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ে ও ধর্মজ্ঞান লাভে প্রকৃত সত্য আছে এই বিশ্বাসে বদ্ধমুল হয়েই যায়। আবার দেখা যায়, কোন কোন মানুষ নিতান্ত বাধ্য হয়ে বা কোন কারণের উপর প্রলুব্ধ হয়েও নিজ ধর্ম ত্যাগ করে। মোটের উপর যে কোন কারণেই হোক অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, ত্যাগ করা ধর্মের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজার্চনা প্রভৃতি প্রকাশ্যে আর দেখান চলে না—সেই সমাজ ধর্মের নিয়মে। সুতরাং এইখানেই বড় প্রশ্ন থাকছে, তানসেন যদি ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাঁর ত্যাগ করা ধর্মের দেব-দেবী, ঈশ্বর, অবতার প্রভৃতির গুণকীর্ত্তন, স্তুতি, প্রার্থনা, কামনা ও ভজনা প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে অত সংখ্যক গান রচনা করে প্রচার করলেন কি করে? এবং সম্রাট অকৃবরের দরবারে বিশিষ্ট মুসলমান ও ধর্মগুরুদের (মৌলভী) উপস্থিতিতে ওই সব গান দীর্ঘকাল ধরে গেয়ে চললেন কি করে? তখন এই ধর্মকে সংরক্ষণের উপর কঠোরতা খুবই ছিল। সম্রাট অকৃবর হিন্দু ধর্মে বিদ্বেষী ছিলেন না, সেইজন্য হিন্দু তানসেনের গাওয়া গানে অতীব মুগ্ধ থাকায় রচনার উপর আপত্তি জানান নি। কিন্তু তানসেন মুসলমান হয়ে যদি

জিজ্ঞাসা,—কারো কারো মন্তব্য এবং একজন গ্রন্থকার লিখেছেন মেঘ ও মল্লার একই। আপনার অভিমত কি? আমি বললাম—যারা বলেন এবং যিনি গ্রন্থে লিখেছেন তাঁদের এই দুটি রাগ সম্বন্ধে সত্যকারের পরিচয় নেই। এই দুইটি রাগের চিত্রিত রূপ নানান ভাবে প্রাচীন বহু ধ্রুপদ খেয়ালের মধ্যে আছে। শুনছি এখন আবার কেউ কেউ বলেন কল্যাণ এবং ইমন একই। এত অজ্ঞতা নিয়ে সঙ্গীতের চর্চা কি করে করা হয় তাই আশ্চর্য্য॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ওই সব গান রচনা করতেন ও গাইতেন তাহলে সম্রাট কি তা বরদাস্ত করতেন ? তা ছাড়া তানসেন মুসলমান হলে তখনকার সময়ে হিন্দুধর্মের উপর অনুরক্ত হয়ে ওই সব গান রচনা করে গাইতে যাবেনই বা কেন ?"

এবার আমার মন্তব্য,—তানসেন মুসলমান হয়েছিলেন এ কথা যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিতে হয়, তাহলে এই কথাই বলব, তিনি গান গাওয়ার সামর্থ্য একেবারে হারিয়ে বৃদ্ধ বয়সে যে কোন কারণেই হোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

পরিচয়ের মাধ্যমে জানা যায়, ধ্রুপদাদির গায়ন পদ্ধতির মত 'কওল-কলওয়ানা', 'গুলনক্স্' প্রভৃতি নাম দিয়ে যেসব গান তৈরি হয়েছিল আরবী ও উর্দ্দু ভাষা ইত্যাদিতে, সেই সব গানই বিশেষ করে চর্চায় রেখেছিলেন মুসলমান জাতির সঙ্গীতচর্চাকারীরা। কিন্তু হিন্দুতানসেনের ধ্রুপদ গানের গায়কীতে এবং তার রসলালিত্যে সকলের চিত্তকেই আকর্ষিত ও মুগ্ধ করে। তার অপুর্বতায় সম্রাট অক্‌বর তাঁকে 'তানসেন' উপাধি দিয়েছিলেন। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার, এবং সেন মানে শ্রেষ্ঠ। রাগবিস্তারে শ্রেষ্ঠ এই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ওই উপাধিতে। তানসেন রচিত দু-চারটি ধ্রুপদগানের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি—তিনি সত্যই হিন্দু ছিলেন কিনা তার প্রমাণে। ইমনকল্যাণ চৌতাল, 'তুঁহিভজ ভজরে মন বাসুদেব নারায়ণ......।' ওই রাগে ওই তালে,—'আনন্দী জগবন্দী ত্রিপুরা সুন্দরী মাতা.. ...।' ইমন-চৌতাল,—'ত্যেরোহি ধ্যান ধরত ব্রহ্মা বিষ্ণু......।' ভৈরব-চৌতাল,—'তুম হো গণপত দেব বুধদাতা.. ...।' আড়ানা-চৌতাল, হাঁ যদুনাথ জগতপিতা জগবন্দন...' মূলতান-চৌতাল, 'মেরে প্রভু রাজারাম সীতাপতি জগবন্দন......।' এরকম বহু গান আছে। গানের প্রত্যেকটি ভনিতায় তানসেন নামই আছে, তাতে মিয়াঁ কথা যুক্ত হয়ে নেই।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, মুসলমান গায়করা তো এইসব দেব-দেবী বিষয়ক গানই গেয়ে আসছেন, কৈ তাদের সমাজ তো তার জন্য কোন আপত্তি জানায় নি এবং মুসলমান হয়ে গাচ্ছেনই বা কেন ? এর প্রথম উত্তর মোঘল সম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে সমাজ ধর্মের কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ার দরুণ, তারপর সেই শিথিলতা ইংরেজ আমলে আরো বেশি করে এসে যাওয়ায় মুসলমান সমাজ মুসলমান গায়কদের উপর তেমন নজর রাখেন না। এঁদের মধ্যে যাঁরা খুব রক্ষণশীল তাঁরা হয়ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এঁদেরকে সমাজের অপাংক্তেয় মনে করেন। দ্বিতীয় উত্তরে এই কথাই বলতে হয়, এঁরা নাম ও জাতিউপাধিটাই রেখেছেন, আসলে হিন্দুই। জাতপরিচয়ের ছোঁয়াটা রেখে আলাবন্দখাঁ-এর ঘরাণা এক সন্তান ধ্রুপদ-গায়ক তাঁর জাতিত্বের আসল নাম ত্যাগ করে তানসেন পাণ্ডে উপাধি নিয়েছিলেন, মনে হয় পূর্বপুরুষের অর্থাৎ তানসেনের নাম ও জাতি উপাধিকে রক্ষা কবজের মত ধারণ করে। কিংবা নামের উপর চমক দেখানোর অভিপ্রায় নিয়েও হতে পারে। আমি এটাই জানতে চাই, যাঁরা শুধু জাতির পরিচয় ও নামটাকে বজায় রেখে হিন্দুর দেব দেবীর ভজনমুলক ওই সব গান গেয়ে আসছেন, আবার কোন কোন ব্যক্তি শ্যামাসংগীতাদি ভক্তিমূলক গান রচনা করে এবং তার ভাবে বিভোর হয়ে গিয়েছেন এবং গেয়ে থাকেন, কালীপূজা ও চণ্ডীপাঠ করার পরিচয়ও আছে, হিন্দুদের মত সন্তানদের নাম রেখেছেন সেই সব ব্যক্তিদের বিচারগত ভাবে আমরা কোন ধর্মের মানুষ বলব? যাঁদের অন্তরে হিন্দুত্বের এইরূপ পরিচয় থাকে তাঁদের স্বধর্মের পরিচয় আর থাকতে পারে কি? তা যদি থেকে যায় তাহলে জাতিভেদ উঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

তানসেনের বিষয় নিয়ে আরো কিছু পরিচয় দেবার মত আছে। তানসেনের দুই পুত্র ছিল, একজনের নাম রামবিলাস, অপরের নাম ছিল হরিবিলাস। এ কথা আমি ৺কাশীর বিখ্যাত মিশ্র ঘরাণা গুণীদের কাছেও শুনেছি। হরিবিলাস সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবার গায়ক ছিলেন। উক্ত সম্রাটের গুণকীর্ত্তন নিয়ে হরিবিলাসের রচিত একটি খাণ্ডারবাণীর ধ্রুপদ আমি পিতামহের কাছে শিখেছিলাম, গানটি বৃন্দাবনীসারঙ্গ-এর সুরে রচিত। তার বাণী যথা,—"ভকতবলী দিল্লীবার শোহ জাহাঙ্গীর বৈঠ তকতন্ বারকো পর, শুভদিন শুভ লগন কী .. ।" আভোগের কথায় আছে,—"তানসেন নন্দন হরিবিলাস গাওয়ে শুদ্ধ সারঙ্গ.... ।" (বৃন্দাবনী সারঙ্গই যে শুদ্ধ সারঙ্গ তার প্রমাণ এই গানেও আছে) এই গানের পরিচয়ে মস্তবড় প্রমাণ রয়েছে তানসেনের হিন্দু থাকার বিষয়ে। কারণ একমাত্র জন্মদাতা পিতাকেই তাঁর সন্তান পিতা বলে পরিচয় দেয়, তাই হরিবিলাস রেখেছেন তাঁর পরিচয়কে বড় করে দেখাবার জন্য 'তানসেন নন্দন' বলে।

তানসেন হিন্দু থাকা বিষয়ে একটি সমর্থন সূচক পরিচয় দেবার মত আছে। ৺কাশীর জমিদার শিবেন্দ্রনারায়ণ বসু ছিলেন বড়দরের বীণ বাদক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও ধ্রুপদ গায়ক। আমার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল, রাগাদি বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনাও করতেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, তানসেনকে কি সত্যই মুসলমান বলে মনে করেন? উত্তরে যে কথা বলেছিলেন তা আমার ধারণা মতই এবং তিনি একথাও বলেছিলেন—"এ বিষয় নিয়ে ভাতখণ্ডেজী ও আরো অনেকের সংগে আলোচনা হয়েছিল, তাঁরাও তানসেনের মুসলমান হওয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন না।"

এবার এ সম্বন্ধে একটা জোরাল প্রশ্ন আছে, তানসেন যদি মুসলমান না হবেন তা হলে যে সব গায়ক-বাদক তানসেন বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে আসছেন তাঁরা তা কি করে পারেন? এর সম্ভাব্য উত্তর আমার কাছে এই,—তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে কোন পুত্র বা তাঁদের কোন সন্তান মুসলমান রমণীকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর গর্ভজাত সন্তানরাই তানসেন বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে আসছেন।

---

(১) একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বললেন—আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় যা দেখেছি তাতে স্তরভেদে শ্রোতার কয়েকটি যেন শ্রেণীর মত হয়ে পড়েছে। অবশ্য প্রকৃত শ্রোতার কথা আলাদা। প্রকৃত শ্রোতা তাঁরাই যাঁরা সেই বিষয়ে অন্ততঃ সমপারদর্শী। এঁদের বাদ দিয়ে যে দুই তিন রকমের শ্রোতা আছে তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর হলেন, যাঁরা বহুকাল ধরে ভাল জিনিষ শুনে শুনে কানকে এবং মনকে উন্নত করেছেন। এঁদের মধ্যে থাকে কর্তব্যবোধ ও সংযম ইত্যাদি। এঁরা যখন সঙ্গীতজ্ঞদের বিষয় নিয়ে মন্তব্য ও পত্রিকাদিতে সমালোচনা করেন তখন তাঁরা নিজেদের সামর্থ্যের উপর সচেতন হয়েই। কারণ তাঁরা জানেন ক্রিয়াঙ্গের উপর প্রচুর অধিকার না থাকলে ক্রিয়াঙ্গবিদদের বিচার করার অধিকার নিজের দিকে তাকিয়ে রাখতে হয়। তাই এঁদের অভিমত সঙ্গত পথ ধরে চলে। যাদের দ্বিতীয় শ্রেণী বলে বেশ বুঝা যায় তাদের মধ্যে থাকে পক্ষপাতিত্বতাই বেশী, তাদের নিজেদের ক্রিয়াঙ্গের অধিকার কিছুই তেমন থাকে না, অথচ এরাই সংবাদ পত্রে লেখার সুযোগ পেয়ে পাকামির অন্ত রাখে না, এরা ঢাককে এবং তার আওয়াজকেই ধরে বুলি কপচায় অন্তঃসার শূন্য পরিপাটি ভাষায়। তৃতীয় শ্রেণীর শ্রোতারা হল, যারা পরের মুখে ঝাল খায়। এরাই নানান ভাবে সরগোল তুলবার জন্য কাঁধে ঢাক তুলে নেয়। এতে খুবই ক্ষতি হচ্ছে দেশের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রন্থে তানসেনের নাম রামতনু পাণ্ডে আছে। তাঁর শিক্ষাদি বিষয়ে কি পরিচয় আছে তা একদিন জানতে চেয়েছিলাম আমার শিক্ষাগুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। তিনি বলেছিলেন'—"আচার্য্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের মুখে শুনে আমার পিতা বলেছিলেন, রামতনু (তানসেন) গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতার সঙ্গে দিল্লী যান সঙ্গীত শিক্ষালাভের জন্য। তাঁর পিতা সবিশেষ সংবাদের মাধ্যমে পুত্রকে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়ে হরিদাসস্বামীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হন, এবং তাঁর কাছে পুত্রটিকে শিক্ষা দেবার জন্য একান্ত ভাবে অনুরোধ করেন। স্বামীজী ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সম্মতি দেন।

রামতনু বেশকিছুকাল ধরে শিক্ষা সাধনার পর গুরুর অনুমতি পেয়ে গোয়ালীয়রে এসে মহারাজা রাজারামকে গান শুনান। বলাই বাহুল্য তিনি যা শিখেছিলেন তা সবই ধ্রুপদসঙ্গীত। রাজারাম তাঁর গানে অতিশয় মুগ্ধ হয়ে সযত্নে নিজ দরবারের গায়ক করে নেন। একসময় রাজারামের গুণ বর্ণনের উপর শুদ্ধ বেলাবলী রাগে-চৌতাল তালে একটি গান রচনা করে উক্ত মহারাজাকে শুনান। সেই গানটি তুমিও জান। তারপর সম্রাট-অকবর রামতনুর গানের উপর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পেয়ে নিজ দরবারে নিয়ে আসেন। পরে একসময় তাঁকে তানসেন উপাধি দেন, সেই থেকে রামতনু তানসেন নামেই পরিচিত হন।

সঙ্গীত গুণীদেরই। যাদের কেষ্ট বিষ্টু ভেবে উল্লম্ফন দেওয়া হয়, সেই তারা আমাদের কতটুকু দিচ্ছে' এবং সেই দেওয়ায় আদর্শগত গ্রহণযোগ্য বস্তু আছে কিনা সে বিষয়রই প্রমাণ কোথায়? সঙ্গীতের পরিচয় কি কতক-গুলো জলদতান ও স্বরগ্রামের ব্যাভিচার? আশ্চর্য্য, মানুষ এরই উপরে এগন পাগল হয়ে দেশের গুণীদের কথা এবং যাদের ঐকান্তিক যত্ন, প্রচেষ্টা ও অবদানের জন্য আমাদের দেশে আজ এই যে শাস্ত্রীয় সংগীতের এত বিস্তৃতি ঘটেছে তাঁদের কথা মনে রাখার আবশ্যক করে না, পরের ঢাক বাজাতেই ভাল লাগে। খুবই দুঃখ যে, আমরা ক্রমশই যেন নেমে যাচ্ছি॥"

(২) গায়কদের আদর্শ পরিচয় কি? এর উত্তর, যিনি মুদ্রাদোষ শূন্য হয়ে বিশুদ্ধ ভাব ভাষা ও রাগরূপকে বিশুদ্ধ রেখে শুধুমাত্র নিজে তানপুরা বাজিয়ে গান করেন॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তারপর বললেন, পিতা এ কথাও শুনেছিলেন, রামতনু, হরিদাস স্বামীর কাছে মন্ত্র দীক্ষাও নিয়েছিলেন।" আমি গুরুকে জিজ্ঞাস করেছিলাম, আপনার গ্রন্থে এই সব সংবাদ দেননি কেন? উত্তরে বলেছিলেন, "তানসেনের মুসলমান নামের উপর এত বেশী প্রচার থেকে গেছে যে, আসল পরিচয় জানালে তাতে কোন উপকার হবে বলে মনে করিনি।"

জিজ্ঞাস করলাম—রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ সংবাদ কি করে পেলেন?

গুরু বললেন,—"তিনি বাবাকে বলেছিলেন, বিশেষভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে আগের গায়কদের মুখে শুনেছেন এবং গদাধর চক্রবর্ত্তীও এই কথা বলেছিলেন।" মনে মনে বললাম, যার মধ্যে সত্য আছে বলে মনে হবে তাকে প্রকাশ করার দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে মিথ্যার কবলে থেকে যেতে হয়। যাই হোক, তানসেন হিন্দু ছিলেন এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে আমি যে সব যুক্তি এবং প্রাপ্ত সংবাদাদি ও কিছু প্রমাণ উপস্থাপিত করলাম তা মেনে নেবার পক্ষে যথেষ্ট কি না, ভেবে দেখবার ভার বিজ্ঞব্যক্তিদের উপর রইল।

কেউ কেউ বলেন,—কবি, শিল্পী এঁরা সব জাতির উর্দ্ধে, অর্থাৎ এঁদের মন ভেদাভেদ শূন্য হয়ে থাকে। বলাই বাহুল্য, এই মনোভাব মানবতাপূর্ণ মানুষ মাত্রেরই থাকে। কবি, শিল্পীরা যদি জাতির উর্দ্ধে, তাহলে তাঁরা নিজেদের জাতি, উপাধি ও নাম স্বধর্মের উপর রাখেন কেন? যে কোন মানুষই হোন্ নিজ ধর্মের অনুগামী না হয়ে যদি অন্য ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ নিয়ে সেই ধর্মের চর্চা, উপাসনা ইত্যাদি করেন তাহলে তাঁর স্বধর্মের উপর নাম ও উপাধির সাইনবোর্ডটার কি কিছু মূল্য আছে?

এবার আমি সেনীমল্লারের মিয়াঁ নাম এবং তার রূপ পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলব। মিয়াঁ কথার কোন অর্থ হয় না। সেনী মল্লার বলে পরিচয় রাখাই বিচার সম্মত। মিয়াঁ কথা মুসলমান মাত্রকেই বলা চলে, পরিবর্ত্তে সেনী বললে তানসেকেই বুঝাবে। তা ছাড়া মিয়াঁ বলবই বা কেন? অনেকেই মনে করেন, কাঁনাড়া ও মল্লারের রূপকে ধরে সেনী (মিয়াঁ) মল্লার নাম হয়েছে। কিন্তু তা নয়, সাহানা ও মল্লারের সুর রূপকে ধরেই শালঙ্কশ্রেণীভুক্ত এই রাগটি রচিত হয়েছে। কাঁনড়ায় পুরো 'থা' দিয়ে তার সুরের রূপ সাহানা নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও, সাহানাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখবার জন্য যে কয়েকটি স্বররূপ আছে সেগুলি সেনী মল্লারে ব্যবহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়, যথা,—নি্ সা রে পা মা পা গা, মা পা নি ধা নি পা গা, মা রে সা, ইত্যাদি। (গা ও নি কোমল)। যাই হোক, মোটের উপর একটি রাগের সুরকে গ্রহণ করে যখন তার যথাযথ মল্লার নাম থেকেছে, তখন বিচার সম্মতভাবে অন্য সুরটির নামও থাকতে হবে। নচেৎ আগের প্রদত্ত পরিচয় মত এক নতুন নাম থাকবে। যদি বলা হয়, দুই 'নি'এর প্রয়োগ কৌশলটি বিশেষত্বে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষত্ব আছে তা সত্য কিন্তু তার জন্য আর একটির নাম কেন উড়ে যাবে? নূতন নাম যদি না দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে বলা উচিত তানসেনের শুধু দুই 'নি'এর প্রয়োগ কৌশলটিই নিজস্ব।

রাগরূপের সম্বন্ধে একথাই বলব, নিজের দ্বারা তৈরি রাগের রূপ এমন ভাবে রচিত হবে, যা অন্য রাগের সংগে কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবেই নিজস্ব সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হবে। এটা ওটা রাগের সুরকে টেনে খেয়ালী মনের তুলিতে' তার কোনটাকে উপরে আঁচড় দিয়ে এঁকে, কোনটাকে ওইরকমভাবে তুলির টানে নিম্নাঙ্গে বা মধ্যাঙ্গে স্থান দিয়ে নিজের সৃষ্ট রাগ বলে জাহির করা অনুচিত॥

এই প্রসঙ্গে অনেকের অবগতির জন্য জানাই, কানড়া রাগের আসল নাম ছিল 'কাহ্নার' শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতে এই সুরটি বেশী করে বাজত বলে গোপীরা বলত কাহ্নার অর্থাৎ কৃষ্ণের সুর। পরে উচ্চারণে এসে যায় কাহ্নাড় এবং অবশেষে কানাড়া নামে পরিচিত হয়। প্রাতঃকালের তোড়ী এবং রাত্রের কানাড়া এই দুটি রাগ সম্রাট অকবরের খুব প্রিয় ছিল। তিনি এই রাগ দুটির স্বররূপের গাম্ভীর্য ও বিরাটত্বে এবং প্রকাশনায় মুগ্ধ হয়ে বিশেষ সম্মান-সূচক দরবারী নাম যুক্ত করেছিলেন। তানসেনের বহু পূর্বের গায়কদের দ্বারা রচিত এই দুই রাগের বহু ধ্রুপদ আছে। যাঁরা মনে করেন এই দুটি রাগ তানসেনের রচিত, তাঁরা পরিচয় তত্ত্বে একেবারে উদাসীন। ওই দুই রাগেরও ধ্রুপদ গান বিষ্ণুপুর ঘরাণায় সংগৃহীত হয়েছিল পাঁচ'শ বছর আগের সময় থেকে। এখানের গুনী পরম্পরায় শুনা আছে, তোড়ী রাগের রচয়িতা সেই পরমপুরুষকে উৎসর্গ করে নাম দিয়েছিলেন 'তুঁহারি' পরে তোরি উচ্চারণ থেকে তোড়ী হয়ে গেছে। এই রাগটি শাস্ত্রীয় রাগরূপে গ্রন্থে ধার্য্য হয়ে আছে এবং এর সুরের ভাবকে কল্পণায় ধরে তার আকৃতি এবং শ্লোকও আছে। ইং ১৮।১০।৭৬ তারিখের রাত্রে তানসেন সম্বন্ধীয় যিনি আলোচনা করলেন কোলকাতার বেতারকেন্দ্র, তাতে দেখলাম অনেক বিষয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাস্তব পরিচয়ের খুবই অভাব। আলোচনাকারী তানসেন রচিত ভূপালী রাগের চৌতাল তালে "বাণী চারকে ব্যওহার." গানটির সুর যে ভাবে সুরকারের দেওয়া সুরের উপর বিষ্ণুপুরের গুণীদের এবং আগেকার বড় বড় গায়কদের দ্বারা প্রচারিত হয়ে আছে, সেই আদিসুরের সংগে কোন সম্পর্ক তিনি রাখতে পারলেন না। যে ভাবে আস্থায়ীটুকু গেয়ে দেখালেন তাতে মনে হল যেন আস্থায়ীর কথা কয়টি সংগ্রহ করে সেই সময় মন গড়া সুর লাগিয়ে শুনিয়ে দিলেন। বেতারে আলোচনা চক্র যে ভাবে চলছে তাতে ভুল ভ্রান্তির পরিচয় যথেষ্ট থাকে॥

(২৪) 'দেশীতোড়ী'র আদিসুর কি রকম ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন ধ্রুপদে। সেই সুরের পরিচয় বহুদিন আগে থাকতে কি করে লুপ্ত হয়ে গেল, সেটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা। ভৈরবীর 'রে' সুর বাদ দিয়ে তার রূপ গঠিত হয়েছিল। নূতন আকৃতিতে তার রূপ আমি প্রথম শুনেছিলাম ১৯১৯ সালে বেনারস কন্‌ফারেন্সে একজন বরোদা-ষ্টেটের বীণ বাদকের কাছে। সেই সুরের রূপই অঙ্কিত হতে দেখে এসেছি ফৈয়াজখাঁর পরও। এই রাগে তখন পর্য্যন্ত দুই ধৈবতের ব্যবহার ছিল, এখন দেখছি শুধু প্রধান ধৈবতেরই ব্যবহার। দুই ধৈবত ব্যবহার রাখার বিচারে ছিল, শুধু কোমল ধৈবত থাকলে জৌনপুরী রাগের প্রভাব খুব এসে পড়বে তাই ওই ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এখন শুধু প্রধান ধৈবতই ব্যবহার হওয়ায় মনে হচ্ছে যেন সিন্ধু রাগেরই দ্বিতীয় নাম। রে-গা-সা-রে-ণ্‌-সা, এই স্বরগুলির দ্বারা উৎপন্ন সুরকে বলা হয় 'দেশী' রাগের এটাই বিরাট পার্থক্য ও বৈশিষ্ট। এ ধারণা সিন্ধু রাগের চর্চা না রাখার জন্যই আসে। ওই রকম সুরের রূপ সিন্ধু রাগের রূপ পরিচয়ের মধ্যেও যথেষ্ট পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, ধরা, ছাড়ার উপর আসলের সংগে সম্পর্ক রাখার আবশ্যক এখন আর থাকছে না॥

(২৪) গুজ্জ'রী রাগ,—শাস্ত্রকাররা এই রাগটির মধ্যে কি এমন ঐশী শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন, তা ধারণায় আসে না। তাঁরা বলেছেন, রাজ আজ্ঞায় যদি সময়ের রাগ অসময়ে পরিবেশন করতে হয় তাহলে তার ত্রুটী থেকে মুক্ত হবার জন্য শেষে গুজ্জ'রী রাগ গেয়ে সমাপণ করতে হবে। যাইহোক এই রাগটির প্রধান পরিচয়ের উপর তার সুরের রূপ যে ভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে ধ্রুপদাদিগানের মধ্যে, তাতে পাওয়া যায় আশাবরী ও ভৈরবীর মিশ্রিত রূপ। এখন 'তোড়ী' রাগে কম ব্যবহারের উপর পঞ্চম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরটিকে সরিয়ে দিয়ে গুজ্জ'রী বলা হচ্ছে। 'পা' সুরকে সরিয়ে 'তোড়ী'র থেকে এই সুরের মূল্যমান কিছু বেড়েছে কি? কোন প্রতিষ্ঠাবান সঙ্গীতজ্ঞ আসল গুজ্জ'রী না জানার জন্য তোড়ী রূপটির আঙ্গুল কেটে এই কাণ্ড করেছেন॥

(২৫) 'শ্যাম কল্যাণ,'—যে সমস্ত শালঙ্ক ও সঙ্কীর্ণ জাতির রাগ আছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলিরই সৃষ্টি পরিচয় না জানার জন্যই মনে হয় অনেক সঙ্গীতজ্ঞ সঠিক ধারণা রাখতে পারেন নি। যেমন একটি উদাহরণ, 'শ্যাম-কল্যাণ'। শ্যাম রাগের সংগে কল্যাণ রাগের নাম যুক্ত করে রাগ পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। কারণ কেদার রাগের সংগে কল্যাণ রাগ মিশিয়ে তার সংবাদী স্বর ধৈবতকে বাদী স্বর করে সেই সুরের নাম দেওয়া হয়েছিল 'হাম্বীর'। আবার কেদার ও হাম্বীরকে মিশিয়ে হল 'শ্যাম'। সুতরাং শ্যামের সংগে আর কল্যাণ রাগের নাম যুক্ত করার কোনই অর্থ নেই। শ্যামের সঙ্গেই রাধা রূপী কল্যাণ থেকে গেছে॥

(২৬) সেদিন প্রবীন সঙ্গীতজ্ঞ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বললেন, "একজন গ্রন্থকার লিখেছেন, পিলু রাগে সমস্ত স্বরই ব্যবহার হয়।" বললাম, আজকাল গ্রন্থ লিখলেই হচ্ছে। যাইহোক, উক্ত গ্রন্থকারের এই রাগের উপর বিচার-বুদ্ধি বোধ হয় কোন কোন ঠুম্‌রী গানের পাঁচ মিশালী সুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং সেই তার মধ্যেই তিনি পিলুর রূপ পেয়েছেন। পিলু রাগটি অতিশয় কোমল মধুর এবং শুদ্ধ শ্রেণীভুক্ত। এই রাগটির আদি কাঠামোর সুর বঙ্গ দেশের দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত বন প্রান্তের স্নিগ্ধ ছায়ায় অবস্থিত এক গ্রামে নারীদের কণ্ঠে শুনেছিলাম। এই সুর তাদের বহুকালের স্বভাবগত হয়ে এসেছে। তাদের গানের ভাষায় এই ক'টি সুর প্রকাশিত হচ্ছিল,—যথা,—গা, রে সা নি্ ধ্া প্া, নি, সা, পা, পা, গা রে সা, পা, মা, গা রে সা। গান্ধার ও ধৈবত স্বর দুটিকে কোমল রূপে পাওয়া যাচ্ছিল। এই সুর থেকেই যে পিলু রাগের উৎপত্তি তাতে আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, তাদের জাত উপাধি ছিল পিলুহ। এই সুরকে পেয়ে যিনি রাগরূপে পরিণত করেছিলেন, তিনি ওদের জাত উপাধিকেই রাগের নামে রেখেছিলেন। এর সুর-মূর্ত্তির পূর্ণতায় তিনি স্বরগতিতে রেখেছিলেন, সা-রে-গা-মা-পা-নি-সা, সা-নি-ধা-পা-মা-গা-রে-সা। 'গা' ও 'ধা' কোমল। বাদী ও সম্বাদী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চম-ঋষভ। স্বরগতির এই নিয়মের উপর এবং বাদী-সম্বাদীর প্রাধান্য দিয়ে এই রাগকে বিশুদ্ধ রেখে বহু রকমে বিস্তৃত করা যায়। আমাদের ঘরাণায় এই রাগের প্রাচীন ধ্রুপদ এবং বাংলায় রচিত গান আছে। পিলু, বারঙা, পাহাড়ী ইত্যাদি ধরণের রাগগুলির প্রকৃত স্বরূপ পরিচয় এখনকার শিল্পীদের মধ্যে বেশীর ভাগই না জানার জন্য বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হয় না। তাছাড়া আরো অনেক রাগও। সুরট একটি বিরাট রাগ। এই রাগের আমাদের ঘরাণার ধ্রুপদাঙ্গের সাত-আটটি এবং বিলম্বিত ও দ্রুত তালের বারটি খেয়াল আমি মেজকাকার কাছে শিখেছিলাম। প্রাচীন ঘরাণা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য এই রাগের পরিচয় অন্যের কাছে আর পাওয়া যায় না। রাগটির শাস্ত্রীয় নাম 'সৌরঠী'। দেশ রাগ নামের উপর যে সুর প্রকাশিত হয়, তাতে সুরটের সুরই অত্যাধিক থাকে। দেশ রাগের কয়েকটি করে ধ্রুপদ, খেয়াল আছে সত্য কিন্তু রূপাকৃতি বিশেষ বিস্তার বহুল নয়। সুরটের সংগে পাহাড়ী রাগের মিশ্রণে দেশ রাগের উৎপত্তি। ঠাট এইরূপ,—সা-রে-মা-পা-নি-সা-নি (কোমল) ধা-পা 'ধা-মা-গা-রে-গা-সা।' নিম্নরেখ স্বরগুলি পাহাড়ীর॥

(২৭) পুরবী,—আগের লিখিত কতকগুলি রাগের স্বর পরিবর্ত্তনের মত পুরবী রাগেও এসেছে পুরো 'ধা' এর পরিবর্ত্তে কোমল 'ধা' এর ব্যবহার। এই ব্যবহার আগে প্রাচীন ঘরাণায় যে ছিল না, তা আমিও বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করেছি বাল্যজীবন হতে নানান ঘরাণা গুণীর সংস্পর্শে এসে। একথা আগেও জানিয়েছি যে, শত শত বৎসর ধরে প্রাচীন ঘরাণাদের রাগ-রূপের পরিচয় প্রত্যেকের সংগে সমন্বয় নীতি ধারার উপরই বিশেষ ভাবে ছিল। এখন কতকগুলি রাগে যে পরিবর্ত্তন এসেছে তাতে এই বিশ্বাসই জন্মে, আসল ঘরাণা বা আগের গুণী ধ্রুপদী বা বীণকারদের সংগে সংযোগের সম্ভাবনা না থাকার জন্যই কিংবা ইচ্ছাকৃত ভাবে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে, এবং বিশেষভাবে সংগ্রহ ও সন্ধানে না গিয়ে স্বরাদির পরিবর্ত্তন করা রাগগুলির চেহারাকেই নামকরা ব্যক্তিরা তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে ফেললেন। গ্রন্থকে অনুসরণ করে এবং পরিবর্ত্তনকারী গায়ক-বাদকদের ওই ভাবে রাগের পরিবেশন দেখে বিচার বিবেচনা করবার অবকাশ না রেখে তাকেই উৎফুল্ল চিত্তে এখানকার গায়ক-বাদকরাও গ্রহণ করে নিলেন। নিজেদের দেশের অতবড় প্রাচীন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘরাণায় রাগ রূপের পরিচয় কিভাবে আছে তা জানবার অবকাশ তাঁরা রাখলেন না, কিংবা অনিচ্ছা নিয়েই তাকে ত্যাগ করলেন। এই সংগে এ কথা না বলে পারছিনা। ভাতখণ্ডেজী তাঁর গ্রন্থে যে সব রাগের রূপ-পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ঘরাণার পরিচয় শূন্য হয়ে থাকা খেয়াল গায়কদের পরিবেশিত রাগ রূপকে ধরেই এবং তারই প্রচলন দেখে তার উপর প্রভাবান্বিত হয়ে। অথচ তিনি বলেছিলেন আমাদের সাক্ষাতে, রাগের বিশুদ্ধ পরিচয় আপনাদের ঘরাণায় ধ্রুপদাদি গানের মধ্যেই আছে। বিশিষ্ট সঙ্গীত বেত্তা রাজা ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীও এই কথা 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' নামক মাসিক পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিখেছিলেন। ভাতখণ্ডেজী পুরবীতে পুরো 'ধা' এর ব্যবহার স্বীকার করে এবং ধ্রুপদের মধ্যে থাকা বসন্তকে শুদ্ধ বসন্ত বলা সত্বেও পুরবীর পুরো 'ধা' কে বর্জন করলেন এবং পরজ বসন্তকেই বসন্তের স্থানে কেন রাখলেন তাই আশ্চর্য্য। তাঁর মত ব্যক্তির পক্ষে আসলের পরিচয় রাখাই সঙ্গত ছিল। তাহলে এরকম ভাবে আসল নষ্ট হত না। তাঁর এইরূপ নিরাকরণ সবল শক্তির পরিচয়কে বিঘ্নিত করেছে। আমি যখন লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সে গিয়েছিলাম তখন একদিন ভাতখণ্ডেজীর থাকার ঘরে তাঁর সংগে আলাদা ভাবে সাক্ষাৎ করে এইসব বিষয়ের আলোচনা করেছিলাম এবং যে সব রাগের অকৃত্রিম রূপের উপর হস্তক্ষেপ করে তাদের কৌলীণ্যকে নষ্ট করছে সেই সেই রাগগুলির দু'একটি করে প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়াল এবং বাজপেয়ী ও গুলামমহম্মদ খাঁ'র ঘরণার গৎ কণ্ঠে শুনিয়েছিলাম। তিনি শুনে খুব বিহ্বলিত হয়ে বলেছিলেন, 'আপনারা একে বিশেষভাবে সংরক্ষিত করে রাখুন, এই পরিচয়ই আসলের রূপে আদর্শ হয়ে থাকবে। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ শেখবার একান্ত বাসনা জানিয়েছিলেন, কিন্তু এই অভিমতের পরই অল্পদিনের মধ্যেই স্বর্গত হলেন॥

একজন নাম করা গায়ক নাকি বলছেন, "যে ভাবে যে রাগ গুলো এখন স্বরাদির পরিবর্ত্তন নিয়ে প্রচলিত হয়েছে তাকে ধরে না থাকলে কেউ শিখতে আসবে না।" একথা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। বড় বড় শিল্পীদের কাছে যারা শিখতে আসে তারা কি বর্ত্তমানের 'রামকেলীতে' কড়ি মধ্যম, 'আলাইয়া', 'ছায়ানট', 'কেদার', 'মেঘ' প্রভৃতি রাগের উপর কোমল নি দেওয়া শুধু শিখতে? না বড় শিল্পীর কাছে আসার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৌভাগ্য পেয়ে তাঁদের রাগ পরিবেশনের কৃতিত্ব কিছু সঞ্চয় করে নিজেকে ধন্য মনে করতে? শিল্পীরা যা শেখান তাই তারা প্রসন্ন চিত্তে শিখবে এই কথাই জানি। বড় বড় শিল্পীর কাছে তারা ইচ্ছে মত ফর্‌মাস্‌ করে শিখবে এ আবার কি?

(২৮) স্বরান্তরে স্বরকে ফেলা,—আজকাল দেখতে পাচ্ছি অনেকেই সঙ্গীত পরিবেশনের সময় যে কোন একটা স্বরকে ধরে উপর-নীচে ঠেলাঠেলি, সরাসরি এবং ধারে পাশের স্বরগুলোকে নিয়ে কাঁপান হচ্ছে। স্বরের উপর এরকম ব্যাভিচার অতি বড় মূর্খ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যে কোন একটা স্বরকে তার যথাস্থানে কণ্ঠে তুলে যদি সেই স্বর সামান্যতমও উপর-নীচে সরে যায়, তাহলে সে তখন যে স্থান ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সে কথা জানার মত মস্তিষ্কে কি কোন বস্তু নেই? স্বরগুলো কি গানের বা তেলানার অক্ষর? এ রকম বেআদপি কাজ বরদাস্ত করা বোধজ্ঞ শিল্পীদের কোন মতেই উচিত নয়। এই রকম সব অন্যায় কাণ্ড চলতে দিলে শাস্ত্রীয় সংগীতের পরিণাম কি হয়ে দাঁড়াবে? শিল্পীরা সাধারণের মধ্যে এসে গিয়ে কি মনে করে নিয়েছেন, কোন দিকে না তাকিয়ে ন্যায়-নীতি বিজ্ঞান ও আদর্শ রক্ষার আর প্রয়োজন নেই?

(২৯) আজকাল বিলম্বিত নাম দিয়ে খেয়াল ও গৎ এ বিলম্বিতের ভাব মূর্ত্তি বেশীক্ষণ বজায় থাকে না। বিলম্বিতের বস্তু পরিবেশনের জন্য রাগ রূপ অঙ্কনে ব্রতী হ'য়ে সেই ইচ্ছা বিলম্বিতের ক্রিয়া পদ্ধতির উপর বজায় না রাখলে তাকে সমগ্র ভাবে ওই পদ্ধতির গান বা গৎ কি করে বলা যায়? বিলম্বিতের ক্রিয়া দেখাবার মত অঙ্কন সামর্থ্যের অভাব থাকলে, তার মধ্যে দ্রুতের ক্রিয়া না দেখিয়ে দ্রুত তালের গান বা গৎ কে গ্রহণ করাই উচিত।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, ধ্রুপদের চৌতাল তালের ভাব মূর্ত্তি নষ্ট করে চৌদুন, ষঠ্‌দুন, ছন্দ ইত্যাদি করা হয় কেন? প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। চৌতাল তালের গানে যে রকম সাধন-ভজনের মত ভাববস্তু দিয়ে রচনা থাকে এবং তার সুরের বিন্যাসে নিবিড় ভাবে রাগ রূপের যে অপূর্ব পরিচয় থাকে, সেই প্রভাব সম্পন্ন গানে তার উপযোগী মতই নূতন ক্রিয়ার সমাবেশ রাখতে হয়। চঞ্চলতার প্রকাশ এই তালের এই গানে থাকা কোন মতেই উচিত নয়। ধ্রুপদাঙ্গের গানে ছন্দাদি ক্রিয়া দেখাবার জন্য অদারঙ্গ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাচীন যৎ তালকে গ্রহণ করে ধামার গানের সৃষ্টি করেন। খাণ্ডারবাণীর ধ্রুপদে অবশ্য আছে হলক্-গমক্ যুক্ত তান এবং তার গায়কী রীতিও দ্রুত লয়ের উপর॥

(৩৫) খেয়াল গানের সামগ্রিক পরিচয়,—খুব কম বয়স থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌছনর সময় পর্য্যন্ত দেখে এসেছি, বড় বড় খেয়াল গায়করা তেতাল ইত্যাদি তালের মধ্যে এবং দ্রুত লয়ের এই গানের উপর বিভিন্ন প্রকারের তান, বোলতান, ছন্দ, বাঁট, তেহাই ইত্যাদি প্রকাশের দ্বারা গানকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবার জন্য আগ্রহ রাখতেন। কিন্তু আজকাল দেখছি অধিকাংশ শিল্পীই গানের উপর কেবল সর্গম্ ও ঝটিকা তানই পরিবেশনে আগ্রহী হন। দুই গতির খেয়াল গানের পৃথকত্ব বজায় রেখে দম্, থম্, বিস্তার, ফেরতান, বোলতান, চক্রফেরতান, মূর্চ্ছনাতান, তরঙ্গতান, জোড়, হলক্, গমক, ঠোক, জম্‌জমা, মীড়, ছুট ও লোফাতান এবং ছন্দ, বাঁট, তেহাই,— এই সব ক্রিয়া প্রকরণ রাখতে পারলে এই গানের এই রূপ সামর্থ্যের পরিচয়ে শিল্পীর কৃতিত্ব কত উর্দ্ধে, তার প্রমাণ থাকে। আমরা বরাবর সাধনার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা রেখে এসেছি। এখন এই সবের অনেক অভাব থাকার জন্য এর পরিচয়ের আকৃতিকে অনেকখানি ছোট করে দিয়েছে॥

(৩৬) হিন্দোল রাগ প্রসঙ্গে,—সকালবেলায় এখন হিন্দোল রাগের পরিবেশন দেখে ভাবি, যাঁরা ওই রাগকে ওই সময়ে টেনে এনেছেন তাঁদের কি ওই রাগকে উপস্থাপিত করার জন্য যে নির্দিষ্ট সময় ধার্য্য হয়ে আছে,

---

জিজ্ঞাসা,—আপনার কণ্ঠ সংগীতের শ্রেণীগত গানে এবং যন্ত্র সংগীতে সমান অধিকার আছে। কিন্তু দেখি আপনি যেন কণ্ঠ সংগীতের সাধনাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন এবং পরিচয়ে ওকেই অগ্রাধিকার দিতে ভালবাসেন, কেন?

উত্তর,—কণ্ঠ হল ভগবৎ দত্ত, আর যন্ত্র হল মনুষ্যকৃত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে তফাৎ বহু। কামনার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে লাভ করার একান্ত বাসনা রাখলে কণ্ঠ সংগীতই নিয়ে যেতে পারে যথাস্থানে। কারণ, আগেই জানিয়েছি—কণ্ঠ ভগবৎ দত্ত। সুতরাং দু'টো বিষয়ে অধিকার থাকলেও প্রথমটির উপরইতো উদ্দেশ্য সাধনে বেশী করে নির্ভর হতে হবে। তাছাড়া যন্ত্রের চেয়ে কণ্ঠের প্রকাশ কৃতিত্ব বহু উর্দ্ধে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানবোধ নেই ? এই রাগের স্বরূপে যে পরিচয় আছে তাতে সময় সম্পর্ক বিষয়ে বোধজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই বলবেন, প্রাতঃকালের উপযোগী মোটেই নয়। তাই এর পরিবেশন সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল অধিক রাত্রে। ওই নির্দিষ্ট সময়েই বরাবর গায়ক-বাদকরা এই রাগ পরিবেশন করে এসেছেন, সময় নির্দেশকে একান্তভাবে উপযোগী বলে মনে করেই। তাছাড়া এই রাগটির ব্যবহার সম্বন্ধীয় এক পরিচয়মূলক সুন্দর সংবাদও আছে। তা হল, গোপীরা জোৎস্না রাত্রে কুঞ্জ মধ্যে কৃষ্ণ-রাধিকাকে দোলনায় বসিয়ে যে এক প্রকার সুরে বন্দনা গান গাইতেন, সেই সুরের তাঁরা নাম দিয়েছেন 'হিন্দোল'। দোলনারই অপর নাম হিন্দোল বা হিণ্ডোল। এই পরিচয় তথ্য আমরা শুনে এসেছি বিষ্ণুপুরের প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে।

আজকাল জাতি পরিচয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এই রাগে অনেকেই আরোহণে নিষাদের ব্যবহার রাখেন না। যে কোন দিকেই চার স্বরে জাতি নির্ণয় যে হয় না, এ কথাটা কি তাঁদের জানা নেই ?

(৩২) কম বয়স্ক দু'একজন শিল্পী আমার এই সব আলোচনা, প্রশ্ন ও মন্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে বলেছিলেন, রাগরূপের স্বর ইত্যাদির পরিবর্ত্তন হওয়ায় ক্ষতি কি ? রাগরূপকে চিরকাল একই ভাবে এঁকে যেতে হবে তার কোন মানে নেই। নূতন ভাবে সুর সৃষ্টির জন্য কোন কোন রাগে কোমল-যুক্ত করে, কড়িমধ্যম দিয়ে, কোন স্বর বর্জন ও যুক্তকরে যদি শুনতে ভাল লাগে তাহলে সেই ভাবে তাদের সুর নিশ্চয়ই অঙ্কিত হবে। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকার গোঁড়ামি নিয়ে কেন চলা হবে ? এর উত্তরে বলেছিলাম, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন ইচ্ছেমত সব ক্ষেত্রে এবং যে কোন বস্তুর উপর আনার আগে জ্ঞানগত বিচার বুদ্ধি দিয়ে দেখতে হয় তার আবশ্যক আছে, না খেয়াল খুশীর উপর হচ্ছে। ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বংশপরিচয় ও তার কৌলীণ্যকে যথাযথ ভাবে রক্ষা করে যাওয়ার যেমন দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে, তেমনি রাগরূপের শাশ্বত নীতি ধারার বাহকরূপে প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যে যে ভাবে তার অকৃত্রিম পরিচয় আছে, তাকে রক্ষা করে যাওয়াই প্রকৃত কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। ধ্রুপদ গান তৈরী করে ওই সব সত্য নির্ভর বস্তু রেখে গেছেন নায়কগোপাল থেকে পরের পর ভারত বিখ্যাত গায়করা, যথা,—বৈজু, তানসেন, শ্যামদাস,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হেমচাঁদ, সুরদাস, তানতরঙ্গ, মানতরঙ্গ, রামবিলাস, হরিবিলাস, যুগরাজদাস, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বেথিয়ারাজ নওলকিশোর, এবং আরো বহু গায়ক। এইসব বড় বড় গায়কদের রচিত চারপদী ধ্রুপদের উপর সবিশেষ পরিচয় থাকলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, রাগরূপের বিজ্ঞানভিত্তিক ও দর্শনের দ্বারা নির্দ্ধারিত স্বরূপকে বিশুদ্ধভাবে রেখে যাওয়ার উপর কর্ত্তব্য-বোধ শিথিল হত না। এই যে এই রকম অঘটন ঘটছে, তার কারণে বলা যায়, এখন অন্য কোন স্থানে প্রকৃত ঘরাণা ও গুণী বলতে তেমন আর নেই বলে খেয়াল খুশীর প্রাধান্য এসে গেছে। তবে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা সত্বেও যদি তাঁরা আসলকে নষ্ট করেন তাহলে সেই ঘরাণারই দুর্ভাগ্য এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক হয় সেই ঘরাণার একনিষ্ঠ সাধকদের। ভাল লাগার কথায় যে যুক্তি দেখান হচ্ছে সেই যুক্তিকে ধরে এরপর কেউ যদি কানাড়ায় কোমল 'রে' ও কড়ি 'মা' ব্যবহার করে বলেন, শুনতে খুব ভাল লাগছে তাই ব্যবহার করছি, তাহলে আপত্তির কোন কারণ নিশ্চয়ই থাকবে না? এই রকম মানসিক অসুস্থতার পরিচয় রাখলে তার পরিণাম কি হয়ে দাঁড়াবে? অবশ্য পরিণামের প্রস্তুতির অভাবও দেখছি না। গোঁড়ামী কথাটার উত্তরে বলেছিলাম, গোঁড়ামী যদি অন্ধের মত হয় তাহলে খুবই দোষের। কিন্তু দৃষ্টির স্বচ্ছতা নিয়ে যদি দেখা যায়, যাকে গোঁড়ামী বলা হচ্ছে, তার মধ্যে আছে প্রতীকরূপে আদর্শ সত্য, নির্ণীত স্বরূপের প্রকৃত সন্ধান এবং প্রমাণতত্ত্ব নির্ভরতা, তাহলে সেখানে গোঁড়ামীর অর্থে থাকবে ন্যায়, নীতি, ও ধর্ম সংরক্ষণের একান্ত অনুরাগ॥

আমার এই লেখাটি শুনে একজন বিশিষ্ট বিচারজ্ঞ বলেছিলেন, "রাগরূপ ইত্যাদির এই পরিবর্ত্তন যদি বিষ্ণুপুর ঘরাণার সঙ্গীতজ্ঞরা করতেন তাহলে আমাদের সঙ্গীতজ্ঞরা কেউই গ্রহণ করতেন না, আর বিষ্ণুপুর ঘরাণার মধ্যে রাগরূপ ইত্যাদির যে পরিচয় আছে সেগুলো যদি পশ্চিমের কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকত এবং আগত গায়ক-বাদকদের মাধ্যমে আসত, তাহলে তাকেই আমরা লুফে নিয়ে ধন্য মনে করতাম এবং বলতাম, এই এতেই উত্তম নীতি নিয়মযুক্ত পরিচয়' আছে, আগেরগুলো ধরে থাকলে গোঁড়া অন্ধ হয়ে থাকতে হত॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেতার প্রোগ্রামের ঘোষণা এবং ব্যবস্থা সম্পর্কিত
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১) রাগ রূপের উপর নীতি বিজ্ঞান যুক্ত হয়ে বিধিবদ্ধ ভাবে সৃষ্ট যে সঙ্গীত, তাকে সুবদ্ধ সংগীত নাম দিয়ে প্রত্যহ একবার করে বেতার প্রোগ্রামে প্রচারিত হয়। কিন্তু যে দিন ঘোষণা করা হয় সুবদ্ধ সংগীতের অনুষ্ঠানে অমুক ব্যক্তি তব্‌লা বাজিয়ে শুনাচ্ছেন, তখন ভাবি এঁরা কি এটুকুও জানেন না যে, তব্‌লা বাদ্য 'সুবদ্ধ সংগীত' নয়, শুধু তাল বাদ্য। সংগীতের যা অর্থ তাতে চর্মবাদ্য ও নৃত্য, সঙ্গীতের অর্থ বহ নয়। এজন্য নৃত্যবিদ্ ও চর্মবাদ্যবিদ্‌দের সঙ্গীতজ্ঞ নামের অর্থে তাঁদের স্থান থাকে না। রাগ সংগীতের মধ্যেই বিশেষ করে আছে সুর ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝবার উপায়। তাঁর মহিমময় সৃষ্টিকে অন্তরে ও বাহিরে নিরীক্ষণ করার শক্তিলাভ করা যায় রাগ সংগীতকে একান্ত ভাবে ধরে থেকেই। বিশ্বস্রষ্টা যেমন বিশ্বকে বৈচিত্র-পূর্ণ ও শোভনময় করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি রাগ সংগীতের অনন্তবিস্তারি বৈচিত্রময় ও বিস্ময়কর আনন্দদায়ক রূপেই সংগীতের মহিমময়রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। সুতরাং বিচারগত ভাবে চর্মবাদ্য ও নৃত্য, সঙ্গীত নামের যোগ্য নয়। এমন কী যে সমস্ত শ্রেণীগত গানে সুরের অনন্তবিস্তারি মহিমার স্বরূপপরিচয় রাখার মত উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয় না, শুধু তার কথার ভাব রক্ষার উপরই প্রাধান্য দিয়ে ভাবের মহিমাকে সংরক্ষিত করে রেখে যেতে হয়, সেই সব গানের রচয়িতারা শুধু গান নামেই পরিচয় রেখে এসেছেন এবং সেই ভাবে পরিচিতও হয়ে আছে। কেউ যদি বলেন, পাখোয়াজ ও তব্‌লা বাদ্যেও তো সুর আছে, তাহলে তাদের মধ্যে সঙ্গীতের পরিচয় থাকবে না কেন? এর উত্তর,—চর্মবাদ্যের মধ্যে এবং ঘণ্টা, ঘড়ি, শঙ্খ, শিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্যে যে এক একটি করে সুর উৎপন্ন হয় সে শুধু সুর বা ধ্বনি নামে পরিচিত হয়ে থাকে, তাকে সংগীত বলে না। সঙ্গীতের অর্থ আগেই জানিয়েছি॥

জিজ্ঞাসা,—'আইন-ই-অকবর্' গ্রন্থের লেখক আবুল ফজল তাঁর ওই গ্রন্থে লিখেছেন,—'ঢাড়ি জাতিদের গাওয়া গানকেই ধ্রুপদ গান নামে পরিচিত করেন সম্রাট আলাউদ্দীন খিলিজীর দরবার গায়ক নায়ক গোপাল, এবং ভুমু প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞ গুণীগণ।' এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? বললাম,—এ রকম উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর রচনা। এর বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ দিয়ে এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(২) বেশ কিছুদিন ধরে কতকগুলি বেতার শিল্পীর সংগীত পরিবেশনের সময় তাঁদের তাল বাদ্য ও যন্ত্র বাদ্যকারী সহযোগীদেরও নাম ঘোষণা করা হয়। এ সম্বন্ধে কোলকাতার কয়েকজন অভিজ্ঞ শ্রোতা এবং মফঃস্বল শহরের সঙ্গীত শিক্ষকেরা আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন,—'আমরা জেনেছি এই নিয়ম প্রবর্ত্তনের অর্থ হল, জনসাধারণের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, ওই শিল্পীরা হলেন 'এ' ক্লাশের, যাদের আমরা সর্ব্বোচ্চ টাকা দিই—এঁরা সেই বড়ঘরের সম্মানজনক শিল্পী। এই ব্যবস্থা অতিশয় নিন্দনীয়। আমরা যে যে শিল্পীর বিশেষ করে খেয়াল গান শুনে পরম পরিতোষ লাভ করে থাকি এবং জানতাম এঁরা উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত শিল্পী, তাহলে এই অভাবনীয় ব্যবস্থায় এখন বুঝতে হচ্ছে এঁরা 'এ' ক্লাশে স্থান পাননি, যথার্থ যোগ্যতা সম্পন্ন উচ্চস্তরের শিল্পী হয়েও। আর অধিকাংশ 'এ' ক্লাশের শিল্পীরা, যাঁদের আমরা নিম্নস্তরের শ্রেণীভুক্ত বলে জানতাম, তাঁরা তাহলে অযোগ্য হয়েও 'এ' ক্লাশের! বেতার কেন্দ্রের পরিচালকরা বিচার বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত হয়ে এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করে অন্তরালে লুকিয়ে থাকা 'এ' ক্লাশের মর্য্যাদাকে এবং তার শিল্পীদের পরিচয়কে নষ্টই করেছেন বলব। অর্থাৎ

নিন্দনীয় উক্তির প্রতিবাদ করেছি 'রাগ অভিজ্ঞান গ্রন্থে'। ঢাড়িদের পরিচয়টাও সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়েছে। গ্রন্থকার ঢাড়িদের বর্ণনা দিয়েছেন আমাদের দেশের হিজ্‌ড়েদের মত। ঢাড়িরা তা মোটেই নয়, রাজ দরবারে যারা রাজদের স্তুতি গান করত তাদের ঢাড়ি বলা হত, এই কথা বড় বড় গ্রন্থকারদের গ্রন্থেও লিখিত আছে।

আবুল ফজলের ওই রকম উক্তির মধ্যে যদি কিছু অর্থ থাকে, তা হল, হিন্দুর অত বড় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের শাশ্বত ধারার পরিচয়কে নসাৎ করার প্রচেষ্টায় মানসীক দুর্বলতা। উক্ত গ্রন্থটি তখনকার হিন্দুদের নজরে আসেনি বলেই মনে হয়। আর এলেই বা কি হবে! অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরা এখনই বা কি এমন মুখর হয়ে উঠি? সে চেতনা যদি থাকত তাহলে বাংলা ভাষায় খেয়াল ইত্যাদি গান বেতারে গাওয়া অতি সহজেই হত। 'আইন-ই-অকবরে' খেয়াল গানের সৃষ্টি সম্বন্ধেও ওই রকম আজগুবি-অবাস্তব কথা লেখা আছে।

সবচেয়ে বেশী অবাক লাগে, এখনকার কোন কোন গ্রন্থকার ওই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাঁদের গ্রন্থে। এর দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করেছেন—তাঁদের নিজস্ব বিচার বুদ্ধির দৈন্যতা কত বেশী॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই শিল্পীদের ঢাক বাজাতে গিয়ে 'উল্টো বুঝলি রাম' হয়ে গেছেন। যদি অধিকাংশের সঙ্গীত পরিবেশনে কোন মৌলকত্ব ও আকর্ষণ না থাকে, এমন কি প'ড়ে যাওয়া শিল্পীদেরও যদি প্রোগ্রাম থাকে তাহলে তাঁদের জন্য 'এ' ক্লাশ বলে ঢাক পেটাতে যাওয়ার ইচ্ছে খুবই হাস্যকর হয়েছে এবং তার সংগে খুব আবাকও লাগে, যাঁরা 'এ' ক্লাসের প্রকৃতযোগ্য শিল্পী তাঁদের সেখানে স্থান নেই দেখে। যাঁদের দ্বারা ক্লাস নির্বাচিত হয় তাঁরা কি ধবণের তা ভেবে আশ্চর্য্য হই। এ জন্য অনেকে বলেন, সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য বেতার কেন্দ্রের অপর নাম 'ভাগ্য গণনা কার্য্যালয়'।

শেষে এই কথাও কেউ কেউ বললেন,—বেতার কর্তৃপক্ষের নিকট সঙ্গীত বিষয়ক কোন ভুল ভ্রান্তির প্রমাণ ধরে লিখিতভাবে জানালে তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। আমি বললাম, এ অভিজ্ঞতা আমারও আছে, উদাহরণ একটা দিচ্ছি, ১৯৭৫ সালের ৩০শে মার্চ রাত ৯টায় প্রাচীন পরিচিতি অনুষ্ঠানের পরিবেশক জানালেন "আজ আমি তিনজন প্রাচীন শিল্পীর গাওয়া বাংলা খেয়াল, বাংলা টপ্পা এবং বাংলা ঠুম্‌রী আপনাদের শুনাচ্ছি রেকর্ডের মাধ্যমে। এই বলে কৃষ্ণচন্দ্র দে'র মালকোশ রাগের খেয়াল 'দীন তারিণী তারা' গানটি বাজিয়ে শুনালেন, তারপর দুটি স্ত্রীলোকের রেকর্ডে গাওয়া বাংলা টপ্পা ও ঠুম্‌রী শুনালেন। বাংলা ভাষার উপর এই নাম তিনটি উচ্চারিত হওয়ায় আমি খুব উৎফুল্ল হয়েছিলাম। ষ্টেশন ডিরেক্টরকে পত্রের দ্বারা এই বলে জানিয়েছিলাম,—এবার তাহলে বাংলা খেয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রী গাইবার আপত্তি থাকছে না? আমাকে উত্তরে আমতা আমতা করে জানালেন, না ওরকম ভাবে ঘোষণা হয়নি।" এতবড় সত্যকে যদি এই ভাবে চাপা দেওয়া হয় তাহলে আর কি বলবার আছে?

(৪) মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমতই ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের পর থেকে বেতার কেন্দ্রে শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রোগ্রাম 'ক' এর তরঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এই সংগীত 'খ' এর তরঙ্গে ও যুববাণীতে এবং কোন কোন সময় পূর্ব্বাঞ্চলীয় তরঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে। এর কারণে জানলাম নাকি এই সঙ্গীত সকলে বুঝে না, বিশেষ করে পল্লীর মানুষরা, যাদের সংখ্যা শতকরা আশী ভাগ। এই মন্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে ধরে নিতে হবে, তারা তাহলে আর সব উচ্চস্তরের বস্তুই বুঝে নিতে পারে, বহুল প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ইত্যাদিও। 'ক' তরঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে তাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্য কবিদের রচিত গান, নাম দিয়ে পল্লীগীতি, সিনেমা ও আধুনিকের অনেক নিম্নমানের রচিত গানও। কর্তৃপক্ষ হয়ত জানেন না, আমি জানি, অনেকদিন থেকেই প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত গ্রামে এবং দুর-দুরান্তরের মফঃস্বল সহরে শিক্ষানিকেতন গড়ে এবং গৃহে গিয়ে স্থানীয় শিক্ষকরা শিক্ষা দিয়ে থাকেন—খেয়াল, ভজন, রাগপ্রধান ইত্যাদি শিক্ষালব্ধ ও শ্রম সাধ্য গান। স্থানীয় শিক্ষকদের প্রচেষ্টায়ওউৎসাহও প্রদানের দ্বারা সেই সব স্থানের অধিবাসীদের এই সব গান ছেলে-মেয়েদের শেখানোর জন্য আগ্রহ এসে গেছে। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বেতার মাধ্যমে রাগসংগীত শোনার আগ্রহ যেমন বেড়েছিল, তেমনি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের রাগ রূপের উপর শিল্প রচনার পদ্ধতি জানার সহায়ক হয়ে তাদের অনেক উপকার হত। কিন্তু বর্ত্তমানের এই ব্যবস্থায় তা থেকে তারা বঞ্চিত হল, কারণ 'খ' এর তরঙ্গ বেশীদুর পরিষ্কার ভাবে অগ্রসর হয় না-শুনার উপযোগী হয়ে। সুতরাং রাগ সংগীতের মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যার চর্চাকারীদের সমূহ ক্ষতি হবে, তারা লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাবার তার তেমন প্রেরণা কিইবা পাবে? শুধু তাই নয় এই সব জায়গার শিক্ষক ও আগ্রহী শ্রোতাদেরও উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনার সহজ সুযোগ আর রইল না। যে সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচারের উপর জন জীবনে এনে দিতে পারে তার শ্রেষ্ঠত্বের উপর বিচারবোধ, তৈরী হয় উন্নত মন ও আসে সুস্থ চিন্তা, তাকে যথাস্থান থেকে অর্থাৎ 'ক' এর তরঙ্গ থেকে অন্য তরঙ্গে সরিয়ে দুরান্তরের ব্যক্তিদের সহজভাবে শুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হল কোন যুক্তিতে? তাছাড়া এই মহিমাময় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের এবং তার সাধকদের মর্য্যাদা ব্যাহত হয়ে পড়ার কথাও ভাবা হল না, এটা আরো বিস্ময়কর। এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের ব্যাপক প্রচারও প্রভাবের কল্যাণে তার নিনিড় স্পর্শ অন্তরে গভীর ভাবে প্রবেশ করে আমাদের দেশে সৃষ্টি করে এসেছে, তুলসী দাস, হরিদাস, কবির, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন, মহর্ষী দেবেন্দ্র নাথ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথী, রজনীকান্ত, রাম দত্ত, নীলকণ্ঠ, দ্বিজেন্দ্র, নজরুল, অতুল প্রসাদ প্রভৃতি মহান ব্যক্তিদের, এবং পল্লীর বহু কবি ও সুর সাধকদের। এই সব মহৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের বোধজ্ঞান থাকা উচিত, যে সংগীতের দেবতা এই বিশ্বকে সুরের রণনে ভরিয়ে রেখেছেন নানান রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে, সেই বৈচিত্র্যময় রাগ সংগীতেরই প্রচার বিশেষভাবে রাখতে পারলে, তবেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ওই সব মহান ব্যক্তিদের মত ব্যক্তি আবার জন্মগ্রহণ করবে। গ্রীস, রোম ও ইটালীর প্রাচীন মণীষীরাও বহুকাল আগে তাঁদের গ্রন্থে লিখে গেছেন,— বিশুদ্ধ সংগীতের প্রভাবই এনে দেয় রাষ্ট্রেরও জনগণের কল্যাণ॥

এই প্রসঙ্গে, এই ব্যবস্থার উপর আরো কতকগুলি যুক্তিবদ্ধ কথা জানানোর আবশ্যক আছে। যাদের জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন বিশেষভাবে বলে মনে হয়েছে, সেই কৃষি ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকেদের বেতারে গান-বাজনা ইত্যাদি শুনার সুযোগ কোথায়? রেডিও ক্রয় করবার সামর্থ্যই বা ক'জনের আছে? তাছাড়া আমি দেখেছি ও পরিচয় নিয়ে বুঝেছি; এদের শুনার আগ্রহও নেই তেমন। তারা বলে "সারাদিন পরিশ্রম করে, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে পড়ি, ও খেনখেনানি গান আমাদের ভাল লাগে না। তাছাড়া বেশীর ভাগ গানের কথা ও সুর আমরা কিছুই বুঝি না।" বাল্যকাল হতে অনেকগুলি পল্লীতে আমি গিয়ে দু'চার দিন করে প্রত্যেক জায়গায় থেকে দেখেছি, অধিকাংশ পল্লীবাসীদের মনকে রাগ সংগীতের সুর অধিকতর আনন্দ দিয়ে এসেছে। সেকালের পল্লী কবিদের মনোন্নত ভাবময় সহজ সরল ভাষায় রচিত গানের সুরে পেয়েছি পাহাড়ী, জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝিঁট, বিভাস, ভৈরবী, আশাবরী, পিলু, সিন্ধু, খাম্বাজ, ইমনও কল্যাণ প্রভৃতি রাগের সুর।

পল্লীর যাত্রার দলে জুড়িদের গানে শুনেছি ধ্রুপদাঙ্গের পদ্ধতি মূলক রাগ-তাল যুক্ত অভিনয় সম্বন্ধীয় গান এবং অভিনয়ের মধ্যে সময় সময় ছেলেদের গানে খেয়ালের মত তান যুক্ত সুরের সমাবেশ। রাগ সংগীতের পরিচয়, রামায়ণ গানে, এবং বিভিন্ন উৎসবাদিতে পাওয়া যেত। অবশ্য পল্লী মানুষের উচ্চাঙ্গ রাগ সংগীতের উপর এই যে বোধ শক্তি এসেছিল তার প্রধান উপাদানে ছিল সহজ-সরল মাতৃ ভাষার উপর আদর্শমূলক রচনায় আকর্ষণীয় ভাব। এই সব সুরের উপর ভাষার রচনায় আধ্যাত্মিক ও শিক্ষাপ্রদ ভাব থাকত বলে তার প্রভাবে তাদের মন সব দিক দিয়েই প্রশস্ত ও ধর্মময় করে রেখে ছিল। গ্রাম্য গীতকারদের মধ্যেও সেই পরিচয় ছিল। তখন পল্লীর পাড়ায় পাড়ায় সন্ধ্যার পর সেখানের কতকগুলি ব্যক্তির সমাগমে যে গানের চর্চা হত, তাকে ক্ষুদ্র পল্লীগীত বলে মনে হত না, তাদের মুল গায়ক রূপে যারা গাইত, সে গানে থাকত স্বভাব জাত প্রতিভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তান ও সুরের শাবলীল সীমিত বিস্তার এবং কোন কোন রাগের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপাংশ এবং তার সংগে ধ্রুপদাঙ্গের গানও। এই পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে সহজেই বুঝা যেত, সুরের উপর এরূপ প্রকাশনার সামর্থ্য রাগ সংগীতের ধারাবাহিক বিপুল চর্চার প্রভাব থেকেই এসেছে। এই প্রভাবের মধ্যে দিয়ে শুধু আমাদের দেশেই নয়,—সারা ভারতের বহু সাধক, কবি, সংগীত শক্তিতে সামর্থ্য লাভ করে শত শত আধ্যাত্মিক ও সাধন-ভজন উপযোগী গান রচনা করে সমগ্র জাতির অন্তরকে ধর্ম্মীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করার সহায়তা করে এসেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই রাগ সংগীতের উপর অধিকার পেয়েই শত শত গান রচনা করে জাতিকে দিয়েগেছেন প্রকৃত পথের নির্দেশ ও সুরের মহান সন্ধান। পল্লীতে সঙ্গীতের উপর রুচির এখন কি মর্ম্মান্তিক পরিণতি এসেছে তা বোধ হয় কর্তৃপক্ষের জানা নেই। সেখানের মানুষদের মধ্যে নানান শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষই গ্রাম্য গীতের ভাবময়রূপের প্রতি আর তেমন আকৃষ্ট নয়। হিন্দী সিনেমা দেখার উপর অত্যন্ত আগ্রহ এসে গেছে। বাংলা বই-এর ভাল বস্তু শুনতে আগ্রহী নয়, তারা বলে ও জোলো জিনিষ আমাদের ভাল লাগে না। বুঝলাম, বেল্লিকপানা যাতে বেশী থাকে তাতেই এখন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এই আকর্ষণের প্রভাবে তাদের মনের সেই সরলতা, পবিত্রতা, ধর্মে আস্থা প্রভৃতি পরম বস্তুগুলির অভাব দেখা দিয়েছে। সিনেমা চিত্রের হাব-ভাব রং ঢং নকল করে নিচ্ছে। শুধু কি তাই, সিনেমার অধিকাংশ ছবির মধ্যে যৌন কুৎসিত অভিনয় দেখে এবং নোংরা গান শুনে তাদের মন ক্রমশই নীচে নেমে যাচ্ছে। তার সংগে পেছন থেকে ঠেলা দিচ্ছে আধুনিক গানের মধ্যে অনেক গানের বেশ নিম্নস্তরের তরল রসাত্মক কথাও। শুধু পল্লীর মানুষদেরই নয়, সহরের মানুষদেরও, এমন কী ছেলে-মেয়েদেরও সিনেমার ওই সব চিত্র ও গান অসম্ভব ক্ষতি করছে তাদের চরিত্রের সব দিকে দিয়েই। আশ্চর্য্য লাগে, এই সব গানের অনুরোধ রক্ষা করে বেতারে প্রচারিত হয়। মনে হয় এঁরাও চান না মানুষের রুচি ও মন উন্নত হোক্,—তা নাহলে আকর্ষণীয় ভক্তিমূলক গানের পরিবেশনের সংগে সংগেই আধুনিক নিম্নমান গানের তরল রসাত্মক বস্তু পরিবেশিত হত না। যাইহোক্, মোটের উপর আমি এই কথাই বল্‌ব, শুধু পল্লীবাসীদের জন্যই নয়, সমগ্র জাতির কল্যাণ চাইতে হলে এই সব নোংরা জিনিসের প্রচার আইন করে বন্ধ করে দেওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তার সংগে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সিনেমার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নানান ধরণের লাস্যভাবযুক্ত ছবিতে ভর্ত্তি পত্রিকাগুলিকেও। মূল কথা হল, সমস্ত পরিবেশকে বিশুদ্ধ ও লালসা বর্জিত করে তুলতে না পারলে কোন মঙ্গলজনক প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হয় না,—হতে পারে না। মানুষকে বড় করে তুলতে হলে তাদের সামনে আদর্শ হয়ে থাকতে হবে, ধর্মের প্রতি আস্থা, প্রকৃত পথে অগ্রসর হবার জন্য বিলাস-আড়ম্বর ত্যাগ করে কঠোরঅধ্যবসায় ও সাধনার দ্বারা শ্রেষ্ঠ বস্তুকে পাবার জন্য একান্ত কামনা। গান বা সঙ্গীত সম্বন্ধেও সেই কথা, যে গানে ও সঙ্গীতে আছে প্রকৃত দর্শন, তপস্যালব্ধ বস্তু ও কামনার সম্পদ, একমাত্র এই রকম সঙ্গীতই সমগ্র জাতিকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারবে॥

জিজ্ঞাসা,—রাগরূপের অকৃত্রিম পরিচয়ে আপনি খেয়াল গানের স্রষ্টা সদারঙ্গের নামও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আপনাদের ঘরাণায় তাঁর গানের রাগরূপের সংগে সম্পর্ক ছাড়া অনেক গানে দেখছি এখন সদারঙ্গের নাম আছে এবং সেই সব গান এখন বেশ শুনতে পাওয়া যায়। সদারঙ্গের মত গায়কের রচিত গানে রাগরূপের মত পার্থক্য কি করে থাকতে পারে? তাছাড়া কোন রাগের রূপ দু'রকম ভাবে অঙ্কন হওয়ার সম্ভাবনা থাকতেই পারে না, থাকলে তখনকার রচিত ধ্রুপদে ও থাকত।' এর উত্তরে আমি বললাম,—খেয়াল গান স্রষ্টা সদারঙ্গ ছিলেন ধ্রুপদী ঘরাণার ধ্রুপদ গায়ক। তিনি খেয়াল গান এবং তাঁর ভ্রাতা অদারঙ্গ ধামার গানের সৃষ্টি করেন। সুতরাং যে সব ধ্রুপদ গান বিষ্ণুপুর ঘরাণায় এসেছে—সেই প্রাচীন ধারার রাগরূপকে গ্রহণ করেই যে তাঁরাও দুই শ্রেণীর গান রচনা করেছিলেন তার প্রমাণ যথেষ্ট। প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে যদি রাগরূপের পরিচয় অভিন্ন থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেই পরিচয়ই আসল। যে কোন ব্যক্তি গান রচনা করে সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, তানসেন ইত্যাদি বড় বড় গায়কদের নাম নির্ভয়ে লাগিয়ে দিতে পারেন। তার কারণ, কোন গায়ক বা বাদকেরই রচিত বস্তুর সংখ্যাতত্ত্বের প্রমাণ স্বরূপ কোন দলিল নেই। খুশী মত সংখ্যা যা বলা হয় তা কেবল মৌখিক ভাবেই। মনে করা যাক, সদারঙ্গ হাজারটি খেয়াল রচনা করেছিলেন, কিন্তু আমরা কি গানের কথা ও সুরের দ্বারা তা প্রমাণ করে দেখাতে পারব? সত্যই হোক বা মিথ্যা নাম দিয়েই হোক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেতারকেন্দ্রে শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশন এবং রাগরূপের পরিচয় সম্বন্ধে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১) কোন এক গায়কের গাইবার আগে ঘোষণা করা হল, ইনি কোমল আশাবরী রাগে খেয়াল শুনাচ্ছেন। এর অর্থ এই হয়, যেন এমন কোন আশাবরী রাগ আছে যাতে কোমল স্বর নেই। আশাবরী রাগ প্রকৃতপক্ষে একটাই, তাতে চারটেই কোমল থাকে। এবং স্বরের এই রকম প্রয়োগের উপরই প্রায় সকলে এই রাগের রূপ অঙ্কন করেন। সমস্ত প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালে চারটি কোমলই যুক্ত হয়ে আছে। কে একজন গ্রন্থে লিখেছেন পুরো 'রে' দিয়ে আশাবরীর কথা, এবং কোন গায়ক বা বাদক হয়ত পুরো 'রে' ব্যবহার করেন—এই রাগের আসল রূপের পরিচয় না জেনে, তাই বলে সেই পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে আসল আশাবরীকে বলতে

সদারঙ্গের রচিত বলে কতগুলো গান আমরা জানি? আমি বেশ ভাল ভাবেই অবগত আছি, কেউ কেউ আসালের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, কেউ বা সেই সম্পর্কের সন্ধান না পেয়ে বা না রেখে কৃত্রিমতার উপর গান রচনা করে ওই সব বড় বড় গায়কদের নাম জুড়ে দিয়েছেন ও দেন। এই উদ্দেশ্যের মূলে থাকে পুঁজির সংখ্যা বাড়ান এবং নিজের রচনার মানকে ঊর্দ্ধে তুলার বাসনা। আবার কেউ কেউ নিজের নাম বা ওই রকম ভাবে নামও রাখেন নি, যার জন্য আমাদের কাছে রচয়িতার নাম অজ্ঞাতই থেকে গেছে। অথচ নাম বিহীন গানের সংখ্যাই বেশী এবং সেই সব গানের সুরবিন্যাস এবং বন্দেজ ও অতি সুন্দর। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা, আমাদের জানা এবং বাল্যকাল থেকে বিভিন্ন স্থানের গুণীদের কাছে শুনা, সদারঙ্গের গানগুলোর সুরও কথার রচনা বিন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায় অনেকখানি ধ্রুপদ গানের ভাবধারার রীতির মত। কিন্তু এখন নাম যুক্ত হয়ে তাঁর গানগুলোর মধ্যে অনেক গানে সেই ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং তার সঙ্গে গমকী তান যুক্ত হয়ে না থাকা এবং লঘু রচনা থাকায়। সুতরাং এই সব গান তাঁর রচিত যে নয় তাতে সন্দেহ আসে না। অধিকাংশ প্রাচীন বিলম্বিত খেয়াল গানের মধ্যে গমকী তান আছে, এটা প্রাচীন পরিচিতির নিদর্শন ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হবে কোমল আশাবরী? বরং যদি কেউ খেয়াল খুশী মত পুরো 'রে' দিয়ে এই সুরের রূপ আঁকেন তখনই বলা উচিত হবে ইনি পুরো 'রে' দিয়ে আশাবরী শুনাচ্ছেন। এবার হয়ত কেউ যদি কানাড়ায় পুরো 'গা' ব্যবহার করেন, তাহলে ঘোষক মহাশয়েরা আসল কানড়ার সময় বলবেন, ইনি কোমল কানাড়া শুনাচ্ছেন। যার যা সত্যকারের পরিচয় তার নামের ঘোষণা যথা নামেই থাকবে। এই সব বিষয়ে ঘোষকদের বোধশক্তি থাকা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া এ রকম দুর্বল কথা শিল্পীদেরও মেনে নেওয়া উচিত নয়॥

(২) ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসের প্রাতঃকালের প্রোগ্রামে একজন খেয়াল গাইলেন 'প্রভাতী ভৈরব' নাম দিয়ে। তাতে ছিল না প্রভাত-কালীন পরিবেশের সংগে কোন ভাবসম্পর্ক। সুরটা আগাগোড়াই অদ্ভুত লাগল। এইরকম নাম উচ্চারণে থাকে যেন অন্য সময়ের জন্য অন্য কোন ভৈরব রাগ আছে। এই নামের উপর স্বভাবতই প্রশ্ন আসবে, সেই গায়ক কি তাঁর নিজের ওই সুরটিকেই প্রভাতী ভৈরব বলে জানেন? তাহলে প্রভাতী নামটা কিজন্য? প্রাতঃকালের সময়োপযোগী হয়ে যে ভৈরব রাগ আছে, এবং যার স্তোত্রে আছে মহাদেবের রূপবর্ণন, সেই আসল ভৈরবকে যদি না জানেন, তাহলে তিনি কোন্ মুলুকের লোক এবং শিখেছিলেন কিরকম ব্যক্তির কাছে? শিল্পীরা অবান্তর ও অবাস্তব কথা বলবে, আর সেটাই ঘোষিত হবে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ প্রচার কেন্দ্রে? রাগসংগীতের উপর এরকম অপপ্রচার বেতার কেন্দ্রে চলতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। এতে ক্ষতি হবে বেশী করে শিক্ষার্থীদেরই॥

(৩) ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন বেলা ১টার সময় সম্প্রতি-কালের একজন নাম করা মুষলমান খেয়াল গায়ক ভৈরব রাগে খেয়াল গাইলেন। ইনি মুদারার কোমল 'রে' কে প্রচণ্ডভাবে ধরে নীচের দু'একটি স্বর উচ্চারণের পর 'রে' সুরে দম্ রেখে রেখে আমিরখাঁনী কায়দায় পুণরা-বৃত্তির আতিশয্য যখন চালাচ্ছিলেন, তখন ভৈরব রাগের ভাব মূর্ত্তির কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল এ যেন কোন মূর্ত্তির মুণ্ডহীন রূপাঙ্কন। প্রথম অঙ্কনেই রাগরূপের মূর্ত্তিকে পরিস্ফুট করার নীতি নিয়ম না জানা সঙ্গীতজ্ঞ নামের উপযোগী নয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আগেই জানিয়েছি, ওই রাগের মুখাবয়ব সদৃশ মধ্যমস্বর বাদী। মুহুর্মুহুঃ 'রে' স্বরকে প্রকাশ করা, তাতে দম্ রাখা এবং গানে সম্ ফেলা মোটেই চলে না, তাতে রাগ ভ্রষ্ট হয়। আমি যা এখন দেখছি_তাতে মনে হচ্ছে, অনেক শিল্পীই যেন মনে করে নিয়েছেন, শাস্ত্রীয় সংগীত নামটা শুধু নামের জন্যই, আসলে খুসীমত শিল্প রচনাই বড়। অবস্থার এই রকম পরিণতির পরিচয় আরো কয়েকটা তুলে ধরছি।

(২) ওই মাসের শেষে বেলা ১টার সময় একজন নাম করা ব্যক্তি শরোদ বাজালেন 'সিন্ধু-ভৈরবী' নাম দিয়ে, কিন্তু তাতে সিন্ধু রাগের কোন সন্ধানই খুঁজে পাওয়া গেল না। আজকালকার নিয়মে সংখ্যা গরিষ্ঠ শিল্পীদের কাছে একটা বা দুটো রাগের সংগে কোন একটা নাম জুড়ে দিয়ে কিংবা কিম্ভুত কিমাকার হলেও নূতন একটা কিছু করে না শুনালে নিজের বাহাদুরির ওজন বাড়বে না এই ভেবেই মনে হয় তিনি সিন্ধু রাগকে শুধু নামে মাত্র রেখে তার সুর বাতিল করে ভৈরবীই বাজিয়ে গেলেন। এক এক সময় যখন কড়ি মধ্যমের উপর জোরাল মীড়ের ধাক্কা দিচ্ছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন ভৈরবী বেচারির বুকে কিল্ পড়ছে। এই ভদ্র লোকই ৬।১।৭৭ তারিখের রাত্রে 'সম্পূর্ণ কানড়া' নাম দিয়ে যে বস্তুটি বাজিয়ে শুনালেন তা যেমন অদ্ভুত ও হাস্যকর, তেমনি নাম করণও। বোধ হয় মাথার ঠিক নেই॥

জিজ্ঞাসা,—সংগীতের ইতিহাস সম্বন্ধীয় এবং রাগরূপ ও সঙ্গীতজ্ঞদের পরিচয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যাঁরা লেখা-লেখি করেন এবং ক্ষেত্রস্থলে বক্তৃতা দেন, তাঁরা তৎপূর্বে আপনার সংগে পরামর্শ করার আবশ্যক রাখেন কি?

তাঁর এই কথা শুনে হেসে বললাম,—আপনি বেশ একথা বললেন! সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে পরামর্শ বলে কোন বস্তু আছে নাকি? যদি থাকেও, তাহলে তাঁরা আমার মত ব্যক্তির কাছে কেন আসবেন নিজেদের সম্মান খুইয়ে ছোট হতে?

তিনি বললেন, তা বটে—আমরা যখন 'সবাই রাজা' তখন এ কথা উত্থাপন অন্যায় হয়েছে। তাছাড়া আপনার পরিচয়ের উপর অপরাধ দুটো আছে, একটা হল আপনি বাঙ্গালী, দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের বিষ্ণুপুর ঘরাণার মানুষ।

বললাম,—সব জেনে শুনেও ওই কথা তুলে এত ভুল করলেন!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৫) ওই মাসেই ঠিক ওই সময়ে আর একদিন একজন প্রবীন নাম করা মুষলমান গায়ক 'গৌড় সারঙ্গ' রাগে বিলম্বিত খেয়াল যখন গাইতে লাগলেন তখন সুরুতেই বিলম্বিতের নিয়ম লঙ্ঘন করে এমন কাণ্ড আরম্ভ করলেন, যেন মনে হল দুপুরের তাপদগ্ধ ধরিত্রীর উপর গৌড়সারঙ্গকে পাকড়াও করে তার দেহের উপর সর্ গম্ ও তানের এক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে সুরকে নিয়ে কাল বৈশাখীর মত ঝড় ও শীলা বৃষ্টি বর্ষিয়ে দিলেন। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলাম, এতদিনের নাম করা প্রবীণ গায়ক তাঁর খান্দানী গায়কী নীতি ধারাকে বিসর্জন দিয়ে এমনভাবে পরিবেশনে মত্ত হলেন কেন? এই ভীষণ কাণ্ড ছাড়াও ওই রাগের মধ্যে এক এক জায়গায় পরিষ্কার ভাবে বেহাগের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ছিল, যা একেবারেই ওই রাগ ধর্ম্মী নয়। গৌড় সারঙ্গ, ছায়ানট, কামোদ, এই রকম বক্রগতির রাগগুলির প্রকাশের সময় দেখা যায় অনেকেই সেগুলির রূপ রচনার সময় বেসামাল হয়ে পড়েন। এ রকম ভুল হয় না, যদি চারপদী প্রাচীন ধ্রুপদ গান ভাল ভাবে জানা থাকে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সাধনায় ব্রতী হয়ে রাগবোধ ও বিচার বোধের উপর সচেতন দৃষ্টি এবং যত্ন না রাখলে শিল্পী নামটিই শুধু থাকবে; তার সংগে আসল নামটি থাকা যে সবচেয়ে বড় তা থাকবে না। কিন্তু দেখেছি প্রকৃত সেই গুণাবলী থাকার জন্য অধিকাংশ শিল্পীই সচেষ্ট নন। অথচ ওই বস্তুর একান্ত অভাব থাকা সত্বেও অনেকে পণ্ডিত, ওস্তাদ এইসব বড় বড় উপাধির সম্বোধন ও ব্যবহার স্বচ্ছন্দে রেখে চলেছেন। এঁদের ভাববার প্রয়োজন হয় না, শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের উপর কত গভীর পাণ্ডিত্য ও গুণাবলী থাকলে তবেই ওই সব উপাধি গ্রহণ করা চলে। আচার্য্য উপাধি তো এখন সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ের মত অলিতে-গলিতে ছড়াছড়ি। তার উপর আবার এক বিভৎস ব্যাপার আছে, ডি, লিট, পাওয়ার মত উপযুক্ত কারণ না থাকলেও ওই উপাধি দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা যাদেরকে ওস্তাদ, পণ্ডিত বলে সম্বোধন রাখেন তাঁরা নির্বোধ বলেই এইরূপ বলে থাকেন, তা নাহলে শুধু সমস্তরেই নয়, আরো উর্দ্ধে যাঁদের স্থান আছে সেইসব গুণী ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপাধি সম্বোধনে বিরত থাকার মত ঘটে বুদ্ধি থাকত। বেতার কেন্দ্রেও সমস্ত শিল্পীর জন্য সমান ব্যবহার রাখা অতীব কর্ত্তব্য। ব্যক্তি বিশেষের উপর উপাধির সম্বোধন রাখা ভদ্রতা বিরুদ্ধ॥

(৬) ১৫.৫.৭৬ তারিখের শনিবার রাত্রে দিল্লীর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খেয়াল গাইলেন, তিনি যখন এক একটা স্বরকে ধরে এদিক ওদিক টানাটানি ও ঘোরাফেরা করছিলেন তখন মনে হচ্ছিল কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছুই নেই। স্বরকে ধরে তার উপর এত বেশী টানা হেঁচড়ার বলাৎকার আমি এখন পর্য্যন্ত কারো কাছে শুনিনি। এরকম বুদ্ধি না হলে কি নামের আগে পণ্ডিত উপাধি থাকে!

(৭) ১৬।৫।৭৬ তারিখের রাত দশটায় কোলকাতা কেন্দ্রে যিনি ধ্রুপদের প্রোগ্রামের উপর জয়জয়ন্তীর সুর পরিবেশন করলেন, তাতে তিনি যেভাবে শুদ্ধ গান্ধারের উপর বারম্বার দম্ রাখছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল রাগরূপের সঠিক পরিচয়ের উপর লক্ষ্য রাখার একান্ত অভাব আছে। অথচ তিনি একজন নাম করা বয়স্ক ধ্রুপদী এবং 'এ' ক্লাশের শিল্পী।

জয়জয়ন্তীতে যেভাবে স্বরের আরোহণ অবরোহণ আছে, তা এইরূপ,—সা-রে-মা-পা-নি-র্সা, নি (কোমল)-ধা-পা-মা-গা-রে-গা (কোমল)-রে-সা। স্বর নির্মাণের এই নিয়মের উপরই সমস্ত প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালে সুর সংযোজিত হয়ে আছে। কয়েক বছর আগে থেকে খেয়াল গানে এর রূপের উপর দু'তিনটি ছায়ানটের রূপাংশ এসে গেছে। যেমন—রে-গা-মা-পা-ধা-পা-মা-গা-রে, সা-ধ্-রে, গা-মা-রে-গা-মা-পা, এই রকম। কিন্তু 'গা' সুরে দাঁড়ান কোনমতেই চলে না, তাহলে রাগভ্রষ্ট হয়ে যাবেই। একজন মুসলমান যন্ত্রী বলেছিলেন, এই রাগে কোমল 'গা' ব্যবহার হবে না। কথাটা শুনে মনে হয়েছিল তাঁরও বোধ হয় মনে ও শরীরে কোমল বলে কিছু নেই।

(৮) একজন বিশিষ্ট শ্রোতা সেদিন বললেন,—ইং ৩০।৭।৭৬ তারিখের রাত দশটায় মধুমল্লার নাম দিয়ে একজন 'এ' ক্লাশের শিল্পী খেয়াল গাইলেন। দেশের শিল্পী, তাই রাগরূপের পরিবেশন পদ্ধতি ও যোগ্যতার কথা চেপে যাচ্ছি। কিন্তু রাগটির নামের প্রথম উচ্চারণের মধু কথাটি শুধু নামেই রইল, তার সুরে মধু বস্তুর সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না, বরং মধু মক্ষিকারই আক্রমণ ছিল। এ রকম এক মনগড়া বেখাপ্পা অদ্ভুত সুরে গান শুনানর মধ্যেই কি এঁরা বড়ত্বের পরিচয় আছে বলে মনে করেন? বললাম—তা নাহলে গাইবেন কেন॥

জিজ্ঞাসা,—ধ্রুপদের যে চারটি বাণী আছে তার অর্থ কি?

বললাম,—ও গুলির যথাযথ বিবরণ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১৯৭৬ সালের মার্চের প্রথমে রাত ১০টায় একজন 'তিলক কামোদ' রাগের উপর খেয়াল গাইলেন। আগেই জানিয়েছি, 'তিলক কামোদ' 'পিলু', 'ঝিঁঝিট', 'ভৈরবী', 'খাম্বাজ', 'সিন্ধু, দেশ, বারঙা ইত্যাদি ধরণের রাগগুলিকে বিশুদ্ধভাবে রেখে খেয়াল গাইবার বা যন্ত্রে বাজাবার ইচ্ছে হলে প্রত্যেকটির অন্ততঃ দু' একটি করেও চারপদী প্রাচীন ধ্রুপদ শিখে এবং রাগঅভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এগুলির রূপ পরিচয়ের নিয়ম-নীতি, বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ জেনে

আমার 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থে, ইচ্ছে করলে পড়ে দেখে নেবেন।

তিনি বললেন,—সম্প্রতি এক জায়গায় এক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে ছাপার অক্ষরে কবিতার মাধ্যমে দেখলাম, তাতে উল্লেখিত হয়েছে স্বামী হরিদাস 'ডাগর বাণী'র স্রষ্টা, এবং সেই তাঁর থেকেই ডাগর ঘরাণা নামে পরিচিত হয়েছে। ধ্রুপদের বিভিন্ন গায়ন পদ্ধতির উপরই ওই চার বাণীর নাম আছে, কিন্তু ডাগর ঘরাণা নামে এখন যে পরিচয় এসেছে, তাতে প্রকৃত পক্ষে ধ্রুপদের পরিচয় কোথায়? এঁদের তিন পুরুষের মধ্যে আমি সঙ্গীতের যা পরিবেশন দেখে আসছি তা মূলত আলাপেরই। গোঁসাইজী (রাধিকা প্রসাদ) বলেছিলেন, এদের আলাপের ঘরাণা, ধ্রুপদের নয়। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

বললাম,—স্বামী হরিদাস ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন না, তিনি শ্রীচৈতন্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে আজীবন দোতারা বাজিয়ে কৃষ্ণের ভজনায় মগ্ন ছিলেন। হরিদাস স্বামীই ছিলেন ধ্রুপদ গায়ক, যিনি তানসেনের গুরু। একই নাম থাকায় অনেকে মনে করেন আগের স্বামী ও পরের স্বামী দুই একই ব্যক্তি। কিন্তু তা মোটেই নয়। স্বামী হরিদাসের প্রায় চার শ' বছর আগে নায়ক গোপাল, বৈজুবাওরা প্রভৃতি বিখ্যাত গায়কদের দ্বারা চার বাণীরই গান যে রচিত হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু তা জানতে কে চায়?

---

(২) জিজ্ঞাসা,—আচ্ছা বলুন তো, আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় সংগীতের বহুবিধ প্রাচীন পরিচয়ের উপর সত্য নির্ভর তথ্য ও বিচার-যুক্তি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে অনেকের এত অনীহা কেন? বললাম, ওইটাই তো আমাদের বড় রকমের বৈশিষ্ট্য, তা না হলে বাংলা ভাষায় খেয়াল ইত্যাদি গাওয়ার কথা শুনে অনেকের গা ঘিন্ ঘিন্ করত কি?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিয়ে তবে পরিবেশনের সাহস রাখতে হয়। এই সব অভাবের জন্যই সেদিন ওই রাগের মধ্যে পাহাড়ী ও ঝিঁঝিটের সুর বারম্বার এসে পড়ছিল।

(৯) পশ্চিমের গোয়ালাদের এক শ্রেণীকেই আহিরী বলে। রাগ-রূপের নামে আহিরী অর্থাৎ গোয়ালা কথা কি জন্য কি অর্থে এল তা জানতে অনেকেরই কৌতূহল হবে। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে বেলা ১টায় এই কেন্দ্রে একজন বিচিত্রবীণায় আহিরী নাম দিয়ে যে সুর বাজালেন, তার মধ্যে রাগরূপের নিয়মপ্রকরণ ও ব্যাকরণ বিধির কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না এবং তার সুরেও শুনবার মত কোন আকর্ষণ এল না। মনে হল একটা অযোগ্য মনগড়া সুর। আহিরীভৈরব নাম দিয়ে তার সুরের প্রচলন খুব বেড়ে গেছে দেখেই যেন তিনি আহিরীর নির্দিষ্ট রূপ দেখিয়ে দিলেন—জানা আছে বলে। কিন্তু তাঁর সেই সুরের সঙ্গে কোন পরিচয় গায়ক-বাদকের যে আছে তার প্রমাণ তাঁদের পরিবেশিত আহিরী ভৈরব রাগের মধ্যে পাওয়া যায় না॥

(১০) পরের রাত্রে শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুরোধের আসরে এক মহিলা খেয়াল গাইলেন, গলা খুব তৈরি, তবে স্নিগ্ধ ও মধুর রসের একান্ত অভাব। যাই হোক, রাগটির নাম ঠিক মনে পড়ছে না, তবে তার মধ্যে প্রায় সবটাই ছিল ইমনের সুর, পরিবর্ত্তন দেখাবার জন্য কোন কোন সময় যখন কোমল 'নি' লাগাচ্ছিলেন, তখন তার কদর্য্যতায় মনে হচ্ছিল এরকম প্রবৃত্তির তুলনা নেই॥

(১১) ১৯৭৬ সালের এপ্রিলের বেতার প্রোগ্রামে এক মুসলমান গায়ক রাগরূপের উপর চমৎকার পরিচয় রাখলেন। তোড়ী রাগ আরম্ভ করে গানের মহড়ায় পা-মা-পা-ধা-রে, এই স্বরগুলির উপর সুর তুলে 'রে' এর উপর সম্ ফেলছিলেন। সুরের এই রকম রূপ যে সম্পূর্ণ শ্রীরাগের, তোড়ীতে কোন মতেই ব্যবহার হতে পারে না, এটুকুও বিচারবোধ নেই। মুর্খে'র সংখ্যায় ইনিও একজন বেশ বড় দরের॥

(১২) ৫।৫।৭৭ তারিখের রাত দশটায় একজন মহিলা খেয়াল গাইতে বসার সময় ঘোষক জানিয়ে দিলেন সহযোগী রূপে তবলাবাদক ও যন্ত্রীর নামও। নাম ঘোষণার এই ব্যবস্থা 'এ' ক্লাশের শিল্পীদের জন্য বলবৎ হয়েছে। কিন্তু গায়িকা পুরিয়া রাগের উপর যে পরিচয় রাখলেন তাতে রাগবোধের পরিচয় দিতে পারলেন না। হিণ্ডোল রাগের প্রভাবই যথেষ্ট ভাবে এসে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পড়ছিল স্বরগ্রাম করার আগে পর্য্যন্তই বলা যায়। অর্থাৎ সেই সময়টার মধ্যে দু' একবার মাত্র 'রে' সুরের ক্ষীণ স্পর্শ থাকছে বলে মনে হচ্ছিল শ্রবণ শক্তিকে রেডিওর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখার জন্য। পুরিয়া রাগের উপর 'রে' সুরের প্রকাশ যথেষ্টভাবে রাখতে হয় আরোহণ ও অবরোহণের উপর। এত প্রচলিত ও বড় একটি রাগের উপর অঙ্কনবোধ না থাকা খুবই ত্রুটি। গানের পরিবেশনায় ওই ক্লাশের যোগ্য বলে মোটেই মনে হল না। অবশ্য ঐ ক্লাশের চেহারায় এইরকম পরিচয়ের অভাব নেই॥

(১৩) ইং ৩১।৩।৭৬ তারিখের রাত্রে বেতার কেন্দ্রে ঘোষিত হল 'অমুক শিল্পী সেতারে "জন সম্মোহিনী" রাগ শুনাচ্ছেন।' সম্মোহন শক্তি কম বেশী নিয়ে প্রত্যেক রাগেরই আছে। তাঁর বিচার বোধে কি করে এ ধারণা এল,

---

একদিন ঘরওয়া আসরে অনেকের কাছে দু'জন প্রবীন শ্রোতা বলেছিলেন,—আমরা খুব কম বয়স থেকে প্রত্যেকটি গানের আসরে উপস্থিত হয়ে দেখতাম বিষ্ণুপুর ঘরাণার গায়করা—যথা গোঁসাইজী, গোপেশ্বর বাবু প্রভৃতি কোলকাতায় থাকলে তাঁদের উপস্থিতি। বিশ্বনাথজীর মত বিখ্যাত ধ্রুপদীরা সেই সব আসরে উপস্থিত থাকলে তাঁরা সর্বাগ্রে বিষ্ণুপুর ঘরাণার ওইসব গুণী গায়কদেরই গাইতে বলতেন এবং সমগ্র শ্রোতাদের অন্তরেও সেই আকাঙ্খা জাগ্রত থাকত। তার কারণ, তাঁরা জানতেন ঘরের দেবতার সম্মানও পূজা সর্বাগ্রে হওয়া দরকার। সকলেই মনে করতেন বিষ্ণুপুর ঘরাণা আমাদের দেশের ও নিজের ঘরাণা এবং এইখান থেকেই বাংলাদেশে শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রচারও বিস্তৃতি ঘটেছে। তখন কারোরই ধারণায় আসিনি বিষ্ণুপুর ঘরাণার সঙ্গীতজ্ঞদের বাদ দিয়ে গানের আসর করা চলে। মনুষ্যত্ব ও কর্ত্তব্যবোধের অভাব ছিল না॥

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটা কথা মনে উদয় হচ্ছে,— উচ্চস্তরের যাঁরা গুণী সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতের উপর অবদান যাঁদের আদর্শের মত হয়ে আছে, তাঁদেরকে মান পত্রাদিও সম্বর্দ্ধনা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই দেওয়াটা যদি সমস্ত সঙ্গীজ্ঞদের অনুমোদিত ও উপস্থিতির মাধ্যমে হয় তবেই যাঁকে সেই সম্মান দেওয়া হবে তাঁর কাছে দেয় বস্তুর প্রকৃত মূল্য থাকবে। আর একটা কথা,—রাষ্ট্রীয় উপাধি যাঁরা পাচ্ছেন তাঁদের পাওয়ার উপর দৃষ্টি দিয়ে মনে হয়, প্রধানতঃ তদ্‌বিরটাই আসল॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অমসৃণ মাটিতে পুতুল গড়ার মত সুরের এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটিই 'জন সম্মোহিনী' নামের উপযুক্ত! এ রকম নাম করণ খুবই হাস্যকর। শুধু আমিই বিশ্বাস করি না, যাঁরা সত্যকারের শিল্পী তাঁরাও নিশ্চয় মনে করেন, বড় বড় রাগকে ধরে তার রূপ অঙ্কনের উপরই শিল্প সাধনার আদর্শ ও মূল লক্ষ্য হয়ে থাকা উচিত। শিল্পীর প্রকৃত পরিচয় থাকে বড় বড় রাগের রূপ রচনার কৃতিত্বের উপরই যথাযথ ভাবে। সেই সব রাগের এক একটির রূপপ্রকাশক শক্তি এত বিরাট-বিস্তৃত ও বৈচিত্রময় যে, সারাজীবন একাগ্র হয়ে সাধনা করে গেলেও তার অন্ত পাওয়া যাবে না। এই মন্তব্যের বাস্তব পরিচয় অনেকখানি পাওয়া যাবে, যদি কমপক্ষে দশজন কৃতিবানশিল্পীর প্রত্যেকের এক ঘণ্টা করে টেপ্‌মেশিনের সাহায্যে তুলে নেওয়া হয় নির্দিষ্ট কোন একটি বড় রাগের পরিবেশন। সেই তুলে নেওয়া রাগের রূপে দেখা যাবে প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু নূতন শিল্পের সৃষ্টি আছে। এই রকম ভাবে আরো কয়েকবার যদি তাঁদের দ্বারা সেই রাগকে পরিবেশন করান হয়, তাহলেও পাওয়া যাবে প্রত্যেকবারের প্রত্যেকের মধ্যেই সুরের নূতন নূতন রূপাঙ্কন, একই রকম হবে না। তাহলে এই পরীক্ষার দ্বারা আমাদের বুঝে নিতে বিলম্ব হবে না, বড় রাগের রূপাঙ্কন শক্তি কত বড়। আমরা এককালীন প্রকাশনায় এই সামর্থ্যের পরিচয় রাখতে অপারগ হই কেন? তার কারণে আমার মনে হয়, একাগ্র হয়ে ধ্যান-চিন্তা রেখে শিল্পরূপের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি শক্তিকে ধরে রাখার মত সামর্থ্যের অভাব থাকে, তাই একসংগে প্রকাশিত হয় না, রচনার সময় কখন কিভাবে মেজাজে এসে পড়ে তার স্থিরতা থাকে না। কিংবা হয়ত শিল্পের এইটাই মহান পরিচয়। তবুও আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, শুধু মাত্র দু'চারটি বড় রাগকে ধরে একাগ্র ভাবে সাধনায় রেখে যেতে পারলে একই সংগে বহুবিধ বৈচিত্র্যরূপের প্রকাশনার সামর্থ্য সহজতর নিশ্চয়ই হবে। মোটের উপর রাগরূপের অনন্তবিস্তারি শিল্পমহিমার সন্ধান পেতে হলে মিশ্রণ রাগের উপর চর্চার আগ্রহ রাখা কোন মতেই উচিত নয়॥

(১৪) ইং ২৫।৬ ৭৬ তারিখের রাত্রে একজন মহিলা 'ইমন-কল্যাণ' রাগের উপর ধামারতালে 'কুঞ্জনমধ ডোলত' গানটির মহড়ার সুর যেভাবে তুলছিলেন তা একেবারে বেহাগের মত। যথা—'নি-ধা-পা-মা (কড়ি) গা-মা-গা'। সঞ্চারী-আভোগ থাকা সত্ত্বেও গাওয়া হয়নি। এ রকম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিক্ষকদের কাছে শেখা কোন মতেই উচিত নয়। এত কাঁচা গলায় বেতারে গাওয়ার অধিকার লাভ করা দেখে অডিশন গ্রহণকারীদের সম্বন্ধে যে ধারণা আসে তা বলার বিশেষ আবশ্যক করে না। সম্ভবের সহজ সুযোগ থাকলে অসম্ভব বলে আজকাল আর কিছু নেই॥

(১৫) ধ্রুপদ গানের পরিবেশন,—বেতার প্রোগ্রামে যখন ঘোষিত হয় অমুক ব্যক্তি ধ্রুপদ গেয়ে শুনাচ্ছেন, তখন তার পরিবেশনে ধ্রুপদ থাকে অতি নাম মাত্র, আসলে হয় আলাপচারী। এই রকম প্রোগ্রামকে ধ্রুপদের প্রোগ্রাম বলা মোটেই চলে না। এঁরা যদি প্রকৃত ভাবে ধ্রুপদ শিখে থাকেন, তাহলে ধ্রুপদের স্বরূপ শক্তির পরিচয় কেন রাখবেন না? ধ্রুপদ কি দু'তিন মিনিটের মধ্যে শেষ করার গান? তাহলে তাঁরা খেয়ালের চেয়ে একে শ্রেষ্ঠকরে কোথায় রাখছেন? যদি বলা হয়, 'আলাপে তো আমরা সাধ্যমত সব কিছুরই পরিচয় রাখি!' এ বলার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, কারণ আলাপ স্বতন্ত্র জিনিস। বিশ্বনাথজী, চন্দনচৌবে, দৌলত খাঁ, অঘোর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিখ্যাত গায়করা আলাপ না করেই ধ্রুপদ গেয়ে শ্রোতাদের মনকে ভরিয়ে ও মাতিয়ে দিতেন। যাঁরা ধ্রুপদ গাওয়ার উপর প্রকৃত সামর্থ্য রাখেন তাঁরা ধ্রুপদ অঙ্গের চৌতাল ও ধামার তালের প্রত্যেক গানকে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা ধরে সুর বৈচিত্র্যের বিস্তার সমাবেশ রেখে সুন্দর ভাবে গাইতে পারবেন।

সম্রাট অকবরের দরবারে তানসেন শুধু চারপদী ধ্রুপদ গানই যে গাইতেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি যদি বেতার কেন্দ্রের এখনকার ধ্রুপদীদের মত তিন মিনিটের মধ্যে ধ্রুপদের উপর ছন্দের লাঠি চালিয়ে সমাধা করতেন, তাহলে তানসেনের নামই বোধহয় কেউ জানত না এবং তাঁর কপালে কি যে ঘট্‌ত তা বেশ বুঝতে পারছি। তানসেন কিরকম করে ধ্রুপদ গেয়ে অকবর ও তাঁর দরবারের সভাসদ্‌কে মুগ্ধ করতেন এবং সেই মুগ্ধ করার বস্তুতে সুরের ক্রিয়া সম্পদ কি রকম ছিল, যার জন্য তিনি তানসেন উপাধি পেয়েছিলেন, সে কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করে ধ্রুপদ সাধনা করা কর্তব্য। তানসেন কথার অর্থই হল বিস্তারে শ্রেষ্ঠ। আস্থায়ী, অন্তরার মধ্যে ধ্রুপদের প্রকৃত অর্থ থাকে না। চারপদী ধ্রুপদই হল আসল ও শ্রেষ্ঠ এবং পরিচয় জ্ঞাপক দলিল স্বরূপ। দ্বিপদী ধ্রুপদগুলো নকল দলিল। চারপদী ধ্রুপদের আভোগে রচয়িতার নাম থাকে বলে সেই গানস্রষ্টার তৈরিগলা,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুর ও কথার রচনা কত উচ্চস্তরের ছিল তা আমরা বুঝতে পারি। এবং তাঁদের স্মরণ করার সেই সুযোগে থাকে নমস্য স্বীকৃতি। ধ্রুপদ গানের নীতি পদ্ধতির পরিচয়কে যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে তাকে চারটি অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির উপযুক্ত অর্থ রেখে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, এই চারটি নাম প্রদান করেছিলেন গান স্রষ্টারা। শাস্ত্রীয় সংগীতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ গানকে সর্বাঙ্গীন ভাবে রূপায়নের দায়িত্ব পালনের জন্য ধ্রুপদ শিল্পীদের প্রতি বেতার কর্তৃপক্ষের অনুরোধ বা নির্দেশ থাকা উচিত। শিল্পীদের দু'বার যখন প্রোগ্রাম থাকছে তখন তাঁরা একবার না হয় আলাপই করুন, আর না হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে দশ মিনিট আলাপ করে কুড়ি মিনিট ধ্রুপদ গান করুন!

কারো কারো ধারণা ধামারে হোলী বিষয়ের বর্ণনা থাকে বলে ও গানকে ধ্রুপদাঙ্গের গান বলে না, ও হচ্ছে পৃথক নামে হোলী ধামার। তেওরা, ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল, এই তালগুলির ধ্রুপদাঙ্গের গানকে কেউ কেউ বলেন 'সাদ্‌রা'। এই কথার যুক্তিযুক্ত কি অর্থ তা যাঁরা বলেন তাঁরাও বোধ হয় জানেন না। এঁরা তাহলে শুধু চৌতালের গান-গুলিকেই বলতে চান ধ্রুপদ? তাহলে এঁদের নূতন সম্বোধন তত্ত্বে ধ্রুপদাঙ্গ ও খেয়ালঙ্গের গান বলে কোন নাম থাকবে না। কারণ, ঝাঁপতাল, তেওরা, সুরফাঁকতাল, তালের মত দ্রুত অঙ্গের তালগুলো যদি সাদ্‌রা হয়, তাহলে দ্রুত খেয়ালেরও আলাদা নাম রাখতে হয়। ওই সব ব্যক্তিদের এই রকম সব উক্তি, শূন্য কলসীর মতই শব্দ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ধামার সম্বন্ধে একটা কথা,—এই তালে প্রথম সময়ের রচিত এমন বহু প্রাচীন গান আছে যাতে হোলীর বর্ণনা নেই। পরিশেষে বেতারকেন্দ্রে, তিন মিনিটে রেকর্ডে গাওয়ার মত যেভাবে ধ্রুপদ গান পরিবেশিত হচ্ছে তাতে ধ্রুপদ গান যে কি জিনিষ ও কত উচ্চ মার্গের বস্তু তা কেউ কোন দিন বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না॥

(১৬) ১৯৭৬ সালের জুন মাসের শেষের দিকে একজন রাত্রের প্রোগ্রামে 'দেশ রাগ' নাম দিয়ে 'ধামার' গাইলেন। তাতে স্বরগ্রামের শীলাবর্ষণ দেখে বুঝলাম, ধ্রুপদাঙ্গের গানে কি করতে হয়, বা না হয় তার সম্বন্ধে কিছুই জানা হয়নি। নানান শ্রেণীগত গানে স্বরগ্রামের প্রবল বেগে প্রবেশাক্রমণ দেখে উক্ত শিল্পীর বোধ হয় ধারণা জন্মে গেছে, স্বরগ্রামের ক্রিয়া দেখানটাই সব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চেয়ে বাহাদুরীর কাজ এবং এর উপরই প্রশংসার সিংহ ভাগটি রক্ষিত আছে, তাই তিনি স্বরগ্রাম দেখিয়ে দিয়ে প্রশংসার পথ প্রশস্ত করে নিলেন। তারপর শিল্পী তাঁর গান পরিবেশনের সময় সুরকে করুণ রসে ভরিয়ে দেবার জন্য এমন সব সূক্ষ্ম ও তরল রসের পরিচয় রাখছিলেন, যেগুলো ঠুংরীর মত গানেই ব্যবহার হয়। মনে পড়ে গেল, একজন শ্রোতা বলেছিলেন,—'ধ্রুপদ যে এমন ঠুংরীর মত হয় এবং খেজুর রসের মত মিষ্টি লাগে তা আজ জানলাম।' এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা,—ধ্রুপদের মত আধ্যাত্মিক সংগীত পরিবেশনের সময় যে শুচীতা, ভব্যতা বজায় রাখতে হয় সে কথা ভুলে গিয়ে কেউ কেউ গাইবার সময় একটা ভব্যতাবিহীন যন্ত্রকে কোলে নিয়ে ভরং ভরং ধ্বনি উৎপন্ন করেন। গজ্‌লী ইত্যাদি ধরণের মত গানে ব্যবহারযোগ্য ওই যন্ত্রটিকে যে ব্যক্তি কোলে তুলে নিয়ে খেয়ালের মত উচ্চস্তরের গান শুনালেন প্রথমে এসে, এবং যে ব্যক্তি তানপুরার জুড়ির তারের নাম পাল্টে একটাকে 'নি' সুরে বেঁধে পীড়াদায়ক আবিষ্কারের কেরামতি দেখালেন এবং যাঁরা এর অনুকরণ করলেন, তাঁরা নিছক খুসীর উপরই করেছেন, এ কথাই বলব॥

(১৭) গান-বাজনার সংগে তব্‌লার সংগত এখন রেডিওর মাধ্যমেই শুনার সুযোগ পাই। এই পাওয়ার পরিচয়ের উপর মন্তব্য না রেখে পারলাম না। গান ও গৎ এর সময় তবলা বাদকরা সঙ্গতের অর্থ রক্ষা

জিজ্ঞাসা,—শুনলাম, আমেরিকার চিকাগো ইউনিভার্সিটি, লণ্ডন-অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং জার্মান থেকে প্রতিনিধি এসে আপনার কাছে বিষ্ণুপুর ঘরাণার ইতিহাস এবং কণ্ঠের আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি এবং সেতার ও এসরাজে আলাপ ও গৎ টেপের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। একাধারে একটি মানুষের মধ্যে থাকা উচ্চস্তরের এই সব বস্তু এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের তরফ থেকে এবং বেতার কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় টেপের দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে কি?

উত্তর—এই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব এই সব প্রতিষ্ঠানে থাকবে, বিশেষ করে আমার মত ব্যক্তির কাছ থেকে, এ আপনি কি করে আশা করেন? বিদেশীরা আসে সন্ধান পেয়ে সব কিছু বড় জিনিষ সংগ্রহের জন্য। তাদের চেনার ভুল বড় একটা হয় না। তা যদি হত তাহলে তারা এই সব ব্যাপারে এত অর্থ ব্যয় করত না॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করে সঙ্গত করবেন এই প্রত্যাশাই থাকে। শিল্পীর পরিবেশিত বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করার পক্ষে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না, সেইরূপভাবে বাদনক্রিয়া রেখে যাওয়াকেই প্রকৃত সঙ্গত বলে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই বিষয়ের উপর যে বাস্তব পরিচয় থাকে তাতে বেশ বুঝা যায়, নামকরা তবলা বাদকরা নামকরা সঙ্গীত শিল্পীদের সমকক্ষ মনে করেই সঙ্গত করেন, তাই সঙ্গতটা অনেকস্থলেই অসঙ্গত ও পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে বোল পরনের ঝড় ঝাপটা ও শীলা বর্ষণে। এই রকম ক্রিয়া কাণ্ডতে সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য কিছুই থাকে না, যেন মহরমী পর্ব্ব হচ্ছে মনে হয়। আমার যুক্তিতে এই কথাই আসে, যাঁরা শুধু সুন্দরভাবে ঠেকা দিতে পারেন এবং তার সঙ্গে সামান্য কিছু শোভন মত বোল-পরন দিয়ে, তাঁদের নিয়েই সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করুন। আর বড় বড় বাদকরা লহরা বাজিয়ে তাঁদের সাধনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে থাকুন, তাহলে আমাদের প্রত্যেকটিই উপভোগ্য হবে। অবাক লাগে দেখে,—যন্ত্রী যেমনি বিলম্বিত গৎ বাজাতে শুরু করলেন ওমনি তব্‌লা বাদক সম্ থেকে তার উপর বোলের খোড়-সাওয়ারী সুরু করে দিলেন, আর যন্ত্রী তখন বাদকের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়ে গৎ এর মহড়ার পুণরাবৃত্তি চালাতে লাগলেন—যতক্ষণ না বাদকের মর্জি হচ্ছে সমে ফেলে নিষ্কৃতি দিতে। আমি ভেবেই পাইনা, কি কারণে যন্ত্রীরা বাদকের বোলের নাগর দোলায় ঘুরতে থাকেন!!

(১৮) ১৯৭৬ সালের ২৫শে জুনের মধ্যাহ্নে বেতার:কেন্দ্রে একজন বারঙা রাগ নাম দিয়ে খেয়াল গাইলেন। সে সুর কিন্তু বারঙা নামের নয়, প্রকৃত পক্ষে তা সিন্ধু রাগের রূপ। সিন্ধু রাগের শাস্ত্রীয় নাম সৈন্ধবী, এর পরিচয় বিরাট আকারে প্রচারিত হয়ে এসেছে সঙ্গীতজ্ঞদের মাধ্যমে, বহু ধ্রুপদাদি গানে, শোরীর টপ্পায় এবং প্রাচীনকাল হতে বড় বড় যন্ত্রীর বাদনে ও তাঁদের রচিত গৎ-এ। সেই সুরকে হঠাৎ বারঙা নামে পরিচিত করা যেন ভূতেড়ে কাণ্ডর মত। আসল বারঙা বলে যে সুর বহুকাল হতে চলে আসছে, তাকে এখন কেউ কেউ কোর্‌বানি না কির্‌বানি এই নামে পরিচয় দিচ্ছেন। এ-ও যেন আম্‌দো বাজী। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে ধরে রাগরূপের প্রকৃত সুরের সংগে এবং নির্দ্ধারিত স্বরের সংগে, নিয়ম নীতির সংগে, নামের সংগে এমন ভাবে কি করে সংশ্রব শূন্য হওয়া সম্ভব হয় তা ভাবতেই পারা যায় না॥

(১৯) ইং ২৭।৯।৭৬ তারিখের রাত্রে কোলকাতা বেতার কেন্দ্রে সঙ্গীত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিচিতি নামে যে অনুষ্ঠানটি হল, তাতে এই মনে হল, রাগরূপের ও শ্রেণীগত বস্তুর তথ্য পরিবেশন নিজের খুসীমত করলেই চলে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিশেষ কোন আবশ্যক করে না। সঙ্গীত সমাচার বা পরিচিতির এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে এইরূপ বিভ্রান্তিকর ভাষণ চলতে থাকলে শিক্ষার্থীদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করবে। বেতার কর্তৃপক্ষ বোধহয় মনে করেন, তাঁদের নির্বাচিত ব্যক্তি মাত্রেরই শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের ক্রিয়াঙ্গ ও তত্ত্বাঙ্গ বিষয়ে ভাষণ দেবার যোগ্যতা আছে। সেদিনের ওই গায়কটির গলাও আগাগোড়া বেসুরো ছিল। অথচ শুনলাম, ইনি 'এ' ক্লাশের শিল্পী। নিশ্চয়ই অডিশন্ দিতে হয়নি॥

(২০) ওই তারিখের রাত ১০॥ টায় একজন নামকরা শিল্পী সেতারে 'ইমন-কল্যাণ' রাগ বাজালেন। সময়ের কথা তুলছি না, যদি দুপুর বেলাতেই কেউ বেহাগ রাগ বাজান বা গাইতে চান তাহলে তাঁর খুসীর উপর বলবার কি আছে! যখন খুসীরই রাজত্ব। ওই রাগটির পরিবেশন সম্বন্ধেই আমাকে কিছু বলতে হল। তিনি যতক্ষণ বাজালেন তার মধ্যে মাঝে মাঝে শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার ছাড়া বাকী সমস্তটাই ইমনের সুর, কল্যাণের সুর কোথাও ছিল না। শিল্পীর বোধহয় জানা নেই, মাঝে মাঝে শুদ্ধ মধ্যম দিলেই 'ইমন-কল্যাণ' হয় না। ইমনের সংগে কল্যাণেররূপ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রাখতে হয়। শুদ্ধ মধ্যমটি এক সময় গান্ধারের উপর দিকে আবেগ নিয়ে স্পর্শ আন্দোলনের দ্বারা প্রকাশ হয়ে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। সেই থেকে এই যুগ্ম রাগটিকে সহজভাবে চেনাবার জন্য ওই স্বরটির ব্যবহার হয়ে আসছে। নচেৎ কোন আবশ্যই ছিল না, ইমন-কল্যাণের রূপ পরিচয়ের জন্য। সেদিন একজন বললেন, 'বেলাওলের সুর মিশ্রিত হয়ে 'ইমন-কল্যাণ' হয়েছে।' ইমন এবং কল্যাণ দুইটিই বিশেষ প্রতিষ্ঠিত রাগ, তার সংগে যদি 'বেলাওল' মিশ্রিত হত তাহলে শুধু 'ইমন-কল্যাণ' নাম দিয়ে সুরের পরিচয় থাকত না, বেলাওলের নামও যুক্ত থাকত। ৩১।১২।৭৬ তারিখেই মনে হচ্ছে 'এ' ক্লাশের একজন প্রবীণ শিল্পী 'ইমন-কল্যাণ' রাগের খেয়াল যেভাবে গেয়ে রাগরূপ প্রদর্শন করলেন তা ওই যন্ত্রীর মত তো বটেই উপরন্তু দ্রুত খেয়ালের পূর্বাঙ্গকে ধরে নীচে থেকে এমনভাবে শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার রাখছিলেম যে, সেভাবে ব্যবহার করা মোটেই চলে না, মনে হচ্ছিল রাগরূপের উপর আঘাত পড়ছে। গানটির সুরের বন্দেজও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছিল তার আসলের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে। শিল্পী যদি আমার কাছে ওই গানটি শুনতেন তাহলে বুঝতে পারতেন তার সুরের সংযোজিত রূপ কত কৌশলপূর্ণও উচ্চস্তরের॥

(২১) ১৯৭৬ সালের ৮ই ডিসেম্বরের রাত্রে বীণা ও রবাব সম্বন্ধে যাঁকে দিয়ে আলোচনা ইত্যাদি করান হল, তাতে পাওয়া গেল না প্রকৃত পরিচয় ও ক্রিয়াঙ্গের আসল স্বরূপ। বিখ্যাত বিখ্যাত বীণা বাদকদের বীণবাদন আমার শোনা না থাকলে মনে হত ভরং ভরং ফরং ফরং শব্দ তুলে রাগের সুর গুলোকে নিয়ে ডিগ্‌বাজী খাওয়ানই যদি এর একমাত্র বৈশিষ্ট হয়, তাহলে যন্ত্রটির চর্চা ওঠে যাওয়ায় দুঃখ কিছু নেই। কিন্তু তা মোটেই নয়, যাকে প্রকৃত বীণ বাদন বলে সেই বাদন ক্রিয়া আমি প্রথম ভাল করে শুনি ১৯১৯ সালে ৺কাশীর 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে।' ওই সম্মেলনে বরোদা, রামপুর এবং পাতিয়ালার রাজ দরবার থেকে পাঁচ-ছ'জন বিখ্যাত বীণবাদক এসেছিলেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে প্রাতঃকালে বরোদা-ষ্টেটের যে বীণকার দেশীতোড়ীরাগের উপর আলাপ বাজালেন দুই ধৈবতের প্রয়োগ রেখে, তাঁর বাদন ক্রিয়ায় সকলেই অভিভূত হয়ে গেছলেন। সুর রচনার ভাবে আমার চোখে জল এসে গেছল। ছ'সাতটা পর্দ্দা পর্য্যন্ত অপূর্ব টানের উপর ধীর স্থির ভাবে বিলম্বিতের উপর রচনা-বিন্যাস ও তার রসমাধুর্য্য এখনও কাণে লেগে আছে। ১৯২৪ সালে লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত 'নিখিল-ভারত-সঙ্গীত সম্মেলনে' পনের, ষোলজন বিভিন্ন ষ্টেট্ থেকে বড় বড় বীণকাররা এসেছিলেন। প্রত্যেকেরই বাদন পদ্ধতি অতি তৃপ্তিদায়ক হয়েছিল। যে কোন যন্ত্রই হোক এবং কণ্ঠ সঙ্গীতের শ্রেণীগত গানই হোক্, তার উপর আদর্শগত ক্রিয়াঙ্গের অধিকার না থাকলে তার স্বরূপ পরিচয় ক্রিয়াঙ্গের মাধ্যমে দেখাতে যাওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

কোলকাতার এক বিশিষ্ট বংশের বিশিষ্ট শ্রোতা হিতেন্দ্র নাথ বসু উজীর খাঁ এর বীণবাদ্য শুনে এসে বলেছিলেন, "উজীর খাঁ এর কাছে শিখেছি একথা যাঁরা বলেন তাঁদের বাদন ক্রিয়ায় উক্ত খাঁসাহেবের বাদন ক্রিয়া-পদ্ধতির ছাপ কিছুমাত্র পাওয়া যায় না। তিনি একথাও বলেছিলেন,—উজীর খাঁ যখন বীণা বাজালেন তখন মনে হল তর্জনী ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে মেচরাফ্ পরে সুর বাহার সেতারের মত ষ্ট্রোকের কায়দায় বাজিয়ে গেলেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেমন বিষ্ণুপুর ঘরাণার যন্ত্রীরা বাজান। তাই বোধহয় বাদন ক্রিয়া এত বেশী মাধুর্য্য মণ্ডিত হয়েছিল।" আমি কিন্তু যাঁদের কাছে বীণবাদন শুনেছি তাঁরা তর্জনী, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে মেচরাফ্ পরে প্রথামত নিয়মেই বাজিয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকটি আঘাতের পর টানের ক্রিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়েই। তাই মনকে এত আকর্ষিত করত। সেদিন রবাব যন্ত্রটা বাজিয়ে তারও সত্যকারের পরিচয় নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বেতারকেন্দ্রের আলোচনাচক্রে চক্রের অভাবই বেশী পরিলক্ষিত হয়॥

(১৯) ইং ২৮।১০।৭৬ সালের রাত্রে একজন আশাবরীতে পুরো গান্ধার দিয়ে বাজিয়ে গেলেন। এই কাণ্ড দেখে মনে হল—'অপরম্পা কিং ভবিষ্যতি।'

(২০) বেতারকেন্দ্রে সঙ্গীত শিক্ষার আসর নাম দিয়ে যে অনুষ্ঠানটি বহুদিন ধরে চলে আসছে, তাতে নামের সংগে তার যথার্থ অর্থ সম্বন্ধ নেই। কারণ, সঙ্গীত শিক্ষার আসর বলতে হলে তাতে অর্থবহ হয়ে থাকবে, রাগ সংগীত শিক্ষা দানের ব্যবস্থার কথা, যেমন,—ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি এবং তারের যন্ত্র প্রভৃতি। তা যদি না থাকে তাহলে গান শিক্ষার আসর, এই নামই শুধু থাকবে,—সঙ্গীত শিক্ষার আসর নামে নয়।

(২১) বিষ্ণুপুর ঘরাণা থেকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, এই সব শ্রেণীগত অনেকগুলি গানের হুবহু সুর, বন্দেজ ও ছন্দাদি প্রভৃতি যথাযথ সংরক্ষিত করে বংলায় রচনা করেছিলেন। সেগুলিকে রবীন্দ্র সংগীত বলে পরিচিত করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিন্তু বেতার কর্তৃপক্ষ তাই করেন। তাঁরা মনে হয় জানেন না, এইসব গানের ভাবময় বাণীই কেবল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। গায়কের কাছে জেনে বেতারের ঘোষককে বলতে হবে, অমুক রাগের অমুক হিন্দী ধ্রুপদ থেকে কিংবা খেয়াল, অথবা টপ্পা থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় রচনা করেছিলেন। এতে শ্রোতাদের যেমন গানের সুর ও বন্দেজের উপর সঠিক ধারণা আসবে, তেমনি গায়ক-গায়িকাদেরও উপকার হবে, যদি তাঁদের সঠিক পরিচয় জানা না থাকে। আমি জানি অনেকেই এইসব গানের সুর সৃষ্টির আসল সংবাদ জানেন না। কিন্তু প্রত্যেকেরই জানা উচিত, নচেৎ মনে হবে এই সকলের সুর-তাল ইত্যাদিও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, যা তাঁর প্রতি যথাযথ আচরণে ত্রুটি হবে বলেই মনে করি। আমি এই জন্য বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনে শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়কে বলেছিলাম, বাণী রচিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইসব রবীন্দ্রনাথের গানের প্রত্যেকটিকে শেখানোর পূর্বে তাঁর আসল গানটিকে জানা অত্যাবশ্যক॥

আমার এই মন্তব্য বেতার কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না, তার কারণ, তাহলে বংলা ভাষার উপর ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পাকে স্বীকার করে নেওয়া হবে, যার মত অন্যায় তাঁদের কাছে আর কিছু নেই॥

(২২) বেতারকেন্দ্রের প্রোগ্রাম প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ মন্তব্য,—

ভাবপ্রবন গানের কথাই যে প্রধান তার প্রমাণ ধরে বলছি,

"তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী আমি অবাক হয়ে শুনি... ।"

"আমার মুখের কথায় তোমার নাম নিয়ে দাও ধুয়ে,

আমার নিরবতায় তোমার নামটি রাখ থুয়ে... ।" এইসব অপূর্ব ভাবাত্মক গানে ভাষাই দিয়েছে মহান কামনা, ও দৃষ্টি শক্তিকে উর্দ্ধে তুলে ধরার সন্ধান। ভাষার উপরই প্রধানতম হয়ে যে সব গানে ভাবের মাহাত্ম্য থাকে এবং শুনার মধ্যে আসে আত্মোন্নতি ও মনের প্রকৃত খোরাক, সেইসব গানের সুর বাজিয়ে শুনাতে যাওয়া এবং শুনানর ব্যবস্থা রাখা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার মতে জাতীয় সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক যে সব গান আছে সেইসব গানেরও সুর না বাজিয়ে গলায় গাওয়ার ব্যবস্থা থাকাই সমীচীন। এই গান বৃন্দ গান গাওয়ার প্রথায় টেপে তুলে তাকেই ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবহার করার মধ্যেই থাকবে সেইসব গানের প্রচার মহিমার সার্থকতা। প্রত্যেক দেশের জাতীয় সঙ্গীত নামে রচিত হয়ে যেসব গান আছে, তাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষায় অনুবাদ করে স্বরলিপিসহ বিতরণ করলে প্রত্যেকের কাছেই এই গান হৃদয়ঙ্গম হয়ে বুঝবার সহায়তা ও শ্রদ্ধান্বিত করবে। "জনগন মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা... ।" এই গানের ভাব বস্তু যদি মৃত হয়ে রইল তাহলে তার সুরের চর্ম্মটা দেখিয়ে কি ফল আছে? খোলসটাকে দেখাতে যাবই বা কেন? মোটের উপর আমরা একথা কোনক্রমেই বিস্মৃত হতে পারি না, যে কোন গানই হোক না কেন তার রচয়িতা শুধু সুরটুকু বাজাবার জন্য রচনা করেন না, এ রকম মূর্খামী-কাণ্ড কেউ করবে তার ধারণাও তাঁদের আসতে পারে না।

সুর বাজাতে হলে গানের সুর বাজাতে যাওয়ার সহজ পথে না গিয়ে এবং তাতে কিছুমাত্র বাহাদুরি নেই এই বোধটুকু রেখে রাগরূপের চর্চায় শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার বাসনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা রাখাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উচিত। সস্তা পরিচয়ে জীবনের কি সার্থকতা আছে? সহজায়ত্ত গানের চর্চাতেও বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠার পরিচয় ও কৃতিত্ব থাকে না। বেতারকেন্দ্রে শুধু গান বাজানর জন্য এমন একটি বাদ্য যন্ত্রের প্রোগ্রাম বেড়ে গেছে যে, তা দেখে মনে হয় এই অসহ্য ক্রন্দন কর বস্তুটিকে প্রচারের জন্য বোধহয় কোন কারণের উপর বাধ্যবাধকতা আছে॥

(২৩) শিল্পী কথার মানে হল, শিল্পকার,—যে শিল্প সৃষ্টি করতে পারে এবং পরিচয় রাখে তার উপর তার কৃতিত্বের। শিল্পকারের কোন উৎপন্ন বস্তু কেউ যদি গ্রহণ করে তার হুবহু রূপটি বিতরণ করতে থাকে তাহলে সে শিল্পী নামে পরিচিত হতে পারে না। যেমন গামছা যে ফেরি করছে সে শিল্পী নয়, যে তৈরি করছে সে গামছার মত বস্তুর শিল্পী। এই সহজ সরল অর্থটা বেতারকেন্দ্রের ঘোষকরা কি করে না জেনে থাকেন তা এক অভিনব আশ্চর্য্য। তাই তাঁদের কাছে ফেরিওয়ালাও শিল্পী॥

(২৪) রেডিওর মাধ্যমে রাগ সংগীতের প্রোগ্রাম শুনার আগ্রহ নিয়ে প্রস্তুত হলেই দেখি খেয়াল খুসী ও বিচারবোধহীনতার পরিচয়ই বেশী থাকে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কাছে এরকম কাণ্ড খুবই অহিতকর বলে মনে হওয়ায় তাই এই সব পরিচয়ের কয়েকটি নমুনাই তুলে দিলাম, যদি এতে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা, সতর্কতা ও বিচারবোধে সাহায্য করে সেই-জন্য। তার আগে বহুবিধ বিষয় নিয়ে যেসব বিচার, বিশ্লেষণ, ও আলোচনা করে দেখিয়েছি তাতে বিশেষভাবে জানা যাবে বিশুদ্ধ নীতি নিয়মের মাধ্যমে রাগ সংগীতের শাশ্বত পরিচয় কেমনভাবে দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমার মনে হয় রাগ সংগীতের মত এত বড় বিদ্যাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য একটি বুদ্ধি দীপ্ত, নিরপেক্ষ পরিচালকমণ্ডলী থাকা অত্যাবশক॥

জিজ্ঞাসা,—যাঁরা সঙ্গীত সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সমালোচনা করেন তাঁদের সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? বললাম,—আপনি তো এবিষয়ে ভুক্তভোগী, আপনিই বলুন। তিনি বললেন,—সমালোচক প্রধানতঃ আমি তিন শ্রেণীর দেখতে পাই। প্রথম শ্রেণী হলেন তাঁরাই, যাঁরা দু'দিকের ওজন বুঝে নিজের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যকে সম্বল করে সেই ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের যথাযোগ্য স্থান কোথায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে শ্রদ্ধান্তঃ করণে সমালোচনা করেন। বিশদ আলাচনার প্রয়োজন থাকলেও যতটুকু এঁরা মন্তব্য রাখেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুদ্ধ স্বরের উপর ভুল ধারণা

একদিন প্রবীন সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় আমায় কাছে এসে সঙ্গীত সম্বন্ধে নানান জিজ্ঞাসার মধ্যে বললেন,—একজন সংগীত গ্রন্থকার লিখেছেন, রাগ বিশেষে শুদ্ধ স্বরেরবাদী একই স্থানে থাকে না, শ্রুতির তারতম্য হয়, যেমন দুর্গা, মালকৌশ, ললিত, কেদার, বাগেশ্রী প্রভৃতি মধ্যম প্রধান রাগের মধ্যম স্বর একই রকম হয় না।" উত্তরে বললাম,—এ রকম ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রসূত। শুধু বাদী স্বরই নয়, যে কোন শুদ্ধ স্বর কখনও স্থানচ্যুত হয় না,—হতে পারে না। রাগ বিশেষে কোমল স্বরের ইতর বিশেষ হয়, যেমন কানাড়ার কোমল তীব্র হয়। জৌনপুরীর কোমল যথাস্থানেই থাকে। সাতটি শুদ্ধ স্বরের এক একটি করে অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী আছেন। কোন্ প্রমাণের উপর শাস্ত্রকার একথা লিখলেন এবং কেনই বা লিখলেন তার তাৎপর্য্য আমি জানিয়েছি আমার 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থে। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রায় সব কিছুর ব্যাখ্যা বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক ওই গ্রন্থে দেওয়া আছে।

তাতে মানবতাবোধ ও দায়িত্ব জ্ঞানেরই পরিচয় থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকদের পরিচয় হচ্ছে, যাঁরা হামবড়ত্ব ভাব নিয়ে সমালোচনা করেন। এঁরা সমালোচনার ভার নিয়ে ভুলে যান, গ্রন্থকার ও শিল্পীর প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান, কৃতিত্ব ও অবদান কত উর্দ্ধে অবস্থিত। তাই এঁদের সমালোচনায় যথার্থতা কিছু থাকে না বরং ক্ষতিই করে বেশী। গ্রন্থকার ভূমিকায় কোন কোন বিষয়ের কারণ জানিয়ে এবং অসাবধানতা বশতঃ কোন বাক্যের ভুল থেকে যাওয়া এবং মুদ্রণ প্রমাদের বিষয় জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এই শ্রেণীর সমালোচকরা মনের উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ ওর মধ্যে পেয়ে জজিয়তী করেন। এর পরের শ্রেণীর যা নামকরণ করেছি তা যে যথার্থ তারই পরিচয় রাখেন এঁরা তাঁদের সমালোচনায়। এঁরা নিজের মনোমত ব্যক্তিটিকে পেলে স্বর্গে তুলেন, অন্যদের সময় উন্নাসিকতা দেখান। সেই উন্নাসিকতার বিকৃত মুখের ছাপ মন্তব্যে ও লেখার মধ্যে আগাগোড়া থাকে। এঁরা একপক্ষের পাণ্ডা,—অপর পক্ষের ষণ্ডা। এই বিষয়ে এঁদের বিদ্যার দৌড় যে কতটুকু তা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয়

আমার মনে হয় রাগ রূপের বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রভাব দৃষ্টে বোধহয় ধারণা জন্মে গেছে, তাদের মধ্যে বাদী স্বর এবং স্থায়ীত্ব নিয়ে বহুল ব্যবহৃত অন্য শুদ্ধ স্বর একই রকমের নয়। এই বিষয়ে এটুকু বুঝা দরকার, রাগের বাদীস্বর রাগ রূপের পরিচয় প্রদানে বিশেষ সাহায্যকারী স্বর হলেও রাগের স্বভাবও প্রভাবের মধ্যে যে পৃথকীকরণ রূপ তাৎপর্য্য থাকে তা সেই রাগের নির্দ্ধারিত স্বর সংযোগের কৌশল পূর্ণ অঙ্কনের উপরই বিশেষ করে। যাইহোক,—এই প্রশ্নের সমাধান আপনাকে দিয়েই করিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তানপুরার পঞ্চমকে মধ্যমে বেঁধে শুধু জুড়ির তার বাজিয়ে বললাম,—আপনি কেদার রাগের সুর তুলে মধ্যমে দাঁড়ান। তিনি মধ্যমে দাঁড়াতেই আমি মধ্যমে বাঁধা তারটি বাজিয়ে বললাম—আপনার গলার 'মা' সুরের সংগে ঠিক মিলছে তো? বললেন—ঠিক মিলছে। এই রকম ভাবে পর পর মধ্যম বাদীর রাগগুলিকে পরীক্ষা করিয়ে দিতেই বুঝতে পারলেন, তারে বাঁধা মধ্যমের সংগে সব মধ্যমই একই হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন,—গ্রন্থ পড়ে যে ধারণা জন্মেছিল, তা যে কত ভুল তা আজ বুঝলাম। বললাম,—বুঝবার চেষ্টা করার মততো চেষ্টা করা হয় না,—তাই আমরা অনেক কিছুর উপর আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ি। এই আলোচনায় একটা কথা বলা হয়নি, তা হল, শুদ্ধ স্বরকে যদি স্পর্শ করেও আসা হয় তবুও সে সুর তার যথাস্থান থেকেই উৎপন্ন হবে, অবশ্য যদি গালায় ও তারের টানে ঠিকমত দখল এবং পর্দ্দার দূরত্ব ও স্থান নির্ণয় করার মত অধিকার অর্জন হয়॥

গানে স্বরগ্রামের ব্যবহার

মনের ভাবকে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে ভাষায় রূপ দিয়ে তাতে মনোমত সুর সংযোজিত করে যে বস্তু উৎপন্ন হয় তাকেই গান বলে। সুতরাং যে কোন শ্রেণীর গানে ভাষার ভাবের সংগে সামঞ্জস্য বজায় রেখে অলংকরণ প্রয়োগের দায়িত্ব রাখতে হয়,—ভাববিঘ্নকারক কোন বস্তুর তাতে প্রকাশ চলে না। কিন্তু খেয়াল গানে ভাষার ভাব সুন্দর সুন্দর থাকলেও সুরের শিল্প রচনার প্রতিই প্রায় ষোলআনা আগ্রহ থাকে। সেই আগ্রহের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপর একাগ্রতা রেখে রাগরূপ অঙ্কনের সময় সুরের যে ভাবরূপ উৎপন্ন হয় শিল্পীর তৈরি কণ্ঠে, সেখানে স্বর গ্রামের ক্রিয়া দেখান খুবই অসমীচীন। গায়কী কণ্ঠের তখনকার প্রকাশিত সুরের চিত্ররূপের উপর আকৃষ্ট মন ওই ক্রিয়ার জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে দূরে সরে যায়। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ আসে, শিল্পী কেন এইরকম সময়ে স্বরগ্রামের কৃতিত্ব দেখাবার উগ্র আকাঙ্খা আনলেন! এর প্রয়োজন তো এ স্থলের জন্য নয়, এই ক্রিয়া, তেলেনায় বা আলাপের শেষস্তরে থাকাই তো সঙ্গত বলে বিবেচিত হওয়া উচিত! নিতান্ত প্রকাশ কামনা থাকলে দ্রুত অঙ্গের খেয়ালের একেবারে শেষে ইচ্ছে মত স্বরগ্রামেব ক্রিয়া থাকুক। জীবদেহের মত স্বরগ্রামরূপ-অস্থির (হাড়) উপর নির্ভর করেই রাগরূপের যাবতীয় বস্তু এবং গান ইত্যাদি নির্মিত হয়। সেই নির্মিত বস্তু যখন প্রদর্শিত হয়, তখন তার আভ্যন্তরিক অস্থিকে বের করে দেখাতে যাওয়া 'এনাটমি'র মত হয়ে পড়ে, তা যেমন ভাবেই হোক্। রাগের মুর্ত্তি নির্মাণের সংগে সংগে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব সুরের মন্ত্র দরকার হয়, সেগুলিকে নিয়ে প্রারম্ভিক পূজায় অর্থাৎ বিলম্বিতের খেয়াল গানে একাগ্র ভক্তিসহকারে প্রদান করার মধ্যেই থাকে প্রকৃত আহ্বান ও যথার্থতা। এই নিয়মনীতির ভাব তাৎপর্য্যকে উপলব্ধি করে গান ও গৎ-এর বিলম্বিত ক্রিয়ার অর্থ বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক। গানের কথার ভাবের সংগে স্বরগ্রামের ক্রিয়া কি সাংঘাতিক বিষদৃশ হয়; এস্থলে উদাহরণ দিচ্ছি মাত্র একটি গানের উল্লেখ করে। "অবমেরি নৈয়া পার লগাউঁ, হোমেরে হজরত্ নিজামুদ্দীন আউলিয়া..."। এর ভাবার্থ, হে প্রভু! হে জগদীশ্বর! হে মহান! তুমি আমার দেহরূপ নৌকাটা এবার পার করে দাও .....। এমন যে প্রার্থনার বাণী, যা উচ্চারণ করতে করতে আকুতি নিয়ে চোখে জল এসে যায়, সেই আকুলতার বাণীতে সা-রে-গা-রে গা-মা-ধা-মা, ইত্যাদি স্বরের উচ্চারণ কি করে আসতে পারে তা ভেবে খুব কষ্ট হয়। বিভিন্ন ভাব বস্তুকে ধরে যাঁরা গান রচনা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই এ আশঙ্কা করেন না, তাঁদের রচিত ভাব বস্তুর উপর এমন করে কেউ অনাচার করবে। অনেকের কণ্ঠে স্বরগ্রামের যখন দ্রুত ক্রিয়া চলে তখন তাতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুর স্বরূপ পরিচয়ে মনে হয়, এ যেন গান হচ্ছে না, রসহীন শুষ্ক কাষ্ঠের মত সর্‌গম্‌গুলোকে নিয়ে ম্যাজিক দেখান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হচ্ছে। নজ্‌রুলের অমন গানে এবং অন্যান্য বাংলা গানে কেউ কেউ যখন গলায় সরগম চালাতে থাকেন, এমনকি কেউ কেউ তব্‌লার বোল পর্যন্ত, তখন অনেকেই বলেন গানের উপর এটা এক নিদারুণ ব্যাভিচার এবং পাগলামিও বলা যায়॥

রাগালাপের নিয়ম পদ্ধতির পরিচয়—

আলাপের বিলম্বিত ক্রিয়ায় নির্দ্ধারিত চারটি অংশকে ধরে পরের পর নিয়মসঙ্গতরূপে অঙ্কন করতে হয়। সেই চারটি অংশ হল, আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। প্রথমতঃ আস্থায়ীর ক্রিয়ায় থাকবে খুব ধীর স্থির ভাবে ক্রমান্বয়ে মুদারা সপ্তকের স্বরকে ধরে এবং উদারার 'পা' রাগবিশেষে 'মা' পর্যন্ত অঙ্কনের পরিচয়। অন্তরা আরম্ভ হবে মুদারার মধ্যাঙ্গ থেকে তারার 'গা' পর্যন্ত গিয়ে তারই মধ্যে স্বরাঙ্কন করে ক্রমশঃ মুদারার 'সা' এ নেমে আসবে। তারপর সঞ্চারিতে অঙ্কিত হবে উদারাকে ধরে ক্রমশঃ উদারার 'সা' পর্যন্ত, যন্ত্রে অতি উদারা পর্যন্ত গিয়ে ক্রমশঃ উপর দিকে উঠে মুদারার 'সা' এ এসেই গমকের সাহায্যে উপর দিকে উঠে আসবে আভোগের ক্রিয়া দেখবার জন্য। সেখানে তারাসপ্তকের উপর দিকে সামর্থ্য মত সেই সপ্তকের ক্রিয়া দেখিয়ে ক্রমশঃ মুদারার 'সা'এ নেমে এসে বিশ্রাম পাবে। সংগে সংগে ওই চারটি অংশের প্রথমটির উপর লয়ের গতি কিছুটা বাড়িয়ে ছন্দযুক্ত করে রাগ বিস্তারের ক্রিয়া সমাবেশ থাকবে। এই রকম গতিপদ্ধতির উপর অন্য তিনটি অংশ পরের পর অঙ্কিত হবে। তার-

---

জিজ্ঞাসা,— আপনি তো বহুবিধ বাদ্য যন্ত্রের উপরও যথেষ্ট অধিকারের পরিচয় দিয়ে এসেছেন, সুতরাং জিজ্ঞেস করছি, শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগরূপ প্রকাশনার উপর ক্রিয়াঙ্গের নানান পদ্ধতিযুক্ত তৃপ্তিকর পরিচয় প্রদানের উপযোগী কোন্ যন্ত্রকে আপনি সর্বোত্তম বলে মনে করেন? উত্তর,—যে যন্ত্রের যে স্থানে পরিসর বস্তুটির উপর সাওয়ারী হয়ে তারগুলি চেপে থেকে জোয়ারী উৎপন্ন করে এবং পর্দ্দার উপর আন্দোলন ও টানের দ্বারা সেই জোয়ারীর মধ্যে দিয়ে তৃপ্তিদায়ক রস মাধুর্য্যের সৃষ্টি করে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পর লয়ের গতি ক্রমশঃ যত বাড়বে ততই ঝালার বিভিন্ন প্রকরণের উপর রাগবিস্তারের ক্রিয়া চলবে। অবশেষে সামর্থ্য মত আরো দ্রুত লয়ে যন্ত্রে রকমারি ঝালার সংগে তোড়ার ক্রিয়া মিশ্রিত করে সমধা হবে। সেই ক্রিয়া কণ্ঠেও তে-রে-নে-রি-তোম্-না-না, তে-রে-না-না, ইত্যাদি অক্ষরের দ্বারা পরিবেশিত হবে। এই হল আসল চতুরঙ্গ আলাপের প্রকৃত পদ্ধতি। কিন্তু আমি এখন কাউকেই দেখিনি এই প্রকৃত পদ্ধতিকে অনুসরণ করে আলাপ পরিবেশন করতে। আল্ থাল্ ভাবে সপ্তকের যেখানে সেখানে রাগের রূপ অঙ্কিত হতে থাকে। আলাপের সময়, চঞ্চল বস্তু যথা, কৃন্তন, ঠোক, সাপটতান, কাটাছন্দ, এই সব ক্রিয়াঙ্গ বস্তুর প্রকাশ আলাপে থাকে না। আগেকার ঘরাণার বিখ্যাত যন্ত্রী ও গায়করা আমার লিখিত ওই আসল প্রথায় আলাপে রাগরূপ পরিবেশন করতেন। সংযমশক্তি, ধ্রুপদের উপর খুব অধিকার, রাগরূপের উপর বিরাট জ্ঞান এবং প্রাচীন ঘরাণার প্রাচীন গুণীব্যক্তিদের পরিবেশন পদ্ধতির সংগে পরিচয় না থাকলে শুধু আলাপেই নয়, শাস্ত্রীয় সংগীতের কোন শ্রেণীবস্তুই যথাযথ উৎপন্ন হবে না। দশ বছর বয়স থেকে আমি ভারতের প্রধান প্রধান স্থানের বড় বড় গায়ক-বাদকদের গান-বাজনা শুনে এসেছি, তাই জানি সঙ্গীতের বস্তু সমূহের সংগে কিরূপ সম্বন্ধ রাখতে হয় এবং অনুসরণ করে নিজের পরিচয়কে যথাস্থানে উন্নীত করতে হয়॥

জিজ্ঞাসা, 'ধ্রুপদ শিক্ষার প্রয়োজনীতার কথা এবং তার উল্লেখ বারবার করার প্রয়োজন ছিল কি? বললাম,—প্রয়োজন খুবই আছে বলে তাই বারবার স্থান বিশেষে উল্লেখ করতে হল। যেমন কানের কাছে ঠাকুর নাম শুনাতে হয়, বলতে হয়, 'গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম' বল। তবে এর শেষ মুহূর্ত কখনই হবে না, কারণ ধ্রুপদ হল রাগরূপের শাশ্বত নীতি ধারার বাহক।

প্রশ্নকর্ত্তা বললেন,—কিছুকাল আগে এক নামকরা লক্ষীছাড়া মাসিক পত্রিকায় ধ্রুপদের শবযাত্রা এঁকে ছাপান হয়েছিল। ধ্রুপদের মূর্ত্তিকে শবদেহের মত তৈরী করে তাকে চারজন বাহক নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে, তলায় লেখা ছিল "ধ্রুপদের শবযাত্রা।" উদ্যোগীদের নাম না থাকলেও আমরা বুঝে নিলাম তারা কিরকম দুরাচার ও পাষণ্ড।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিক্ষার আসল অভাব—

শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষায় আগ্রহ বেড়েছে সত্য, কিন্তু অনেকের মধ্যেই দেখা যায় এই বিদ্যা লাভের জন্য যে নিষ্ঠা, সংযম, একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও গুরুর প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি শ্রদ্ধা রাখার আবশ্যক, তার একান্ত অভাব। অনেকের মধ্যে টাকা দিয়ে শিখছি যখন তখন গুরুর প্রতি আর কোন কর্তব্য নেই, এই মনোভাব থাকার জন্য প্রকৃত পক্ষে কিছুই শেখা হয় না। কারো কারো আবার এমন মনোভাব থাকে, শিখতে এসে যেন গুরুকে ধন্য করেছে। এইসব সংবাদ যখন আমি পাই, তখন ভাবি এরা কি জন্য শিখতে আসে, এই জঘণ্য মন নিয়ে!

মনের প্রসারতা ও নিষ্ঠা এবং আদর্শের প্রতি লক্ষ্যের অভাব বশতঃ আমাদের দেশে প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণীশিল্পীরূপে গড়েওঠার সম্ভাবনা খুব কমে যাচ্ছে। যে কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা-সাধনা করে শিল্পীস্তরে পৌছেছেন তাঁরা প্রশংসার যোগ্য নিশ্চয়ই কিন্তু প্রকৃত বিদ্যার উপর দখলের অভাব যে যথেষ্টই থাকে তা বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা হয়ত

জিজ্ঞাসা,—সেদিন সিনেমায় 'যাদুভট্ট' দেখে মনে হল, আমি তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানি তার সম্পূর্ণ বিপরীত, কেবল কয়েকটা নাম ছাড়া। আপনি কি বলেন? বললাম, আপনার অভিমত সম্পূর্ণ সত্য। যদুভট্ট ধ্রুপদ ছাড়া অন্য কোন গান গাইতেন না। তার অন্যতম প্রমাণ, তিনি যতসংখ্যক গান রচনা করেছেন তা সবই হিন্দি ভাষায় ধ্রুপদাঙ্গের গান। সিনেমায় তাঁকে দিয়ে খেয়াল গাওয়ান, ষ্ট্রিট্ সিঙ্গারে পরিণত করা, যাত্রায় ঢুকান, কমরে জুতো বেধে দেওয়া, 'বাবুল্ মেরা' গান শুনিয়ে মুখ দিয়ে বলান 'এমন গান আর নেই', এসবই হয়েছে বাঁদরামীর চূড়ান্ত দেখিয়ে, কেবল বাকী থেকে গেছল যদুভট্টকে ঘাগ্‌রা পরিয়ে চাঁদনীচকে নাচান। এই পরিকল্পনাটি মাথায় ঢুকেনি তার কারণে মনে হয়, সে সময় আবগারীর দোকানে ধূম্র বস্তু পাওয়ার অভাব হয়ে গেছল। সিনেমায় 'বৈজু বাওরা' এবং তানসেনের চরিত্রকে এবং প্রকৃত পরিচয়কেও একেবারে জঘন্য করে মিথ্যার চিত্র আঁকা হয়েছে। ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে নসাৎ করে এ রকম বেপরওয়া বাঁদরামী কাণ্ড বোধহয় আমাদের দেশেই সম্ভব, বিশেষ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মনে করে নিয়েছেন, ভালভাবে গাইতে বাজাতে পারলেই যথেষ্ট, ওতেই যখন আমরা বাহবা ও অর্থ পাচ্ছি তখন আর বিশেষ কি দরকার!' কিন্তু এই মনোভাব আসলের ক্ষেত্রে মোটেই মূল্যবান নয়। কারণ প্রশংসা ও অর্থটাই সবচেয়ে বড় নয়, প্রকৃত বড় হচ্ছে সকলের কাছ থেকে গুণীর পরিচয়ে শ্রদ্ধা অর্জন। আশ্চর্য্য লাগে অনেকে এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিখতে এসে গুরুকে কিভাবে সম্বোধন করতে হয় তাও জানে না। গুরুর নাম উচ্চারণ করে শেষে 'দা' অক্ষর জুড়ে দেয়, যেন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক পাড়া-প্রতিবাসীর কোন এক ব্যক্তির মত। বলাই বাহুল্য এরূপ সম্বোধনে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মান্যের একান্ত অভাব থাকে; আদর্শ টোলের গুরু ও মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি যেমন ভক্তি মান্যের উপর সম্বোধন থাকে সেইরূপ সঙ্গীতের গুরুর প্রতি রাখতে হয়। ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে সঙ্গীত গুরুকে মাষ্টার মশায় এই বর্ণশঙ্কর সম্বোধনও কোন মতেই উপযুক্ত নয়, গুরু বলাই কর্ত্তব্য। গুরুজী বলে ডাকতে যাদের জিভে আটকাবে তাদের বুঝতে হবে এই বিদ্যা শিক্ষার মত মন তৈরি হয় নি। খাটি ইংরেজী কায়দায় বরং স্যার বলে সম্বোধনও ভাল। আমি পনেরো বছর বয়সের সময় ভালাইডিহাররাজার সঙ্গীত শিক্ষকের পদ পাই। সেখানের সকলেই আমাকে ওস্তাদজী বলে সম্বোধন করতেন। ১৯ বছর বয়সে পঞ্চকোট রাজার গায়ক হয়ে থাকার সময়ও ওই সম্বোদন পেয়েছি। কোলকাতার মণীন্দ্র কলেজের বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীরামপুর কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতর প্রধান অধ্যাপক সুকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি অধ্যাপক ছাত্ররাও গুরুজী বলে ডাকেন। দা' সম্বোধনের মধ্যে আর এক পক্ষেরও সঙ্গত বিচারবোধ থাকে না। দেখা যায় সব বিষয়ে বড়দরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেও কোন কোন বাক্তি, ডাকার সময় নামের পর 'দা' জুড়ে দেন। 'দা' কথার কোন মানে ও মূল্য আছে কি? বাবাকে, কাকাকে নামের পর 'বা' 'কা' বলে ডাকা চলে কি? শুধু দাদা বলে ডাকতে যদি মন না চায় তাহলে বরংনামের শেষে বাবু বলাই ভাল। সম্বোধনের বিষয় নিয়ে আর একটা কথা বলবার আছে, যদি দেখা যায় কোন ব্যক্তির জ্ঞান, বিদ্যাও প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষভাবে পরিচয় আছে, তাহলে তাঁর বয়স কম হলেও বয়স্ক ব্যক্তিদেরও তাঁর প্রতি ব্যবহারিক সম্বোধনে সতর্ক হওয়ার আবশ্যক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকে, বিশেষ করে সভা-সমিতি ও ক্ষেত্রবিশেষে। এ বিষয়ে একটা দামী কথা আছে,—"বয়সে ছোট যদি গুণে শ্রেষ্ঠ রয়, স্নেহ ও মর্য্যাদা দুই দিতে হয়।"

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা, কোন ব্যক্তি যদি শিখতে আসেন আর তাঁর বয়সের জন্য বা পদের জন্য যদি সম্মানসূচক সম্বোধন রাখতে হয় তাহলে তাঁর শিক্ষাগুরু হওয়া উচিত নয়, আপনি, আজ্ঞা, এ সম্বোধন গুরুপদের জন্য নয়; এই ব্যবহার দেখাতে গেলে গুরুকে লঘু হয়ে যেতে হয়, তাতে গুরুর পদ মর্য্যদা ও সম্মান ব্যাহত হয়। একটি মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল আমার কাছে শিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে বরাবর সম্মান দেখিয়ে ও আপনি বলে ডেকে এসেছি বলে, তুমি বলে ডাকা মনের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করবে; এজন্য আমি তাঁকে শেখাতে পারিনি। এই অসুবিধার কথা বলতে যদি ও তিনি বলেছিলেন, "আমি যখন ছাত্রী হতে যাচ্ছি তখন নিশ্চই আপনি সেই ভাবে স্নেহ সম্বোধন রাখবেন"। মোটের উপর শিক্ষা-গুরুকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পদের মর্য্যদা রক্ষায় সচেতন সব বিষয়েই থাকতে হবে। শিক্ষাগুরুর, জ্ঞান, পণ্ডিত্য, সাধনার সাফল্যতায় উচ্চস্তরে স্থান ও শিক্ষাকতায় দক্ষতা, এসবই আসল বড়ত্বের পরিচয়, বয়স যাই থাক না কেন। বশিষ্ঠমুণি রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে প্রধান হোতা রূপে যুবক ঋষ্যশৃঙ্গকে বরণ করেছিলেন তাঁর তপস্যা শক্তির যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে। এই সব মহৎ দৃষ্টান্ত আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভাব নেই। অভাব এখন মনুষ্যত্বের এবং স্বীকৃতি দেওয়ার। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলবার আছে,—গুরু শেখাচ্ছেন নীচে বসে, বা কোন শিল্পী সেইভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন, সেখানে পদ-মর্য্যাদায় যিনি যত বড়ই ব্যক্তি হোন তাঁকেও নীচেই বসতে হবে। কিন্তু দেখেছি এই শিষ্টাচারবোধ অনেকের মধ্যেই থাকে না। আর একটা কথা, যে কোন শিষ্যের যদি কোন আসরে সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকে এবং সেখানে তাঁর গুরুকেও উপস্থিত থাকতে হয়, তাহলে তাঁর সম্মান রক্ষার উপযোগী বসার ব্যবস্থা রাখা একান্ত বিধেয়। এই রকম সব ক্ষেত্রে ওই রকম ব্যবস্থা উচ্চ মর্য্যদা সম্পন্ন প্রত্যেক শিল্পীর জন্যেও রাখা একান্ত কর্ত্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এখন এবার এই প্রসঙ্গের শেষে একান্ত কল্যাণকামীর মত আমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই আবেদন রাখছি, তাঁরা যদি সত্যই এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকে লাভ করার জন্য আগ্রহী হন, তাহলে আমার এই নিবন্ধের বিষয়-বস্তুকে স্মরণে রাখবেন।

গুরুদের সম্বন্ধেও কিছু বলবার আছে,—আমার মনে হয় গুরুর যোগ্য কর্ত্তব্য পালনে আমাদের কিছুটা শৈথিল্য থাকে। ব্যবসাটাকে খুব বেশী ভাবা শিক্ষা গুরুদের জন্য নয়। সর্বদাই আগ্রহ রাখার আবশ্যক, যাঁদের যে বস্তু শেখাচ্ছি তাতে তারা তৎপরতার সহিত কত শীঘ্র কৃতকার্য্য হতে পারে, এবং তাদের নিয়তই উৎসাহ দিতে হবে এবং অন্যের কাছে উৎসাহ পাওয়াতে হবে। সর্বদা আগ্রহ রাখতে হবে বিদ্যা তাদের উপর উজাড় করে দেবার জন্য, তবেই আমাদের যোগ্য গুরুর পরিচয় থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু শিখিয়ে দিয়েই কর্ত্তব্য সমাধা হয় না, তাদের মনকে সব দিক দিয়ে নীতি ও কর্ত্তব্য পরায়ন এরং সুন্দর করে গড়ে তুলারও দায়িত্ব থাকে। তাদেয় শিষ্টাচারাদির ত্রুটি এবং যে কোন অন্যায় নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন মতেই বরদাস্ত করা উচিত হবে না, তাহলে উভয়কেই তার কুফল ভোগ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে কোন নামি ও মাণি সঙ্গীতজ্ঞের বিরূপ সমালোচনা বা নিন্দে যদি কোন শিক্ষক করেন তাহলে সেই শিক্ষকের কাছে শিক্ষাকরা কোনমতেই উচিত হবে না, বুঝতে হবে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির যে নিন্দা করে তার মনুষ্যত্বও জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই নেই॥

জিজ্ঞাসা,—হার্ম্মোনীয়ম যদি ত্যাগ করা হয় তাহলে নিজের গলার ওজনে তানপুরা কি করে বাঁধা সম্ভব হবে? বললাম,—প্রশ্নটা হাস্যকর, কারণ হার্ম্মোনীয়ম যন্ত্র আসার পরও এখনও বহুলোকে নিজেই নিজের ওজন মত তানপুরার সুর বেঁধে নেয়। যাইহোক,—পথটা বাত্‌লে দিচ্ছি;—গলায় সুর উৎপন্ন করে যদি দেখা যায় অন্ততঃ উদারার 'ধা' 'পা' এবং তারার 'গা' পর্য্যন্ত অক্লেশে আসছে তাহলে সেই উচ্চারিত সুরটি গলার ওজন মত হয়েছে বুঝতে হবে॥

(২) হার্ম্মোনীয়মের সাহায্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

বললাম,—একেবারেই ভাল নয়। যে যন্ত্রে রাগ হিসেবে শ্রুতির পরিবর্ত্তন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকৃত শিল্পী গড়ার উপযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন—

মনে সর্বদা সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটি উদয় হয়, তাহল, এখন শাস্ত্রীয়-সংগীত শিক্ষায় ডিগ্রি সর্বস্বই যে হয়ে দাঁড়াল তার পরিণামে কি অবস্থা ঘটবে? নানান পাঠক্রমের মধ্যে এই শিক্ষায় যেটুকু সময় ধার্য্য হয়ে বহু বিষয়কে ধরে এক সংগে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে, তাতে করে এই বিদ্যার কতটুকু জানার সম্ভাবনা থাকতে পারে? কাজেই খুব ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে,—উপস্থিত যাঁরা এখন এই বিদ্যার পরিচয়ে আমাদের দেশের গৌরব রক্ষা করেছেন, তাঁদের পরে কি তবে এই বিরাট শিল্প বিদ্যাকে রক্ষা না করে এবং গৌরব রক্ষাকারী শিল্পীর অভাবে সাধারণ শিক্ষকরূপে কতকগুলি করে ওই রকম ব্যক্তিরই সৃষ্টি হতে থাকবে? তা যদি না হতে দেওয়া হয় তাহলে দেশের সরকারকে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ এই শিল্প বিদ্যাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সরকারকে এই বিষয় বিশেষ ভাবে অবিহিত করা একান্ত আবশ্যক। আমার মতে পৃথক ভাবে এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া দরকার, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষালাভ করে উচ্চস্তরের শিল্পী ও জ্ঞাণী-গুণী হতে পারেন। এই সম্ভাবনা থাকবে যদি অন্ততঃ দশ বছরের পাঠক্রম থাকে এবং প্রতিভা সম্পন্ন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রত্যহ পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া এবং গুরুর সাক্ষাতে সাধনা করান হয়। প্রত্যেক দু'বছর অন্তর আসরের মত করে অভিভাবক ও বিশিষ্ট শ্রোতাদের কাছে শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে,—তাঁদের গানের গায়কী ও বাদন পদ্ধতি সন্তোষজনক বলে প্রমাণ রাখার জন্য। যাঁরা ধ্রুপদই শিখবেন তাঁরা ছাড়া অন্যদেরও দু'বছর প্রাচীন

হয়না, মীড়, আশ, গমক প্রভৃতি বস্তু প্রকাশ হয় না, সে যন্ত্র শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের জন্য একেবারেই নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—"বাক্স যন্ত্রটা এসে আমাদের খুব ক্ষতি করেছে—গানে স্বয়ম্ভরতার উপর। তাছাড়া কোলের কাছে রাখা ভব্যতা রক্ষা করে মোটেই মানায় না, পরিবেশ হাল্‌কা হয়ে যায়॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চারপদী ধ্রুপদ প্রত্যেক রাগের অন্ততঃ দু'তিনটি করে বিভিন্ন তালে শেখার ব্যবস্থা রাখার দরকার হবে। পাঠক্রমে থাকবে ঔপপত্তিক, পাখোয়াজ, তব্‌লা এবং কিছু ইতিহাস শেখানর ব্যবস্থা। আর থাকবে স্বরলিপি দেখে গীতাদি তুলা ও লেখা এবং রচনা শক্তির সামর্থ্য লাভের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা। এই রকম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে তবেই আমাদের দেশে ধারাবাহিক শিল্পী-গুণীর পরিচয় রক্ষা পাবে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পাঁচের বেশী কোন শ্রেণীতে থাকা যুক্তি যুক্ত হবে না। যাঁরা শুধু ধ্রুপদ বা খেয়াল শিখবেন তাঁদেরও দু'বছর সুরবাহার বা সেতারে তালিম নিয়ে আলাপ বাজাতে শিখতে হবে॥

সঙ্গীতে ও গীতে বাহা ও আহা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সঙ্গীতে ও গীতে 'বাহা'র বস্তু হল তার সুঠাম-সৌষ্ঠব আকর্ষণীয় গঠন মূর্তি ও শিল্পৈশ্বর্য্য রূপ, তাতে 'আহা' আসে, যখন সেই শিল্পৈশ্বর্য্যের মূর্ত্তি মধ্যে প্রাণবস্তুর সন্ধান থাকে। অর্থাৎ সঙ্গীত ও গীতের যে প্রাণবস্তু, সেই বস্তুর বিকাশ হলে তবে 'আহা' আসে। এক কথায়, 'বাহা' হচ্ছে শিল্প-শরীর, 'আহা' হচ্ছে তার প্রাণ।

মন্তব্য,—আমি আপনার সংগে যোগাযোগ রেখেছি বহু বছর ধরে। আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব বলেছিলেন, সত্যবাবুর খেয়াল গান শুনে ভারত-শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক বড় মহম্মদ খাঁ এর গায়কী ও তানাদির পরিবেশন মনে পড়ে গেল। এ রকম উচ্চ প্রশংসার বাণী আপনার কণ্ঠের আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতির উপর বরাবরই শুনে আসছি। আপনার গৃহে এসে বিখ্যাত সেতারী বলরাম পাঠক, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসিদ্ধ শরোদ বাদক শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় আপনার হাতে সেতারে আলাপ ও গৎ শুনে বলেছিলেন "এ সব জিনিস শুধু শুনবার নয়, বহু শেখবার আছে। ডান হাতের যে সব কাজ শুনলাম তা আমাদের ধারণায় ছিল না।" আমার খুব দুঃখ হয়, আপনার এই সব জিনিস কেউই রাখল না॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাহাকে আনতে হলে চাই শিক্ষা, নিষ্ঠাপুর্বক অধ্যবসায় এবং তপস্থার মত সাধনা। 'আহা'কে আনতে হলে থাকতে হবে প্রেম, ভালবাসা ও অনুরাগ। অবশ্য এই গুণবস্তুগুলি না থাকলে শিল্পসৃষ্টিও যথাযথ হবেনা। এখানে একটা কথা আছে, যদি ভাবাবোধ গানের ভাব বর্ণনা উত্তম থাকে এবং সহজ বোধগম্য হয় এবং কণ্ঠস্বর হয় সুমিষ্ট, তাহলে যে কোন শ্রেণীর গানে আহা এসে যায়। কিন্তু প্রকৃত 'বাহা'র বস্তু উপস্থাপিত করা যেমন শক্ত তেমনি তাকে উপলব্ধি করা আরো কঠিন। সেখানে 'আহা' থাকলে তাকে ধরা যাবে না, যদি না তার উপর যথেষ্ট জ্ঞান-বোধ থাকে। তবে একথা অতিসত্য, শিল্পের বিরাট রূপ ও কৃতিত্বের উপর আদর্শ অবদান যেখানে থাকে সেখানে আহা থাকেই, কারণ প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা দিয়েই গড়ে উঠে তার মূর্ত্তরূপ। তা যদি না হত তাহলে তার মুল্য বিশেষ কিছুই থাকত না। এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ,—সম্রাট সাজাহান যদি তাঁর প্রিয়তমা মমতাজের মৃত দেহকে শিল্পৈশ্বর্য্য মহলে শায়িত রেখে তাজ-মহল নামে পরিচিত না করে, সামান্য স্থানে কবরস্থ করতেন, তাহলে এত ভালবাসার 'আহা' রূপ কিছু থাকত কি? এই প্রমাণ ধরে সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই কথাই আসবে, সঙ্গীতের শিল্প সৌধ ও ঐশ্বর্য্য যদি না থাকে তাহলে ওই রকম শ্রেষ্ঠ পরিচয়ও কিছু থাকবে না। ওই থাকার মধ্যেই আছে প্রেম-প্রীতি-ভক্তি-ভালবাসা সব কিছুই 'আহা' রূপে মূর্ত্ত হয়ে॥

জিজ্ঞাসা,—বর্ত্তমানের বিলম্বিত একতাল সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

বললাম,—এই তালকে যখন হাতে তাল দিয়ে কেউ গান না, বা গাওয়া যায় না মনে করেন, তখন একে তাল নামে অভিহিত করা শাস্ত্রগত বিচারে কি করে চলে? দ্বিতীয়তঃ এই তাল এত বাদকাধীন যে, নিজস্ব বোধ রেখে তালের মাত্রাসীমাকে সঠিক ভাবে ধরে রাখার উপায় নেই। বাদক যদি কারচুপি করে কিংবা অন্যমনস্ক হয়ে মাত্রা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেয় তাহলে গায়ক ধরতে পারেন না। কারণ গায়ক কেবলমাত্র সমে আসার চারমাত্রা পুর্বে ঠেকার ঢেউটিকে লক্ষ্য করে গেয়ে থাকেন। যে উদ্দেশ্যে এই তালের প্রবর্ত্তন সেই উদ্দেশ্যও এখন তেমন নেই। অর্থাৎ এর গতিলয় এখন মধ্য-লয়ের তেতাল তালের মত এসে গেছে। সুতরাং নিয়ম-নীতি হীন এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোলকাতায় আগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

বাংলাদেশের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে ও সহরাঞ্চলে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চার যথেষ্ট পরিচয় থাকার কথা আগে জানিয়েছি। এই চর্চা কোলকাতাতেও বহু আগে থাকতে কিরূপ বিপুল আকারে ছিল, তা এখন হতে অর্থাৎ ১৯৭৭ সাল হতে, পঞ্চাশ বছরের মত আগে যখন 'আন্তঃকলেজ সঙ্গীতপ্রতি-যোগিতার' প্রবর্ত্তন হয়। তখন থেকে পরীক্ষক হয়ে দেখেছি বহু কলেজের অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে ধ্রুপদ, খেয়ালে'র প্রতিযোগী হতে। অন্য শ্রেণীর গানের তো কথাই নেই। বাদ্য যন্ত্রের পরিবেশনেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী থাকত। এই প্রতিযোগিতা সাত দিন ধরে চলত। তারপর ১৯৩৫ সাল থেকেই মনে হয় 'নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার' সৃষ্টি হয়। তাতেও বরাবর পরীক্ষক হয়ে দেখেছি প্রথম বর্ষেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন স্তরে বহু। মহিলা ও পুরুষ বিভাগে বয়স অনুপাতে তিন, চারটি করে স্তর থাকত। ধ্রুপদের প্রতিযোগীর সংখ্যা কম থাকত না, তবে উভয় গ্রূপের প্রত্যেক স্তরে খেয়াল গানের প্রতিযোগীর সংখ্যা পঞ্চাশ, ষাটটি পর্য্যন্ত থাকতে দেখেছি। কয়েক বছর ধরে সে এক বিরাট আকর্ষণীয় পরিচয়ের বস্তু হয়েছিল। উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা যে বহু ছিল তার প্রমাণও মিলত সেখানে তাঁদের উপস্থিতিতে। আমাদের

তাল শুধু বিলম্বিত গানের জন্য গ্রহণ করে থাকার আর আবশ্যক কই থাকছে? প্রত্যেক তালেই গানের মহড়ার পর ঘুরে এসে গানের প্রথম অংশকে গ্রহণ করার যে সুন্দর সুযোগ আছে—সুরের ছোট ছোট মালা গেঁথে সমের ঘট্‌টিতে অর্পণ করার জন্য, সেই সুন্দর ও আকর্ষণীয় বস্তুকে উপস্থাপিত করার উপায় ওই তালে নেই। সমের পর তান ধরলে তাকে গানের পরিচয় ও ভাব সম্পর্ক ছাড়িয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে দীর্ঘ পথ বেয়ে আটচল্লিশ মাত্রার শেষ সীমা পর্য্যন্ত। সুতরাং একে আমি নীতি নিয়ম বর্জিত এক অদ্ভুত সৃষ্ট তাল ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। অবশ্য নীতি নিয়ম এখন অনেক বিষয়েই থাকছে না॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তো কথাই নেই, তাঁরা নিজেদের ছাত্র-ছাত্রীকে যে সব গান শেখাতেন তা সবই তাঁদের গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করে, গ্রন্থ ধরে মোটেই নয়। তখন ভাতখণ্ডেজীর গ্রন্থের সন্ধান ও তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ শিক্ষকদের মধ্যে কা:রোরই করেনি, এবং তার আবশ্যকও হয়নি, কারণ তাঁদের গানের অভাব ছিল না। তাছাড়া গ্রন্থকে গুরু করে নিয়ে শিক্ষকতা করতে হবে এ রকম দুর্বল দুর্দ'শায় তাঁরা পতিত হন নি। সত্যকারের শিক্ষা গুরুর পরিচয় না থাকলে এবং তাঁর প্রদত্ত বস্তু না শেখালে গুরুর সম্মান ও নিজের যথাযথ পরিচয় যে থাকে না এই সত্যকে তাঁরা মেনে চলতেন, এজন্য মনের মধ্যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যেত॥

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞদের স্থান

কিছুকাল আগে একদিন ঘরওয়া আসরে অনেকগুলি বিশিষ্ট শ্রোতার সমক্ষে একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ব্যক্তি সঙ্গীতজ্ঞদের পদ মর্য্যাদা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আরম্ভ করলেন,—যাঁরা সহিত্যও কাব্য চর্চায় এবং বিবিধ বিদ্যার এক একটিতে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, এবং পেয়ে এসেছেন বিরাট সম্মান, সমাদর, শ্রদ্ধা ইত্যাদি, তাঁদের মত যাঁরা শাস্ত্রীয় সংগীতে উন্নীত এমন কি তার চেয়েও বেশী, তাঁরা কিন্তু সেরূপ পান না। এতে বড় দিক দিয়ে আমাদের মনের একটা অত্যন্ত অভাব থেকে এসেছে। আমাদের এই

জিজ্ঞাসা,—পশ্চিম ও উত্তর ভারতে বিধিবদ্ধ প্রণালীর উপর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার সে রকম সুব্যবস্থা না থাকায় তার অভাব পুরণের জন্য ভাতখণ্ডেজী বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং তাঁর সেই প্রচেষ্টা অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি শিক্ষারক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ পাঠক্রমের উপযোগী করে যে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন তা অনেকেরই শিক্ষকতায় উপকার সাধন করেছে। কিন্তু তাই বলে তাঁকে কি শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের জনক নামে আখ্যাত করা যায়? আপনার অভিমত কি? আমি বললাম,—যাঁরা ওই সম্বোধন রাখেন তাঁরা একান্তভাবে নিজের বিচারবোধকে সরিয়ে রেখেই জনক কথাটা উচ্চারণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়ে বিচার শক্তি যদি কিছুমাত্রও থাকত, তাহলে দেখতে পেতাম কাব্য, সাহিত্য এবং অন্যান্য বিদ্যার চেয়ে সঙ্গীতবিদ্যাকে যথাযথ ভাবে লাভ করতে হলে কিরূপ দুরূহ প্রচেষ্টা ও অনন্য সাধারণ শক্তি-সামর্থ্য লাভ করতে হয় এবং তার সঙ্গে জন্মাবধি প্রতিভা ও কর্ণেন্দ্রিয়ে সুরের উপর বোধ শক্তি থাকতে হয়। সঙ্গীতের মত সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপরই নির্ভরশীল। একমাত্র এরই সহায়তায় ক্ষুদ্র কণ্ঠনালীটিতে পরিমাপ মত ফুংকার দিয়ে প্রশ্বাসের সাহায্যে রাগ সংগীতের প্রত্যেক রাগের অনন্ত বৈচিত্র্য লীলা প্রকাশিত হতে থাকে। কি বিস্ময়কর ব্যাপার যে এর মধ্যে আছে সাধকদের কৃতিত্বের উপর, তার তুলনা অন্য কিছুতে কি পাওয়া যায়? এই কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে কণ্ঠ সংগীতের জন্য পেতে হয় সুকণ্ঠ, রাখতে হয় একান্ত নিষ্ঠা, অসাধ্য সাধনার মত সাধনা, কঠোর সঙ্কল্প, বড় গুণীর সান্নিধ্যে সর্বদা থাকার সৌভাগ্য লাভকরে শিক্ষা, একলব্য ও উপমন্যুর মত গুরু ভক্তি এবং ঈশ্বরের কাছে সর্বদা কামনা ও তাঁর উপর নির্ভরতা ইত্যাদি। এই গুলির প্রত্যেকটিই এই বিদ্যা লাভে অপরিহার্য্য। অন্য কোন বস্তুর চর্চায় এতগুলির অপরিহার্য্য প্রয়োজন মনে হয় থাকে না। শুধু তাই নয়, শিক্ষা গুরুর কাছে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সাহায্য পাওয়া যায় না। আজীবনই সাধনা করে যেতে হয়, বিশ্রাম বা অবসর নেওয়া নেই। তারের যন্ত্রের উপর অধিকার লাভের জন্যও ওই রূপ প্রয়োজন। কারণ ভালভাবে কণ্ঠ সঙ্গীতে তালিম না নিলে প্রকৃত গুণীশিল্পী হওয়া যায় না। আমরা কিছু সংখ্যক মানুষ গান-বাজনা শুনি ও ভালবাসি এই

করেন। জনকের অর্থে বলা হয়েছে, নিজস্তি জন বা জানি (জন্মান) অর্থাৎ যিনি জন্মদাতা। ভাতখণ্ডেজী যে রকম অনুরাগ ও আগ্রহ রেখে এর সুশিক্ষার প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, তা যদি তিনি এই বিদ্যাকে শিক্ষায় ও সাধনায় না আনতে পারতেন তাহলে কি তাঁর এ বিষয়ে যা কিছু অবদান তা রাখা সম্ভব হত? কখনই না। সুতরাং তাঁকে আমরা একমাত্র গ্রন্থ-প্রণেতা ও প্রচার কর্ত্তাই বলতে পারি। শাস্ত্রকারয়া রাগসংগীতের স্রষ্টা রূপে পরিচিত করেছেন দেবাদিদেবমহাদেবকে। যত্র তত্র জনক উচ্চারণ অস্থায়ী ভক্তিরই এক দুর্বল উচ্ছ্বাস॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পর্য্যন্তই, কিন্তু সত্যকারের বিচার শক্তি আমাদের কতটুকুই বা থাকে! এই থাকে না বলেই আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করতে পারি না। শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের উচ্চশ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের এক একটির উপর বিরাট দখলের কৃতিত্ব যে কতখানি এবং তাঁদের স্থান জনসমাজের কত উর্দ্ধে তা বুঝবার মত সামর্থ্যের এত অভাব যখন, তখন কোন কোন ব্যক্তির একাধারে শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীতের শ্রেণীগত গানে এবং বিবিধ যন্ত্রে যদি আদর্শ মূলক দক্ষতার পরিচয় থাকে এবং তার সংগে থাকে ক্রিয়াঙ্গে ও তত্ত্বাঙ্গের উপর গ্রন্থ রচনায় আদর্শগত পরিচয়, তাহলে সেই থাকার উপযুক্ত স্বীকৃতি ও সম্মানই বা কে দেবে? তবে আর কি হবে! আমাদের বিচার বুদ্ধি কি এমনি ভাবেই চলতে থাকবে?"

জিজ্ঞাসা,—আপনাদের ঘরাণার গুণীরা তাঁদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে প্রায় পাঁচ শতাধিক অপূর্ব বন্দেজযুক্ত প্রাচীন ধ্রুপদ ও অনুরূপ সংখ্যক খেয়াল, তৎসঙ্গে নানান শ্রেণীগত বহু গান এবং সেতার ও এসরাজের বহু সংখ্যক প্রাচীন যন্ত্রীদের রচিত গৎ স্বরলিপি সহ প্রকাশ করে গেছেন, শুধু তাই নয়,—আগেকার যুগের বিখ্যাত বাদকদের রচিত পাখোয়াজ ও তবলার বহু তালের উপর বহু সংখ্যক বোল দিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থও। যা আজ পর্য্যন্ত ভারতে কোথাও এরূপ সম্ভব হয় নি এবং হওয়াও অসম্ভব। কিন্তু এখন দেখছি এই সব অমূল্য সম্পদ প্রায় কেউই চর্চায় রাখছেন না। আচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর এবং কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থস্থিত গীতাদিরও ওই অবস্থা। কেন এই অবহেলা এল, এর কারণ কি? এ সবই কি লুপ্ত হয়ে যাবে?

বললাম,—বিচারবোধ, কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, মনুষ্য জীবনে এইসব মহান সংরক্ষিত-বস্তুর অভাব এখন কত বেশী হয়ে পড়েছে তা দেখছেন তো! সুতরাং আফ্-শোশ্ করে কোন লাভ নেই। আমরা নিজেদের বড় বস্তুকে, বড় ব্যক্তিকে স্বীকৃতি না দিয়ে এবং ত্যাগ করে যে আনন্দ পাই, সেরূপ আর কিছুতেই পাই না। এর প্রমাণের অভাব নেই॥'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয়

যে পৃষ্ঠায় আলাইয়া রাগের আলোচনায় স্বরগ্রাম সাধনার মধ্যে দিয়ে তার সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয় দিয়েছি. তারই প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীনকালের রচিত একটি স্বরগ্রাম তেতাল তালের উপর যা সংগৃহীত হয়েছিল যোধপুরের এক গায়কের কাছ থেকে সেই পূর্ব সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণুপুর ঘরাণায়, সেটি লিখে জানাচ্ছি। এই স্বর গ্রামটি তখনকার বিষ্ণুপুরের গায়করা প্রাতঃকালে স্বর সাধনার সময় প্রত্যহ গাইতেন, আমরাও গেয়ে এসেছি।

{ সা সা গা গা। মা মা পা পা। ধা ধা গা গা। পা পা ধা না।
স'-া-া স'া। না ধা-া পা। ধা-গা-া মা। গা-রা সা-া }। ধা না না ধা।
না না ধা পা। গা পা ধা না। স'া-া ধা ধা। র'া-স'া স'া। র্গা র্গা র'া স'া।
না র্সা র'া র্গা। র্মা-া র'া। র্পা র্মা র্গা র'া। র্সা না ধা পা। ধা গা-া মা।
গা রা সা॥ গা গা মা ধা। া গা-া মা। গা রা সা-া। ন্া ন্া সা রা।
গা-া সা রা। গা মা রা গা। মা পা মা গা। রা গা মা পা। গা মা পা ধা।
মা পা ধা না। পা ধা না র্সা। না ধা পা ধা। না র্সা া া। র্সা া র্সা না।
ধা না র'া া। স'া না ধা পা। মা গা া া। র্মা র্গা র'া না। স'া া া পা।
া মা গা রা॥ এই রাগটির এই স্বরগ্রাম প্রাচীন পরিচিতির উপরই শুধু নয়—তার সৃষ্টি তত্ত্বের তাৎপর্য্যেরও প্রামাণিক দলিল স্বরূপ। বিচার বিশেষজ্ঞদের কাছে সহজেই স্বীকৃত হবে এই স্বরগ্রামের অবরোহণের 'নি' গুলিকে কোমল করে গাইলে তার সামগ্রিক রূপের উপর অন্যায় আচরণ হবে। সুতরাং রাগের প্রকৃত পরিচয়কে নষ্ট করা কোন মতেই উচিত নয়। আগে যাত্রায় জুড়ির গায়করা আলাইয়া, ছায়ানট, কেদার, এই রাগগুলির সঠিক স্বরূপ গলায় আয়ত্তে আনতে পারত না। নীচের দিকের 'নি' গুলো কোমল করে ফেলত। যদি কোন শিক্ষার্থী এই রাগ-গুলিতে কোমল 'নি' লাগিয়ে ফেলত তাহলে সঙ্গীত গুরু তাকে ধমক্ দিয়ে বলতেন, "একি যাত্রার দলের ওই রাগ! পুরো 'নি' গলায় ঠিক করে তুলবার চেষ্টা কর।" এখন দেখছি যাত্রার সুরই সত্য হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে নামটাতে যাত্রার আলাইয়া, যাত্রার ছায়ানট এই ভাবে সম্বোধন থাকলেই সঙ্গত হয়॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তেতাল তালের উপর আজকাল আলাইয়া রাগের একটি খেয়াল গান শুনি; তার মহড়ার সুরের স্বরগ্রাম এইরূপ,—"গা গা। মা ণা ধা পা। ৷ পা ধা পা মা গা ৷ মা। রা গা রা গা...।" এই ধরণের। এই সুর ছায়া রাগের। প্রাচীন ধ্রুপদ খেয়ালে তার পরিচয় আছে। যে ব্যক্তি তাঁর রচিত গানে ওই রকম সুর সংযোজিত করে আলাইয়া নাম দিয়েছিলেন, তাঁর বর্ত্তমানের কোমল 'নি' দেওয়া আলাইয়ার উপরও কোন পরিচয় ছিল না—এ কথাই বুঝতে হবে। কিন্তু জেনে শুনেও যাঁরা ওই রকম সুরে রচিত গানকে আলাইয়া বলে মনে করেন, তাঁরা তা কি করে পারেন সেটাই গুরুতর আশ্চার্য্য। এ সম্বন্ধে এর বেশী আর কিছু বলবার নেই॥

জিজ্ঞাসা,—আপনাদের ঘরাণায় ধ্রুপদাঙ্গের গানে পাওয়া যায় মালকৌশে পুরো 'ধা' দিয়ে চন্দ্রকৌশ রাগের রূপ। সুতরাং সুরের এই পরিচয় অন্যান্য প্রাচীন ঘরণাতেও যে ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এখন দেখছি মালকৌশ রাগের কোমল 'নি' কে পুরো 'নি' করে তাকে চন্দ্রকৌশ বলা হচ্ছে। প্রাচীন রাগের ~~উপর চেহারার এই~~ আসল রূপের উপর এ রকম ব্যতিক্রম খেয়াল খুসীর উপরই যে হয়েছে, এ কথাই বলতে হয়। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

বললাম,—এ রকম পরিণতির বিষয় নিয়ে আগেই অনেক আলোচনা করেছি। যাইহোক্—এই রাগটির সম্বন্ধে আমার যুক্তিবদ্ধ মন্তব্য হল,—প্রাচীনকাল হতে ধ্রুপদের মধ্যে দিয়ে রাগ রূপের স্বরূপ পরিচয় যেভাবে থাকে তাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করাই বিধেয়। তাছাড়া পুরো 'ধা' যুক্ত 'চন্দ্রকৌশ'ই যে আসল তার স্বপক্ষে যুক্তি এই,—এখন বাগেশ্রীতে মা-ধা-নি-সা-নি-ধা, মা-ধা-ন্নি-ধা, এই স্বর যেভাবে ব্যবহার হচ্ছে সেই স্বরের সুররূপ কোত্থেকে এল? বলা হয় মালকৌশ থেকে কিন্তু সত্যই কি তাই? পুরো 'ধা' এর ব্যবহারে ও তার উপর স্থিতি দিয়ে সুরের সেই প্রভাবে তার ভাবরূপ যেভাবে প্রকাশিত হয়, সেখানে মালকৌশকে পাওয়া যায় কি? না—পুরো 'ধা' দিয়ে চন্দ্রকৌশের সুর রূপই সেখানে বিদ্যমান? নিশ্চয়ই বলতে হবে ওই আসল চন্দ্রকৌশেরই রূপ সেখানে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূজা পদ্ধতিতে রাগরূপ—

প্রথম অধ্যায়ের যেখানে বঙ্গদেশে রাগসংগীতে প্রাচীন পরিচিতির বিষয় লেখার মধ্যে কালিকাপুরাণোক্ত ৺দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে মহাসপ্তমীর দিনে নবপত্রিকা আনয়ানের পরেই মণ্ডপে অষ্টকলসের এক একটিকে গ্রহণ করে মন্ত্রের সংগে রাগ-তালের পরিবেশন ব্যবস্থার কথা জানিয়েছি, সেখানে সব রাগগুলির পরিচয় ভুল বশতঃ দেওয়া হয়নি, তাই শেষের এই পৃষ্ঠায় তুলে দিলাম।

(১) "মালব-রাগং বিজয়বাদ্যংকৃত্বা, গঙ্গাজলপুরিত ঘটেন। ওঁ সুরাস্ত্বাম-ভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম বিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ব্যোম-গঙ্গাম্বু-পূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥"

(২) "ললিত-রাগং দুন্দুভি-বাদ্যং কৃত্বা-বৃষ্টি জল-পূরিত ঘটেন। ওঁ মরুতস্ত্বা-ভিষিঞ্চন্তু ভক্তি মন্তঃ সুরেশ্বরি, মেঘাম্বু পরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু।"

(৩) "বিভাস-রাগং দুন্দুভি-বাদ্যং কৃত্বা, সরস্বতী-জল-পূরিত ঘটেন। ওঁ সরস্বতেন তোয়েন সংপূর্ণেন সুরোত্তমে বিদ্যাধবাশ্চাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয় কলসেনতু।"

উপস্থিত হয়। সুতরাং বিচারগত ভাবে দেখা যাচ্ছে মালকৌশে পুরো 'নি' দিয়ে চন্দ্রকোশ নামে পরিচিত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ওকে অন্য নামে পরিচিত করাই কর্ত্তব্য॥

আজকাল আবার দেখছি, কৌশিকী রাগে কোমল 'ধা' ব্যবহার হচ্ছে। এই রকম সব অঘটনের পাণ্ডারা হচ্ছে বর্ত্তমানের ঘরাণা সম্পর্কহীন ছন্ন-ছাড়া পশ্চিমী মূর্খ শিল্পীরাই। তারা যা খুসী বিতরণ করে যাচ্ছে, আর আমরা তাই সানন্দে গ্রহণ করে নিচ্ছি, আসলের সংগে যোগাযোগ না রেখে। কৌশিকী রাগের রূপ পরিচয়ে আছে, আসল বাগেশ্রীর পূর্বাঙ্গ এবং চন্দ্রকৌশের উত্তরাঙ্গের স্বরূপ। চন্দ্রকৌশের ওই অঙ্গের মা ধা নি ধা, ধ-ম-ধ-ন ধ, এই রকম সুর বাগেশ্রীর আসল রূপে ব্যবহার অতি অল্প হত। অধিক ব্যবহার রেখে কৌশিকীর রূপ তৈরি হয়েছিল। সুরের এই পরিচয় সমস্ত প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যে আছে। বেথিয়াঘরাণায় কানাড়ার রূপ ভাবের সম্পর্ক কিছু বেশী আছে, কিন্তু কোমল 'ধা' নেই॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৪) "ভৈরব রাগং ভীম বাদ্যং কৃত্বা সাগরোদকেন। ওঁ শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্ত লোকপালাঃ সমাগতাঃ সাগরোদক পূর্ণেন চতুর্থ কলসেনতু।"

(৫) "কেদার রাগম্ ইন্দ্রাভিষেক-বাদ্যং কৃত্বা পদ্মরজো মিশ্রিত জলেন। ওঁ বারিনাদেন পূর্ণেন পদ্মরাগ সুগন্ধিনা পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্ত নাগাশ্চ কলসেনতু।"

(৬) "বড়ারী রাগং শঙ্খ বাদ্যং কৃত্বা নির্ঝরোদক পূরিত ঘটেন। ওঁ হিমবৎ হেম-কূটাদ্যা অভিষিঞ্চন্ত পর্ব্বতাঃ নির্ঝরোদক পূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু।"

(৭) "বসন্ত রাগং পঞ্চ-শব্দ বাদ্যং কৃত্বা সর্ব্বতীর্থাম্বু পূর্ণেন ঘটেন। ওঁ সর্ব্বতীর্থাম্বু পূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরিং সপ্তমেনামভিষিঞ্চন্ত ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ।

(৮) "ধানসী রাগং বিজয় বাদ্যং কৃত্বা শুদ্ধজল পূরিত-ঘটেন। ওঁ বসবস্ত্বা-ভিষিঞ্চন্ত কলসেনাষ্টমেনতু। অষ্টমঙ্গল সংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোস্তুতে॥"

বাংলাদেশে রাগসংগীত চর্চার এই অপূর্ব পরিচয়টিও কয়েকশ' বছর আগেকার। এই পূজায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট পূজাবিধি পালন করতে হলে রাগ-রূপের পরিচয় ও সাধনা করা কর্ত্তব্য॥

এই দুর্গাপূজা পদ্ধতির পুঁথি আমি আয়ত্তে এনেছিলাম॥

ভারতের সঙ্গীত ভারতের সাধন, ভজন ও পূজা পাঠের অচ্ছেদ্য অংশ। শাস্ত্রকাররা বলেছেন,—

"গীতেন প্রীয়তে দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পার্ব্বতী-পতিঃ।
গোপী-পতিরণন্তোপি বংশ-ধ্বনি বশংগতঃ॥
সাম গীতি-রতো ব্রহ্মা বীণা-সক্তা সরস্বতী।
কি মন্যে যক্ষ গন্ধর্ব্ব-দেব-দানব-মানবাঃ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংক্ষেপে নিজ বংশের বর্ত্তমান পরিচয়—

অনেকেই বললেন, এই গ্রন্থে যখন বিষ্ণুপুর ঘরাণা শিল্পীদের যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করেছেন, তখন ঘরাণার ধারাবাহিকতার বর্ত্তমানের পরিচয়ে আপনার ও আপনার সন্তানদের পরিচয়াদি অনুল্লেখ থাকা মোটেই চলে না। তাঁদের কথা মতও বটে, তাছাড়া যে গ্রন্থ দুটিতে বিবরাণাদি দেওয়া আছে, সে গ্রন্থ দুটি বিক্রয়ের শেষ সীমায় এসে গেছে। পুর্ণমুদ্রণেরও সম্ভাবনা আর নেই, তাই এই গ্রন্থে ওই বিষয়ের পরিচয় কিছু দেওয়া হল। প্রথমতঃ আমারই বিষয় কিছু জানাই,—জন্ম তারিখ ইং ১৮৯৯। ১লা সেপ্টেম্বর। আমার মা অনেকের কাছে বলতেন, সুতিকাগার হতে বেরোবার পর থেকে আমি নাকি সুরের আওয়াজ কানে এলেই সেই দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম—শারীরিক নড়া চড়া বন্ধ করে।.........

দশবছর বয়সে পিতৃ বিয়োগ হল। পিতার কাছে প্রতিশ্রুতি মত মেজকাকা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর থাকার স্থান বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়ে পিতা, পিতামহের কাছে শিক্ষা প্রাপ্তির পরের স্তর থেকে অতি যত্নের সহিত প্রত্যহ শিক্ষা ও তালিম দিতে থাকেন। বিষ্ণুপুর ঘরাণায় সংগৃহীত শাস্ত্রীর সংগীতের ক্রিয়াঙ্গ বস্তু সমূহের তালিকা আগেই জানিয়েছি, তার প্রায় সমস্তই উক্ত গুরু আমাকে শিক্ষায় আয়ত্তে এনে দেন। আমি সেই সমস্ত বস্তু প্রত্যহ চারবার করে সাধনায় রেখেছিলাম,—একাধিকক্রমে প্রায় ষোল্ বছর ধরে।.........

কাশিম বাজারের (মুর্শিদাবাদ) মহারাজার ওখানে ৺অন্নপূর্ণা পুজা উপলক্ষ্যে ইং ১৯১১ সাল থেকে তিন-চার বছর ধরে বিরাট আকারে গান-বাজনার আসর হয়েছিল। পশ্চিমের ও বাংলাদেশের বড় বড় গায়ক-বাদকদের নিমন্ত্রণ করা হত। এই আয়োজনের ভার অর্পিত হয়েছিল রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের উপর। ইনি তখন উক্ত মহারাজার গায়ক এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের (বহরমপুরে) আচার্য্য ছিলেন। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রথম বর্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে যখন মেজকাকা সেখানে যান তখন আমাকে সংগে নেন। প্রথম দিনের আসরে রাত ১১ টার সময় গান শুনানর জন্য অনুমতি পেয়ে তানপুরা বাজিয়ে হাঁটু গেড়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বসে হিণ্ডোল রাগের আলাপ ও চৌতাল তালে গান গেয়ে, পরে খাম্বাজ রাগের ধামার গানে কতকগুলি তেহাই যুক্ত বাঁটের ক্রিয়া দেখিয়ে শেষ করি। সভাস্থ সকলের কাছে প্রচুর উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ হয়। মহারাজ বলেন—এই টুকু ছেলে সভা মাতানর মত করে এরকম ভাবে ধ্রুপদ গাইবে এ ভাবাই যায় না......।

সঙ্গত করেছিলেন ভারত বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক বৃন্দাবনের মাখললাল চৌবে। দু'দিনের আসরে খেয়াল গায়ক মজফ্ফর্ খাঁ, নসীর খাঁ প্রভৃতি প্রত্যেক গায়ককে শুধুমাত্র তানপুরা বাজিয়ে গাইতে দেখেছি। এখানে শেষের দিনে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দের উপস্থিতিতে সঙ্গীতজ্ঞদের এবং গোঁসাইজীর ছাত্র গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির ফটো তুলার সময় মহারাজা আমাকে ডেকে কোলের কাছে বসিয়ে হাত দুটি ধরে ফটো তুলিয়ে নেন। এ-ও এক মহাসৌভাগ্যের বিষয় হয়েছিল।.........

তের বছর বয়সের সময় নাটোরের মহারাজা আমার গান-বাজনা শুনবার জন্য এবং তাঁর পুত্র যোগীন্দ্রনাথকে শেখাবার জন্য রেখেছিলেন। শিক্ষার ক্ষতি হেতু ছ'মাসের বেশী থাকা সম্ভব হয়নি।

বাঙলা ১৩১৯ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয় চন্দ্র মহাতাব্ বাহাদুরের ব্যবস্থাপনায় অষ্টম সাহিত্য সম্মেলন হয়। দেশের সমস্ত বড় বড় ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সভায় আমার একদিন গান হয়। সকলে খুব উল্লাসিত হয়ে আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ প্রদান করেন এবং মহারাজ প্রদত্ত সুবর্ণ পদক সভাপতি স্বনাম ধন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমার গলায় পরিয়ে দেন আশীর্ব্বাদ সহকারে। ....

ইং ১৯১৮ সালে বাঁকুড়ায় লর্ড লিটনের আগমন উপলক্ষ্যে পঞ্চকোটের রাজা উপস্থিত হন। আমার পরিচয় পেয়ে এবং গান ও সেতার শুনে অতি যত্ন সহকারে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর বড় রাজকুমার কে শিক্ষাদানেও নিযুক্ত হই।

ইং ১৯২১ সালে কোলকাতায় এসে স্থায়ী ভাবে থাকা হয়েছে। এখানে এসে অল্পদিনের মধ্যে আমার পরিচয় বিস্তৃত হয় বিদগ্ধ সমাজে এবং জমিদার, রাজা, মহারাজা প্রভৃতির কাছে। তাঁদের অনেকের গৃহে এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তিদের গৃহে শিক্ষকতা করি। এই সুযোগ ও সম্মান-স্বীকৃতি বিপুল ভাবে পেয়ে এসেছিলাম স্বাধীনতার পর কয়েক বছর পর্য্যন্তও। তারপর অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশই শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগে ভাটা পড়তে লাগল। সঙ্গীতের ও সঙ্গীতজ্ঞদের স্থান হয়ে পড়ল প্রধানতঃ শিক্ষালয়ে ও নিজ নিজ গৃহে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর গৃহে ডেকে এনে মাঝে মাঝে আমার ধ্রুপদ গান শুনতেন। তিনি বলতেন ভালভাবে গাইতে পারলে এই গানই সবচেয়ে ভাল লাগে। শুনতেন প্রকৃত ভাবগ্রাহী শ্রোতার মত ধ্যানস্থ হয়ে। সে একদিন ছিল, দেখেছি শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে সব স্তরের বড় বড় ব্যক্তিদের মধ্যে বড় জিনিসের উপর কত বেশী বিচারবোধ ও অনুরাগ।

আগে বড় ব্যক্তিদের কাছে আমাদের কিরূপ সমাদর ছিল তার একটি শেষ উদাহণের মত পরিচয় তুলে ধরছি। কয়েক বছর আগে মাননীয় সত্য রঞ্জন দাস মহাশয় যখন বিশ্বভারতী শান্তি নিকেতনের উপাচার্য্য ছিলেন (ইনি পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও ছিলেন) তখন একদিন তাঁর কলিকাতাস্থ বাস ভবনে এসে আমার সহিত বিশেষ ভাবে সাক্ষাৎ কামনার জন্য আহ্বান করেন। সময়সূচীমত আমি উপস্থিত হয়ে চাকর মারফত্ কার্ড পাঠাতেই তিনি পাওয়া মাত্র দ্রুত পদে উপর থেকে নেমে এসে আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বসবার ঘরে একই কোচের ডান দিকে বসিয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা বলেন। বিদায়ের সময় গেট্ পর্য্যন্ত এসে কর-জোড়ে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানান। এই রকম ব্যবহার দেখাতে পারেন প্রকৃত বোধজ্ঞ মহৎ ব্যক্তিরাই। বছর পনের আগেও দেখেছি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে স্বরচিত সংগীতের গ্রন্থ পাঠানর পর তাঁরা অতি সত্বর প্রাপ্তি স্বীকার ও বিজ্ঞোচিত মন্তব্য পাঠিয়েছেন। 'সঙ্গীত-কাহিনী' নামে গ্রন্থটি যখন মাননীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরীরাণীকে পাঠাই তখন তিনি শান্তিনিকেতনের উপাচার্য্য। গ্রন্থটি পেয়েই আমাকে চিঠিতে জানান,—'গ্রন্থটি পেয়ে খুব খুসী হলাম, তাড়াতাড়ি প্রাপ্তি স্বীকার জানাচ্ছি, বইটি পড়তে একটু সময় লাগবে, উৎসর্গের লেখাটি বড় ভাল লাগল। মন্তব্য জানান সম্বন্ধে এটুকুই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলি, তোমার লেখা কারোর মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না... ।' লালগোলার রাজা রাও ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় ওই গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়ে খুব আনন্দিত হয়ে আমার বাসায় এসে উচ্চ প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিপিটি দিয়ে যান। কীর্ত্তনগীতিবিশারদ রায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুরকে আমার প্রণীত 'সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ' গ্রন্থটি পাঠাই। তিনি অতি শীঘ্র চিঠিতে জানান,— 'আপনার উপহৃত গ্রন্থটি পেয়েই নিবিষ্ট চিত্তে আগাগোড়া পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের জন্যই গ্রন্থটির বিশেষ প্রয়োজন আছে। গ্রন্থের গানগুলি শুনবার একান্ত বাসনা রইল... ।' খগেন বাবু তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমলা লেক্‌চারার' ছিলেন। বিখ্যাত ধ্রুপদী বিশ্বনাথরাওএর কাছে ধ্রুপদ শিখেছিলেন। কর্ত্তব্য পালনে এরূপ নিষ্ঠা ও মানবতাবোধের অভাব তখন ছিলনা।

এখনকার কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞকে আপন ভেবে আগ্রহের সহিত আমার বই পাঠিয়ে পেয়েছি লজ্জা, অর্থাৎ তাঁরা প্রাপ্তি স্বীকারও জানান নি। তাই ভাবি কত তফাৎ......... !

১৯২৩ সালে মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর তাঁর কাছে আমাকে রাখেন সব বিষয়ে ভাল ব্যবস্থার উপর। এখান হতে ১৯২৫ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে' উপস্থিত হবার নিমন্ত্রণ লিপি পেয়ে সেখানে যাই। সঙ্গীত সভায় আমার প্রথমদিন খেয়াল এবং দ্বিতীয়দিন প্রাতঃকালে ধ্রুপদ গান হয়েছিল। একদিন থাকার স্থান সেণ্ট্রাল হোটেলে পিতার সহিত শ্রীকৃষ্ণ রতন জনকর্ এসে উপস্থিত হন। আমি তখন গান সাধ ছিলাম। সময় বেলা ১০ টা। তাঁরা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আগ্রহ ভরে আমার গান শুনছেন দেখে ভেতরে আসবার জন্য আহ্বান জানাই। তাঁরা কাছে এসে বললেন 'একটু গান শুনান', আমি যতক্ষণ গাইলাম, দেখলাম তাঁরা প্রকৃত শ্রোতার মত মাথা নাড়তে লাগলেন। নাম পরিচয়ে পেলাম যা, তা আগেই জানিয়েছি। রতন জন্‌করের পরিচয় আমি আগেই পেয়েছিলাম ৺কাশীর কন্‌ফারেন্সে ভাতখণ্ডেজীর কাছে। সেদিন তাঁকে একটু গাইতে বলায় বলেছিলেন, আপকো পাস ম্যায় ক্যা গাউঙ্গা, আপতো গুণী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আদমী হ্যাঁয়...। জিজ্ঞেস করলাম এখানে কি করে আসতে পারলেন? বললেন, আজ সবেরমেঁ শোনা, কাল বিহানমেঁ এক কম উমের কা বঙ্গালী বহুত আচ্ছা মুলতান রাগপর খেয়াল গায়া, উসী লিয়ে হাম্‌লোগ খোঁজ করকে আয়া মুলাকাত করনে কো ওয়াস্তে, আওর কুছ ঘরাণা পরিচয় ভি জাননে কো বাসনা রাখকে...।' তাঁদের হিন্দীতে এবং আমার অনভ্যস্ত হিন্দীতে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হল। তাঁরা আমাদের ঘরাণার পরিচয় সবিশেষ পেয়ে খুব বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। রতনজন্‌করের বয়স তখন কুড়ি-একুশের মত হবে। ব্যবহার অতি নম্র ছিল।

এরপরে এলাহাবাদ, মজফ্‌ফরপুর (এখানে পরীক্ষকের পদও পেয়েছিলাম), আবার ৺কাশী প্রভৃতি স্থানের 'নিখিল-ভারত-সঙ্গীত সম্মেলনে' নিমন্ত্রিত হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে পেয়েছিলাম পূর্ণ মর্য্যাদা, স্বীকৃতি ও সম্মান।

মহারাজা প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং গোয়ালীয়রের মহারাজা আমার গান, বাজনা শুনে খুব খুসী হন।

একটা কথা,—কন্‌ফারেন্স হওয়া সম্বন্ধে যে সব স্থানের নাম করলাম তাতে ছিল না বাঈজীদের গান, তব্‌লার লহরা, এবং সারেঙ্গী বাদন।

কোলকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ের আই-মিউজ, এবং বি, মিউজের অধ্যাপকের পদলাভ ও প্রশ্নপত্রকারকের ভার পেয়েছিলাম।............ ব্রডকার্স্টিং কর্পোরেশনের একেবারে প্রথম সময় থেকে তারপর অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে সমানে ১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা এবং সেতারে (শেষের দিকে বাজাইনি) শীর্ষ স্থানের শিল্পীরূপে সঙ্গীত পরিবেশন করে এসেছিলাম। তারপর বাংলা খেয়াল গাইতে না দেওয়ার জন্য বেতার কেন্দ্রের যোগাযোগ থেকে সরে আসি।

বাংলা ভাষায় শাস্ত্রীয় সংগীত গাইতে না দেওয়ার বিষয় নিয়ে আমার পক্ষ অবলম্বন করে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকাতে প্রবল অন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অন্দোলনের যথার্থতা উপলব্ধি করে ১৯৬২ সালের ২২শে অক্টোবর বেতার সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারীদের রাষ্ট্রপতি রাধাকিষণের দ্বারা পুরস্কার বিতরণের দিনে সেই দরবার সভায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদানিন্তন বেতারমন্ত্রী ডাঃ গোপাল রেড্ডি ঘোষণা করেন "এখন হতে প্রত্যেকের আঞ্চলিক ভাষায় শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের শ্রেণীগত গান পরিবেশিত হতে পারবে যথাযথ রাগ-তাল-মান ইত্যাদি বিশুদ্ধ রেখে।" এই ঘোষণাকে রাষ্ট্রপতি স্বাগত জানিয়ে বলেন—"এই ঘোষণা অতি সঙ্গত, এর দ্বারা এই সংগীতের প্রচারও বিস্তৃতি ঘটবে, নিজের মাতৃভাষাছাড়া এ সম্ভব হতে পারে না...।" আমার চতুর্থ পুত্র নীহার রঞ্জন আলাপ ও ধ্রুপদে শীর্ষস্থান অধিকার করায় সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় বেতারমন্ত্রীর এই ঘোষণা দিল্লীর বেতার কর্ম কর্তারা গ্রাহ্য করলেন না। বেতারমন্ত্রীর ঘোষণা এবং রাষ্ট্রপতির অকুণ্ঠ সমর্থন বাতিল হতে পারে এই অভাবনীয় ব্যাপারের মূল কারণ যা, তাতে আমি মনে করি ওই কেন্দ্রের পরিচালকদের উদ্দেশ্য হল শাস্ত্রীয় সংগীতে হিন্দী ভাষার একাধিপত্য বজায় রাখার মধ্যে গোঁড়ামীর একচেটিয়া মনোভাব, যা অতিশয় নিন্দনীয়। এছাড়া আর সঙ্গত কারণ কিছুমাত্র নেই। উদার ও কর্ত্তব্য পালনের মনভাব থাকলে অন্ততঃ আমাকে দিয়েও তাঁরা দেখতে পারতেন টেপের সাহায্যে, বাংলা ভাষায় অতি উত্তম ভাবে খেয়াল ইত্যাদি শ্রেণীগত গান গাওয়া যায় কিনা। খুবই দুঃখের বিষয় শাস্ত্রীয় সংগীতে আমাদের মাতৃভাষাকে এঁরা আমল দিলেন না, আর আমরা নির্বিকার চিত্তে আত্মচেতনা হারিয়ে সহ্যকরে নিলাম। মহারাষ্ট্র ঘরাণার বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক বিশ্বনাথরাওএর বাংলা ভাষায় খেয়াল গান আছে রেকর্ডে। রেকর্ডে এমন সব প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির গাওয়া বাংলা খেয়াল আছে যা খাঁটি খেয়ালের মত, তত্রাচ বেতারকেন্দ্রে ঘোষণা করা হয় রাগপ্রধান বলে, যার কোন সঙ্গত অর্থ নেই, আছে কেবল শাস্ত্রীয় সংগীতে বাংলা ভাষাকে অচ্ছুৎ করে রাখবার প্রয়াস। সবচে বেশী আশ্চার্য্য লাগে, বাঙালী ঘোষক ঘোষিকাদের মুখে এই রূপ নামের ঘোষণা শুনে। চাকরী বজায়ের জন্য কি নিজের বিবেক ও আত্মচেতনাকেও পঙ্গু করে দেয়?

কি লজ্জার কথা, ভারতের মধ্যে যে ভাষা শ্রেষ্ঠ সেই বাংলা ভাষায় শাস্ত্রীয়সঙ্গীত যথাযথ পরিবেশিত হবে না এরূপ দুর্বল ও কদর্য্য ধারণা আমাদের মধ্যেও অনেকের আছে। কিন্তু যদি আমাদের দেশের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছাত্র ছাত্রীরা বলেন আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় রাগসংগীতের শ্রেণী গত গান শিখব এবং সোচ্চারে তাঁরা জানান বেতারে যথাযথ শ্রেণীগত নামে গাইতে দিতে হবে, তাহলে বিরূপ মনভাবাপন্ন শিক্ষকরা ও বেতার কর্তৃপক্ষ কি করবেন ?

আমার নিশ্চিত ধারণা আমার দেশের ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে এ দাবি একদিন আসবেই। এই নিষেধাজ্ঞা ও বিরূপ মনভাবের কথা যদি বর্ত্তমানের বাংলাদেশের মানুষরা শুনে, তাহলে আমার মনে হয় তারা অবাক ও লজ্জিত হবে।

বেশ কয়েক বছর আগে থাকতে ভারতের বহু বিশিষ্ট স্থানে আমি বাংলাভাষায় খেয়াল, ঠুম্‌রী, টপ্পা ও ভজন গান শুনিয়ে দেখেছি তাতে আসরে উপস্থিত থাকা হিন্দুস্থানী গায়ক ও বিশিষ্ট শ্রোতারাও শুনে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরা বলেছেন ভাবপূর্ণ নিজের ভাষা বলে তাই এত আবেগ মধুর হয়েছে।

১৯৭২ সালে বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে তিন মাসের জন্য পরিদর্শক অধ্যাপকের পদ পেয়ে সেখানে দ্বিতীয় দিনের আসরে শুধু বাংলা খেয়াল গেয়ে ছিলাম। সেখানের ডিন্ ধ্রুবতারা যোশী এবং অন্যান্য হিন্দুস্থানী অধ্যাপকরা শুনে বলেছিলেন—'আমাদের অতিশয় মুগ্ধ করেছে। গাইতে পারার উপরই সব নির্ভর করে।' ওখানের ওই হিন্দুস্থানী অধ্যাপকদের যদি এই মন্তব্য থাকে আর আমাদের যদি উন্নাসিকতা আসে তাহলে পরিচয়টা কি থাকছে ?

আমাদের দেশে বাংলাভাষায় রাগ সংগীতের প্রচার পরিচয় অল্পদিনের নয়, অন্ততঃ ছ'সাত শ' বছর আগে থাকতে তার প্রমাণ আছে। প্রাচীনকালের আমাদের একটি খাতা আছে তাতে বহু রাগের বাংলা গান আছে, দু'পদী ও চারপদী রচনায়। এই সব গান খেয়ালের মত গেয়ে এসেছেন, উর্দ্ধ হতে আমাদের বংশ পরম্পরার সন্তানরা। সুতরাং বাংলা খেয়ালের প্রবর্ত্তক এখনকার কেউই নন। বাংলা খেয়াল ইত্যাদি গানের প্রচার কামনা ও তার উপর কর্ত্তব্য পালন এখন সঙ্গীতজ্ঞদের কারোর মধ্যে তেমন দেখা যায় না। সমস্বরে বেতার কর্তৃপক্ষকে জানান কর্ত্তব্য বলে মনে করলেন না বেতার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিল্পীরা। তাঁরা গাইতে চান বা না চান অন্ততঃ সকলে মিলে গাওয়ার স্বীকৃতি তো আদায় করে নিতে পারতেন বিরাট ও মহান কর্ত্তব্য ভেবে!

... ...

আমার পরিচয়ের ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য,—চিকাগো (আমেরিকা) ইউনিভার্সিটি থেকে দু'জন ডক্টর অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা এসেছিলেন কোলকাতায়। তাঁরা বাংলাদেশের সঙ্গীত ঘরাণার সঙ্গীতাদি টেপের মাধ্যমে সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলেন। এখানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ মত আমার কোলকাতার বাস গৃহে আসেন। কিন্তু সে সময় আমি দেশে থাকায় তাঁরা বিষ্ণুপুরে যান এবং সেখানে চারদিন থেকে ঘরাণার তথ্যাদি ও ইতিহাস এবং আমার কণ্ঠের বিভিন্ন রাগের আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, তৎসহ টপ্পা, ঠুম্‌রী, সেতারের, এসরাজের আলাপ ও গৎ টেপে তুলে নেন। মন্তব্যে জানিয়ে যান অত্যন্ত খুসী ও সার্থকতার কথা। জার্মেন থেকে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার কোলকাতার বাসায় এসে অনুরূপ ভাবে সমস্ত টেপ রেকডিং করে নিয়ে যান। দিল্লী একাডেমী থেকে এখানের বাসায় উচ্চপর্য্যায়ের দুই ব্যক্তি এসে, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুম্‌রী গান টেপে তুলে নিয়ে যান। এঁদের কাছে এইসব গান আমি বাংলা ভাষাতেই গেয়ে ছিলাম—তাঁদের সম্পূর্ণ সমর্থন থাকায়।

শান্তিনিকেতনে পরিদর্শক অধ্যাপকের পদে থাকার সময় একজন লণ্ডনবাসী ইংরেজ ভদ্রলোক আমার থাকার স্থানে এসে আলাপ ও খেয়াল, টেপের মাধ্যমে তুলে নিয়ে যান।

১৯৭৫ সালের ৮ই নভেম্বর থেকে ১৮ই পর্য্যন্ত লণ্ডন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভারতীয় সংগীত বিভাগের পরিচালিকা শ্রীরাজেশ্বরী দত্ত কোলকাতায় এসে উক্ত ইউনিভার্সিটির নির্দ্দেশে তাঁর টালিগঞ্জ বাসভবনে দু'দিন ধরে সকাল ও রাত্রের রাগের আলাপ ও ধ্রুপদ, তৃতীয় দিনে খেয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রী ও ভজন, এবং চতুর্থ দিনে সেতারে ও এসরাজের আলাপ ও গৎ আমার পরিবেশনের মাধ্যমে টেপে তুলে নেন। তার সংগে আমার সমস্ত গ্রন্থও সংগ্রহ করেন। এইসব জিনিস উক্ত ইউনিভার্সিটিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংরক্ষিত ও অনুশীলিত হবে ব'লেছিলেন। ওইসব দেশের মানুষের এ বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ এসেছে সেরূপ আগ্রহ আমাদের বাংলাদেশে থাকলে অনেক গুণী সঙ্গীতজ্ঞের সাধনার বস্তু থেকে যেত।

প্রায় তিরিশ দশকের সময় থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে আমার এখানের বাসায় বহিরাগত বড় বড় গায়ক-বাদকরা এসে গান-বাজনা শুনে ও শুনিয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম, যথা,—কাশ্মীরের খেয়াল গায়ক—আশিক্ আলি খাঁ, বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্করের ছাত্র হংসরাজ, আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব ও তৎপুত্র আলি অক্‌বর । তখন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও আসতেন আমার গান-বাজনা শুনতে। দু'একবার বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এসেছিলেন।

১৯৭০ সালে তানসেন পাণ্ডের স্মৃতি সভায় উক্ত সত্যেন বসু মহাশয় সভাপতিত্ব করেছিলেন। তাঁকে মাল্য দান করার সময় বালিকাটির হাত থেকে মালাটি নিয়ে সভাপতি মহাশয় আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন— উপযুক্ত ব্যক্তিকেই পরিয়ে দিলাম। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং ধ্রুপদীদের মধ্যে ছিলেন,—দবির খাঁ, ফৈয়ুদ্দীন ডাগর, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, উদয় ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

কয়েক বছর ধরে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ ঘটাকরে জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। তার মধ্যে একবার মণীন্দ্র কলেজের বিরাট হলে তখনকার কোলকাতার মেয়র শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি হয়ে বিরাট ভাষণের মাধ্যমে আমাকে তিনি নিজস্বভাবে এবং কোলকাতা নাগরিকদের তরফ্ থেকে সম্বর্দ্ধনা জানান। এই সভায় পৌরহিত্য করেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সভাকে এবং আমাকে ধন্য করে-ছিলেন আমার গুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত হয়ে। বহু শিল্পী ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল।

১৯২২ সালে কবি কাজি নজরুল যখন বিষ্ণুপুর গেছলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তাঁর অগ্নিবর্ষি কবিতা ও গানের দ্বারা, তখন আমরা সকলেই দেশে ছিলাম গ্রীষ্মের ছুটিতে। থাকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংবাদ পেয়ে কবি খবর পাঠিয়ে জানালেন আমাদের বাড়ীতে এসে গান-বাজনা শুনবার জন্য। আমরা সাগ্রহে ও আনন্দের সহিত আমাদের চাঁদনী হলে আসরের ব্যবস্থা করলাম। সন্ধ্যায় এলেন, বহু লোকও তাঁর সংগে এল, আমরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানালাম। মানুষটির মধ্যে যেমন ছিল প্রচণ্ড বিপ্লবমুখী ও বিদ্রোহিতার নির্ভিক শক্তি, তেমনি অতি সুন্দর হয়ে ছিল শিশুর মত সরল ও সদা হাস্য মুখর মন। মেজকাকা প্রথমে ধ্রুপদ গাইলেন, তারপর সেজকাকা সুরবাহার ও সেতার বাজালেন. শেষে আমার খেয়াল গান হল তাঁর রাগ ফরমাসের উপর অনেকক্ষণ ধরে। দেখেছিলাম আমার খেয়াল গান শুনে খুব উল্লসিত হতে। অবশেষে তিনি শুনালেন ঘুমিয়ে পড়া জাতিকে তড়িৎ-শক্তির মত জাগিয়ে দেওয়ার মত করে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য তাঁর আগমণী কবিতার অগ্নিবর্ষি বাণী এবং ওইরূপ ধরণের দু'চারটি গান। তারপর তাঁকে অতি সাদরে আমরা বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে এক সংগে আহারে বসলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে হাস্য কৌতুকের মধ্যে দিয়ে আমাদের খাওয়া শেষ হল। সে আনন্দের স্মৃতি ভুলবার নয়। পরের দিন একটি ছেলেকে দিয়ে আমাকে তাঁর রচিত 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙ্গার গান' এই দু'খানি বই পাঠিয়ে দেন। একটিতে লিখে দিয়েছিলের শ্রদ্ধেয় সুরইন্দ্র শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্পিত হল, নীচে তাঁর স্বাক্ষর, আর একটিতে শ্রদ্ধেয় সুর সম্রাট লিখে দিয়েছিলেন। এই উপাধি পড়ে আমি বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এইসব বই বাজায়াপ্ত করে তল্লাসি চালানর জন্য আমি বই দুটি গ্রামের একজনকে লুকিয়ে রাখতে বলেছিলাম। তিনি এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, সেখানে বই দু'টি উই এর দ্বারা মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেছল। কবি নজরুল এত বড় হবেন জানলে বই দু'টি হাত ছাড়া কোনমতেই করতে পারতাম না, এখন আফ্‌সোস্ হয়। উক্ত কবি যখন মেগাফোন্ কোম্পানির পরিচালক হন তখন ট্রেনার ছিলেন গায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। একদিন কবি নজরুল আমার কোলকাতার বাসায় এসে বলেন,—আপনার দু'টো খেয়ালের রেকর্ড করা হবে। যথাদিনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাকে নিয়ে গেলেন, দু'টো খেয়াল গাইলাম দ্রুত অঙ্গের জৌনপুরী ও মারওয়া রাগে। কিছুদিন পরে কাজি সাহেব কাঁচা রেকর্ড দুটি হাতে দিয়ে বললেন—'এত তৈরি গলার রেকর্ড প্রকাশ করতে পারা গেল না, বিশেষ করে একজন খুব বাধা দেওয়ায়, তাই অত্যন্ত দুঃখের সহিত কাঁচা রেকর্ড দু'টো চেয়ে নিয়ে এলাম'। সেই রেকর্ড এখনও আমার বড় ছেলের কাছে আছে। কাজি সাহেবের মত মহৎ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিরাই দিতে পারে সঙ্গীতের এবং তার সাধকদের যথাযথ মর্য্যাদা।

পরিচয় প্রসঙ্গের শেষ স্তরে একটি অভাবনীয় ও চিত্ত-মনকে অশ্রুসজলে সিক্ত করে দেওয়ার সংবাদ না জানিয়ে পারলাম না। আমার পরমারাধ্য সংগীতগুরু আগায় মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জনকে চিঠির মাধ্যমে মন্তব্য প্রসঙ্গে জানিয়ে ছিলেন—"তোমার পিতার মত ব্যক্তিকে আমি মহাপুণ্য ফলে ভ্রাতষ্পুত্র রূপে পেয়েছি ..।" চিঠিটি পড়ে আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে কাতরকম্পে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল, মনে হয়েছিল তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলি—এ আপনি কি কথা লিখেছেন!! আমারই তো বহু তপস্যার ফলস্বরূপ আপনার মত গুরু লাভ হয়েছিল!—

বাড়ীর সকলে পত্রটি পড়ে বললেন,—"গুরুর এই রকম উক্তি, শিষ্যের শিক্ষা, সাধনা ও কৃতিত্বের উপর এক বিরাট আলোকপাত। শিষ্যকে প্রকৃত পক্ষে বুঝতে ওঁর মত আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ গুরুরাই পারে।"

আমার বাল্যকাল হতে ধারাবাহিক জীবনী সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠাব্যাপী 'সুরের পথে একটি জীবন' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ আরো কয়েকটি পরিচয় 'যুগান্তর' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত হল শেষের দিকে॥

আমার সন্তানদের পরিচয়,—আমার দুই কন্যা ও পাঁচ পুত্র প্রত্যেকেই অতি শৈশব থেকে শাস্ত্রীয়সংগীতে তালিম পেয়েছিল। শিক্ষা ও সাধনা লেখাপড়ার সংগে অব্যাহতভাবে থেকে এসেছিল। তাদের আগ্রহ ও উদ্যম ছিল যথেষ্ট।

বড় পুত্র অমিয় রঞ্জন এম, এ, পি, এইচ, ডি, (সঙ্গীতে সৌন্দর্য্যবোধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গবেষণায়) সঙ্গীতের ক্রিয়াঙ্গে কি রকম সুপ্রতিষ্ঠিত তা চর্চারত ও অভিজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দ মাত্রেই জানেন। উক্ত পুত্র 'রবীন্দ্রভারতীবিশ্ববিদ্যালয়ের' রাগসঙ্গীত বিভাগের কণ্ঠসঙ্গীতাধ্যাপক। কয়েক বছর আগে থাকতে বরোদা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি বড় বড় স্থানে উপযুক্ত ব্যবস্থা মত সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে প্রত্যেক স্থানেই খেয়াল গান পরিবেশন করে প্রভূত যশ, খ্যাতি লাভ করে এসেছেন। এই সব সংবাদ আমি সেই সেই স্থানের ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাই। প্রত্যেক স্থানে সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতারা বিষ্ণুপুর ঘরাণার গায়ন পদ্ধতির এরূপ উজ্জ্বল পরিচয় পেয়ে খুব আশ্চর্য হন এবং বলেন বাংলা দেশে এত বড় ঘরাণা আছে তা জানা ছিল না। প্রত্যেক স্থানে অমিয়রঞ্জনকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরাণার ইতিবৃত্ত জানাতে হয়। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি এবং বাদ্য যন্ত্রাদির চর্চার প্রাচীনত্বের ঊর্দ্ধ বর্ষ সীমার পরিচয় পেয়ে সেখানের লোকেরা বিস্মিত হন। বরোদার মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ অভ্যর্থনা জানানর ও গানের আসরের জন্য বিপুলভাবে আয়োজন করেন। বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দকে যে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হয়, তাতে অমিয়-রঞ্জনের ফটো এবং শিক্ষার পরিচয়ে পিতার নাম ও সামান্য ঘরাণার পরিচয় দেওয়া ছিল। এই সম্বর্দ্ধনার আয়োজন অভিভূত হওয়ার মত করে রচিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন বড় বড় স্থানে গানের জন্য অমিয় রঞ্জনের আহ্বান সমভাবে আছে। খেয়াল গানের উপর নিয়মিত বেতার শিল্পী, একথা প্রায় সকলেই জানেন। শ্রীমানের গবেষণার বিষয় বস্তুকে "সঙ্গীতের শিল্পদর্শন" নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ভারতের কয়েকটি বড় বেতারকেন্দ্র থেকে খেয়াল গান পরিবেশনের জন্য সাগ্রহ আহ্বান পেয়ে এই পুত্রকে যেতে হয়েছিল। সেই স্থানগুলির নাম যথা,—পুণা, নাগপুর, ধারওয়া, গোয়া এবং বম্বাই। অমিয় রঞ্জনের জন্ম সন ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী॥

মধ্যম পুত্র চিত্তরঞ্জন উচ্চ শিক্ষায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং কণ্ঠসংগীতের শ্রেণী-গত গানে ও শাস্ত্রবোধে বিশেষ পারঙ্গম। সরিষা, রামকৃষ্ণবিদ্যাপীঠের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গীতাচার্য এবং ডায়মণ্ডহারবার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। জন্ম সন ১৯৩৫ এপ্রিল ॥

তৃতীয় পুত্র মনোরঞ্জন দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, এবং বেতারকেন্দ্রের অফিসার ও উচ্চ মানের খেয়াল গায়ক ॥ জন্ম সন ১৯৩৭ মার্চ ॥

চতুর্থ পুত্র নীহাররঞ্জনও এম-এ, বি, টি। ১৯৬২—১৯৬৩ সালে বেতার সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংঙ্গীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করে। তার এখন খেয়াল গানের পরিবেশনে শ্রোতাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বেতারকেন্দ্রেও ওই গানের প্রোগ্রাম থাকে। জন্ম সন ১৯৪৫ ডিসেম্বর ॥

পঞ্চম পুত্র,—নিখিলরঞ্জন বি, এস-সি, অনার্স। রাশিয়ান ভাষায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত; এল, এল, বি, পরীক্ষায় শেষ বর্ষে উত্তীর্ণ এবং শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীতেও অধিকারী। জন্ম সন ১৯৫০ এপ্রিল ॥

বড় পুত্র অমিয় রঞ্জনের একমাত্র সন্তান শ্রীমান শান্তনু কলেজে অধ্যয়নরত এবং সমভাবে গানের চর্চাতেও অগ্রসর হচ্ছে। জন্ম সন ১৯৫৯ এপ্রিল ॥

পরিশেষে—আমার পুত্রদের নিজগৃহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অনেক। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই লোককে শোনাবার উপযোগী হয়ে উঠেছেন। অমিয়রঞ্জনের বহুদিন আগে থাকতেই বেতারকেন্দ্রে খেয়াল গানের শিল্পীরূপে ছাত্র-ছাত্রীরা স্থান পেয়ে ক্রমশঃই তার সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। আমার পুত্রদের বাছাই করা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এবং আমরা ঘরাণা বংশের যে কয়জন আছি, সমবেতভাবে যদি গান-বাজনা শুনানর জন্য আসর করা হয় তাহলে চার পাঁচদিন ধরে বিষ্ণুপুর ঘরাণার কনফারেন্সের মত হয়ে ঘরাণার বিরাট পরিচয় থাকবে এবং প্রমাণিত হবে সব বিষয়ের উপর প্রকৃত ঘরাণার পরিচয় এখনও একমাত্র বিষ্ণুপুরেই আছে।

বাস্তব পরিচয়ের সংগে সম্পর্কহীন হয়ে থাকা কিছু লোকের ধারণা বিষ্ণুপুর ঘরাণা শুধু ধ্রুপদ গানের জন্য। কিন্তু তা যে নয়, তা আমার এই গ্রন্থের লেখা পড়লে সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হবে।

—শেষ—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিচয় ও মানপত্র

১। ১৯৫১ সালের ৩১ মার্চ শনিবার 'যুগান্তর' দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ফটো সহিত আমার যে পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে উদ্ধৃত।

(শিল্পী পরিচয়)

উচ্চাঙ্গ সংগীত সাধক শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(নিজস্ব প্রতিনিধি লিখিত)

"স্বদেশী যুগের সময়কার কথা। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ তখন ভারত পরিদর্শনে এসেছেন। অন্যান্য বিষয় দেখা শুনার পর তিনি ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বড় লাটের দরবারের কর্ম কর্ত্তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে তখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ছয় জন শিল্পীকে দিয়ে যুবরাজকে ছয়টি রাগে ভারতীয় সংগীত শোনাবার ব্যবস্থা হয়। এই ছয় জনের মধ্যে তিন জন নির্বাচিত হলেন বাংলাদেশ থেকে। একজন তখনকার সঙ্গীত জগতের দিকপাল পরলোক গত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, দ্বিতীয় স্বনামখ্যাত সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃতীয় শিল্পী তেইশ বর্ষ বয়ক্রম একজন তরুণ বাঙালী। কেতা-দুরস্ত আমীর ওমরাহের দল প্রিন্সের কাছে তাঁর পরিচয় করিয়েদেন—"বাঙ্গলার নয়—ভারতের উদীয়মান তরুণ শিল্পী সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—গোপেশ্বর বাবুর অগ্রজ শ্রীপতিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র।"

... ...

সেছিল এক সময়। সে যুগে সত্যকিঙ্কর ছিলেন ভেলাইডিহা, পঞ্চ-কোটরাজ ও লালগোলাধিপতির সভা গায়ক। পনের বছর বয়স থেকে শিল্পী জীবনের প্রধান একটা সময় তাঁর কেটেছে এমনি রাজদরবারে। কিন্তু তারপর দিনে দিনে রাজাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাবার সংগে সংগে তাঁদের সভা গায়কদের জীবনে এসে পড়ে একটা অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন। রাজ দরবারের শিল্পী তখন নূতন করে মন দিলেন বাইরের বিরাট বিপুল জন সমাজের মনোরঞ্জনে ও তাঁদের মধ্যে শিল্পানুরাগ সৃষ্টির জন্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সে যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত গত ত্রিশ বৎসর ভারতের বহু সংগীত সম্মেলনে সত্যকিঙ্কর বাবু নিমন্ত্রিত ও বহু ভাবে সম্মানিত হয়েছেন, কিন্তু জীবন ব্যাপী এই সম্মান ও গৌরবের প্রস্তাবনা যে বাল্য জীবনে হয়েছিল এখানে তার কিছুটা উল্লেখ দরকার।

শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় প্রথম জীবনে সত্যকিঙ্কর বাবু পালিত হন পিতামহের কাছে। এদিকে এই দুর্ভাগ্যের সংগে সংগে যে বিরাট সৌভাগ্য নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তা হচ্ছে বিষ্ণুপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সুপ্রাচীন ঘরাণার উত্তরাধিকারিত্ব ও তারই সংগে অসাধারণ প্রতিভা।

পিতামহ রামকুমার ছিলেন সঙ্গীত সাধক; স্নেহের পৌত্রটিকে দু'তিন বছর বয়স থেকেই মুখে মুখে গান শেখাতে আরম্ভ করেন। শ্রোতা প্রথমে বাড়ীর আত্মীয় পরিজন, তারপর প্রতিবেশিরা ও তারপর এ গ্রাম ও গ্রামের ছোট খাট আসরের গায়ক বাদকেরা। কিন্তু সঙ্গীত নিয়মিত শিক্ষা ও সাধনা আরম্ভ হয় দশ বছর বয়সে পিতৃ বিয়োগের পরই মেজকাকা গোপেশ্বর বাবুর কাছে, বর্দ্ধমানে তাঁর নিকট থেকে।

প্রায় এক বৎসর শিক্ষার পর এই বালক দেশের নানান জায়গায় জলসা প্রভৃতিতে ধ্রুপদ, খেয়াল গেয়ে প্রথম গায়ক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় পিতামহ ও গোপেশ্বর বাবুর সংগে ভারতের সমস্ত জায়গায় ভ্রমনের সংগে সংগে তিনি পশ্চিমের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়কদের গান শোনার এবং নিজের গান তাঁদের শোনাবার সুযোগ পান।

প্রত্যেক শিল্পীর জীবনে প্রতিভার বিকাশের যে একটা মহেন্দ্রক্ষণ আসে, সত্যকিঙ্কর বাবুর বোধহয় তা আরম্ভ হয়েছিল বারো বছর বয়সে। কোলকাতায় সে সময়কার শিল্পী প্রতিষ্ঠান "সঙ্গীত সঙ্ঘের" বাৎসরিক উৎসব। সভাপতি নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ রায়। সেদিন এই বারো বৎসর বয়স্ক বালকের গান শুনে সভাপতি বলেছিলেন, "আজ আবার সেই পুরাণো দিনের যদুভট্টের কণ্ঠ ও তাঁর ধ্রুপদ গানের গায়কী মনে পড়ে গেল। মনে হচ্ছে যদুভট্ট বুঝি আবার নূতন করে জন্ম নিয়েছেন।" সেই বছরেই ভাগলপুরে এক বিরাট জলসায় সে সময়কার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধুরন্ধর পাখোওয়াজী শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র এই বালকের সংগে সঙ্গত করেন। ধ্রুপদ ও ধামারে ঐ বালকের অতীত-অনাঘাত, বাঁট ও ছন্দের অদ্ভুত খেলার সংগে সংগে সুরের বৈচিত্র্য দেখাবার পর পশ্চিমের ওস্তাদের মধ্যে গানের Prodigy বলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

পুরাণো দিনের কথা বলতে গিয়ে সত্যকিঙ্কর বাবু বলেন; সে সব সময়ের কথা ভাবলে একটা জিনিষ যা সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে তা হচ্ছে সব জায়গাতেই গান শুনে শ্রোতাদের মধ্যে একটা বিস্ময়ের ভাব। জীবনে এ অভিজ্ঞতার বার বার পুনরাবৃত্তি ভালো কি মন্দ তা জানি না, তবে বাল্যে ও কৈশরে লোককে চমৎকৃত করার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিজেও যেন বেশ একটু সচেতন ছিলাম। মাঝে মাঝে দু'একটা আস্পর্দ্ধার কাজও যে করিনি তা নয়। একবারের কথা বলি; মেজ কাকার কাছে তখন গান শিখতে সুরু করেছি। একদিন শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্বরলিপি করা একটা গান তাঁর মাসিক পত্রিকা 'সঙ্গীত প্রকাশিকায়' বেরোয়, আমি সেটার যথাযথ স্বরলিপি করে সোজা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম, এই দাবি করে যে, এটা তাঁর স্বরলিপির চেয়ে ভালো হয়েছে। স্বরলিপিটার মধ্যে আমার বয়সের পরিচয় না থাকলেও আমার হস্তাক্ষর ও চিঠির ভাষার মধ্যে তা বেশ ভাল ভাবেই ছিল। কিন্তু আমার অদৃষ্ট ছিল ভালো। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু খুব অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু সুর-শিল্পীকে আর কিছু না লিখে লিখলেন শুধু মেজ কাকার কাছে। জানতে চাইলেন ঐ স্বরলিপি সত্যই কোন বালকের কিনা। এ সন্দেহ ভঞ্জন করলেন খুব শীগ্‌গীরিই তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনে।"

সত্যকিঙ্কর বাবুর পূর্ণাঙ্গ কর্ম জীবন আরম্ভ হয় সতের বছর বয়সে, যখন তিনি লালগোলার মহারাজার নিকট প্রথম কার্য্য গ্রহণ করেন। সে কাহিনীর মধ্যেও ছিল কিছুটা অসাধারণতা। লালগোলাধিপতি রাজারাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেন একজন "অতি সুদক্ষ প্রবীণ গায়ক ও বাদকের" জন্য। গোপেশ্বর বাবুর আদেশে সত্যকিঙ্কর বাবু মহারাজের কাছে যান গায়ক ও যন্ত্রী হিসাবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেবার জন্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরবর্ত্তীকালে সেতার ও অন্যান্য যন্ত্রে অপূর্ব পারদর্শিতার জন্য তাঁর যে খ্যাতি হয়েছিল, এই সময় সেদিকে অগ্রগতির অনেকখানি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মহারাজা এ সব কিছুই জানতেন না। বালকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিতান্ত কৌতুহলবশেই তিনি তাঁর গান ও বাজনা শুনতে চাইলেন, হয়ত বা ছেলেটির সাহস দেখেই অবাক হয়েছিলেন তিনি। সে যাই হোক, এই সাক্ষাৎকার আর তারপর রাত্রের আসরে গান বাজনার ফল হয়েছিল সেই রাত্রেই সত্যকিঙ্করের লালগোলায় গায়কের পদ লাভ। এখানে তিন বছরের কাছাকাছি থাকার পর তিনি পঞ্চকোটের রাজার প্রধান গায়করূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে ১৯১৯ সালে 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের' ৺কাশী অধিবেশনে যোগ দিতে যান। সেখানে সত্যকিঙ্কর বাবু শোনালেন ধ্রুপদ গান ও সেতার বাজনা। ধ্রুপদে দ্বিতীয় হন দু'জন এক সঙ্গে—আলাবন্দ খাঁর খ্যাতনামা পুত্র নাসিরউদ্দীন ও সত্যকিঙ্কর বাবু। সেতারে প্রথম হন দু'জন একসঙ্গে—এনায়েৎ খাঁ ও সত্যকিঙ্কর।

লালগোলায় সত্যকিঙ্কর বাবু যখন সংগীত সাধনা করতেন, শুধু গান ও সেতারে তাঁর আশা মেটেনি। মাথায় নেশা চেপে গেল অন্য সমস্ত বাজনাও তিনি আয়ত্তে আনবেন। আর এ বিষয়ে ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। একবার এক মজার ব্যাপার দেখা গেল। মহারাজার ইচ্ছে হল খুব ভাল বাঁশী তিনি শুনবেন; কিন্তু বেশী দিন অপেক্ষা করলে হয় তো আগ্রহ আর বেশী দিন থাকবে না। সভাগায়ক তখন তাঁর কাছে সাত দিনের সময় চেয়ে নিলেন। ভাল নতুন বাঁশী কেনা হোলো এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর ঘরের দরজায় কপাট পড়লো। প্রথম দু'দিন ধরে চললো ফুকার-গুলোর উপর আঙ্গুলের চাপ দিয়ে ফুৎকারের সাহায্যে হাত সাধা; তারপর তিন দিন পর বিস্তার। ষষ্ট দিনে সঙ্গতকারের ডাক পড়লো; ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন ধরে অভ্যাস হলো এবং শেষের দিন রাত্রেই বাজনার demons-tretion, মহারাজ পুলকিত হয়ে বললেন, "এ ব্যাপার মন্দ নয়, সাত দিনের মধ্যেই বিনে মাইনের একজন প্রথম শ্রেণীর বাঁশী বাজিয়েকে পেয়ে গেলাম।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইভাবে ক্রমে ক্রমে যে কয়টা বাজনা তিনি আয়ত্ত করলেন তা হচ্ছে; এসরাজ, ব্যাঞ্জো, বাঁশী, জলতরঙ্গ, বীণ, সুরবাহার ও পাখোয়াজ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এগুলো ভাল করে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি আয়ত্তে আনেন নি। শেখার আগ্রহের পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল "না শেখা থাকবে কেন? এ যেন প্রতিভার বিজয় কেতন উড়িয়ে একটার পর একটা দুর্গ দখল করার আনন্দ। এ শিক্ষার ফলও হলো এই যে অবহেলা করে এগুলোকে একটার পর একটা তিনি ছেড়ে দিতে লাগলেন। এখন গানের আসর প্রভৃতিতে যন্ত্রের মধ্যে এক মাত্র সেতারই তিনি শুধু বাজান। কিন্তু তাও এই যন্ত্রটার প্রতি তাঁর ব্যবহার নিতান্তই বিমাতা-সুলভ। অনুষ্ঠান সূচির মধ্য থেকে কোন অজুহাতে সেতার বাজনাটাকে বাদ দিতে পারলে তিনি যেন বেঁচে যান। এর কারণ তাঁর মনে যেন একটা আশঙ্কা—পাছে গায়ক হিসেবে খ্যাতির চেয়ে যন্ত্রী হিসেবে নামটা তাঁর বড় হয়ে উঠে। এ নিয়ে ছাত্র কিংবা তাঁর অনুরাগীরা কোন অভিযোগ করলে ওস্তাদ প্রসন্ন মুখে হেসে বলেন, "এ তো হতেই পারে; যন্ত্রের থেকে যে সুর উঠে তার চেয়ে নিজের কণ্ঠের সুরের উপর মমতা মানুষের বেশী হবে এই তো স্বাভাবিক। আর তা ছাড়া কণ্ঠের বিচিত্র সৃজনীশক্তি যন্ত্রের মতো অতোটা সীমাবদ্ধ নয়।"

গানে সত্যকিঙ্কর বাবু নিজেকে ধ্রুপদী বলতে বেশী ভালবাসেন। এর কারণ, বোধ হয় প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরের ঘরাণা ধ্রুপদের জন্য বিখ্যাত; আর দ্বিতীয়তঃ আজকাল ধ্রুপদ গানের প্রচলন দিনে দিনে কমে যাচ্ছে দেখে তিনি যেন নিজের সবটা ওজন দিয়েও তাকে যথাসাধ্য বড় করে তুলে ধরতে চান। টপ্পাতেও তাঁর স্বকীয়ত্ব ও বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আসলে তাঁর গানের পরিপুর্ণ দীপ্তি ধরা পড়ে খেয়ালে। রাগ শুদ্ধি ও রাগের মহিমাময় মুর্ত্তি প্রকাশকেই তিনি গায়কের শ্রেষ্ঠতার মান বলে ধরেন। তিনি বলেন,—মোটা তুলির আঁচড়ে যে কি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায় তা কি সাধারণ সঙ্গীত রসিকরাই সবখানি বুঝতে পারেন?"

মোটা তুলির টানের এই বিস্ময় সত্যকিঙ্কর বাবু সৃষ্টি করতে পারেন। গানে তাঁর নিখুঁত গায়কী 'দাপটী' ভাবেরবন্দেজ যা কেবল পুরাণো ঘরাণা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থেকেই আসে—দুর্ধর্ষ লয়দারী আর সকলের শেষে অপূর্ব অলংকরণ—ক্ষমতা সম্পন্ন বিচিত্র তানের সমাবেশ। এ যেন গানের পরম সুন্দর মূর্ত্তি রচনা করে তার মাথায় নানা কারু কার্য্যের সোনার মুকুট পরানো। তাঁর গানে তানের সমাবেশ দেখে বোদ্ধা শ্রোতার শুধুই মনে হবে ভারতের সকল স্থানের সমস্ত বৈশিষ্টপূর্ণ তানের যেন একটা চিত্র প্রদর্শনী।

এই প্রসঙ্গে সত্যকিঙ্কর বাবুর সেতার বাজনা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। সেতারে তাঁর ষ্টাইল প্রচলিত আজকাল সাধারণ ষ্টাইল থেকে আলাদা। বীণবাদনের পদ্ধতি এতে বিদ্যমান। নীতিসঙ্গত প্রথায় আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আভোগের উপর যেরূপ সবিস্তার পদ্ধতিমূলক নিখুঁত আলাপ বাজান সেরূপ পদ্ধতির উপর বাদন ক্রিয়ার পরিচয় তেমন ভাবে কারো কাছে আজকাল পাওয়া যায় না, একথা অনেকেই বলেন। দুই আঙ্গুলে মেচরাফ্ পরে ডান হাতে তিনি যে সব আশ্চর্য্যকর ও মনকে মোহিত করে দেওয়া বিভিন্ন প্রকারের ঝালার সৃষ্টি করেন তা একমাত্র তাঁর কাছেই থেকে গেছে।

একবার বেতারকেন্দ্রে সেতার বাজনার একটা অনুষ্ঠান শেষ করে সত্যকিঙ্কর বাবু বেরোতে যাবেন এমন সময় তিনি খবর পেলেন কে তাঁকে টেলিফোনে ডাকছে। ভদ্রলোক সত্যকিঙ্কর বাবুর পরিচিত নন; তিনি জিজ্ঞেস করলেন "দাদা, বাজনা যা বাজালেন সেটা কি যন্ত্রের?"

যন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "প্রোগ্রাম ছিল কিসের?"

"সে তো সেতারের।"

"তাই তো বাজলো।"

"সঙ্গে আর কোন যন্ত্রই বাজান হয়নি?"

"আজ্ঞে না।"

ভদ্রলোকের বোধহয় বিশ্বাস হোলো না। বাঙালী ওস্তাদের সততা সম্বন্ধে একটা অস্ফুট কটুক্তি করে তিনি টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

সত্যকিঙ্কর বাবুর সম্বন্ধে আর যে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার সে হচ্ছে এই যে সাফল্যময় জীবনে পঞ্চাশোর্দ্ধে উপনীত হয়েও আজ এই শিল্পীর মনে আনন্দ নেই। এর একটা কারণ, আজও বাংলার সঙ্গীত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসিকদের মধ্যে তিনি প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেখতে পান না। তিনি বলেন—প্রকৃত সঙ্গীত রসিকরা যাঁরা, তাঁদের বিচারশক্তি ও রসবোধের মান থাকবে নিজেদের মনে, অন্যের কথা বা নিন্দা এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে তাঁরা কেন জিনিসের মূল্য নির্দ্ধারণ করবেন? কিন্তু এখানের ব্যবস্থা একটু যেন অন্য রকম। এখানে শ্রোতাদের গান ভাল লাগাতে হলে সে গানের আগে খানিকটা প্রোপাগাণ্ডা তাঁদের কানে ঢুকিয়ে দিতে পারলে যেন ভাল ফল পাওয়া যায়। আর সেই প্রোপাগাণ্ডা যাঁর আগেই হয়েছে তাঁর গান শুনতে বসবার আগে থেকেই শ্রোতারা সন্মোহিত এবং কোন অবস্থাতেই গান শোনবার পর সে মত যেন বদলাতে চায় না। এই জিনিসটা দেখলে নিরাশায় মন ভরে যায়; মনে হয় বাংলাদেশের এতদিনের সঙ্গীত সাধনা আর সঙ্গীত রসিকদের এই যে আগ্রহ এর মধ্যেও কি কোন বিরাট ফাঁকি আছে নাকি?"

এরও উপর আছে দলাদলি, ঈর্ষা ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা পক্ষপাতিত্ব। গত বৎসরের একটি দিনের প্রত্যক্ষ করা একটি ছোট্ট ঘটনার কথাও এই প্রসঙ্গে লিখতে হোলো। গত বৎসর কোলকাতায় 'তানসেন-সঙ্গীত সম্মেলনের' সময় ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব এসেছিলেন। সত্যকিঙ্কর বাবু ধ্রুপদ গান করছিলেন। গান শেষ করে তিনি যখন উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন আলাউদ্দীন খাঁ আসন থেকে উঠে আবেগভরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সে একটা দৃশ্য। পুত্র আলি আকবর্ কাছেই দাঁড়িয়ে একটু কৌতুহল মিশ্রিত আগ্রহের সংগে বৃদ্ধের এই আকস্মিক ভাবাবেগ লক্ষ্য করছিলেন। তা দেখে আলাউদ্দীন খাঁ বললেন, "এঁকে নমস্কার কর; মনে রেখো এরাই হচ্ছেন একালের সেই আচার্য্য স্থানীয় গুণী। কোলকাতায় যখনই আসবে এঁদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করবে।" জামাতা রবিশঙ্কর এগিয়ে এসে বলেন "খুবই আশা ছিল কন্‌ফারেন্সে ওঁর সেতার বাজনাও শুনতে পাব।"

কিন্তু এ সম্মান ও সমাদর বাংলাদেশে তেমন সুলভ নয়। মনে হয় শিল্পী হয়তো সত্যই অনুযোগ করতে পারেন। একজন একাধারে শ্রেষ্ঠ গায়ক ও যন্ত্রী, সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার ও সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণেতা ভারতবর্ষে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয় আর কোন প্রদেশে বর্ত্তমানে তো কেউ নেই-ই, আগে কখনও কেউ ছিলেন কি না জানি না। এ হিসেবে যতটুকু তাঁর প্রাপ্য দেশ কি তাঁকে তা দিয়েছে ?......॥

স্বাধীনতা-সংগ্রাম-শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতা দশম বার্ষিকী
উৎসব উপলক্ষে
সঙ্গীত সুধাকর—শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়ের করকমলে—

হে সঙ্গীতাচার্য্য,

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শত বর্ষ পূর্ত্তি ও স্বাধীনতা দশম-বার্ষিকী উৎসবের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র দিবসের এই অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া জেলা-বাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। আপনি গ্রহণ করুন—আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

হে সঙ্গীত-জ্ঞান-জলধি,

আপনার জীবনের সার্থকতা—একাগ্রসাধনার অতুলনীয় কৃতিত্ব, আপনার সুরমাধুর্য্য—একাধারে সঙ্গীতে ও যন্ত্রে অসামান্য প্রতিভা শুধু বাঁকুড়া জেলাবাসীর নয়—সমস্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষের গৌরব।

হে সুর-তাল-লয়-মহার্ণব,

আপনার আদর্শ সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের অনুসরণীয় হোক্, সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের হৃদয় আনন্দিত হোক্। আপনার জীবন কল্যাণময় হোক্। আপনার দীর্ঘজীবন লাভে সঙ্গীতশিক্ষার্থী ও সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের হৃদয়ে আপনার চিন্তাধারা, কলাকৌশল, অভিজ্ঞতা প্রচারিত হোক্, পরম কারুণিক জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা॥

ইং ১৬।৮।৫৭
বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির
সভ্যগণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভারত বিশ্রুত-গীত-বাদ্য কলাবিৎ পরমাদরণীয়
শ্রীমৎ সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ায়
প্রদীয়মাণং মান পত্রম্

সঙ্গীতশাস্ত্র বিধিসঙ্গত শুদ্ধ ধারাং
গঙ্গা তরঙ্গ সরণীমিব ধারয়ন্ যঃ
ষড়্রাগগীতি বহুবাদ্য কলাজ্ঞ! সত্বং
হে সত্যকিঙ্কর! নবোদিত শঙ্করোঽসি॥

গোপেশ্বরাদি বহু সাধক সিদ্ধ বংশে
জাতস্ত্বমিন্দুরিব সিন্ধুসমে দ্বিজন্মা।
গীতস্য মর্ম্মসরহস্যমহো! প্রকাশ্য
গ্রন্থাবলী-মমলরত্ন ততিংতনোষি॥

অদ্য প্রমোদভর—বিহ্বলভট্টপল্লী
বিদ্বদগণৈরিহতু বঙ্কিমচন্দ্রতীর্থে।
"সঙ্গীতশাস্ত্রী"—পদপূতমুপাধিরত্নং
তুভ্যং সযত্ন মুপদীক্রিয়তে গৃহাণ॥

নৈহাটি সঙ্গীত পরিষৎ
পক্ষতস্তদ্গুণ পক্ষপাতি—
ভট্টপল্লী বিদ্বদ্ভিরূপ কল্পিতম্॥

বাং ১৩৬৪
পৌষ।

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মভিঃ
শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মভিরিত্যাদি॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'আনন্দবাজার পত্রিকা' রবিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৩৭৮।

রামপ্রসন্ন শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান

"...ঘরণাগুলি যে ঐতিহ্য রেখে গেছে ও যাচ্ছে তার মূল্য অপরিসীম, তার স্বীকৃতি দিতেই হবে,—সে যে ইতিহাস। বাংলার এই রকম অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য রেখে এসেছে বিষ্ণুপুর। এই বিষ্ণুপুর ঘরাণার একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হল 'ইন্দিরা'র উদ্যোগে ২৯শে আগষ্ট (১৯৭২) বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে।

অক্লান্ত বর্ষণেও সেদিন বহু বিশিষ্ট অতিথি এসেছিলেন এই গুণী শিল্পী তথা বিষ্ণুপুর ঘরণার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

রামপ্রসন্ন গানে যেমন ওস্তাদ ছিলেন, তেমনি পারদর্শী ছিলেন সুরবাহার ও সেতারে।

...অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরাণার একজন প্রবীণ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। তোড়ী রাগে ধ্রুপদ ও ধামার গাইলেন আধঘণ্টা কিন্তু তার তুলনা নেই।

হিল্লি—দিল্লি থেকে খাঁ সাহেব, পণ্ডিতজীরা আসেন, অনেক ওস্তাদি দেখিয়ে যান, আমরা ধন্য ধন্য করি। কিন্তু সত্যকিঙ্কর বাবুর গান শুনে অশ্রুসজল চোখে স্তব্ধ হয়ে গেছলাম। এ বস্তু আমাদের আছে, এই সাধনা আমাদের আছে—যার আমরা স্বীকৃতি দিই কাদের? কী তারা আমাদের দিয়ে যাচ্ছে? সত্যকিঙ্কর বাবুর সংগে চলে যাবে এক বিরাট ঐতিহ্য বাঙলার সঞ্চিত ধ্রুপদ। আমরা এসব রাখবো কি করে? আত্মসচেতন হব আর কবে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে—

হে ভারত বিশ্রুত-গীত-বাদ্য-কলা কুশল,

গৌরীপুর রাজবংশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কীর্ত্তিভাক্ পৃষ্ঠপোষক, স্বর্গতঃ ব্রজেন্দ্র কিশোরের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠানে আজ আমরা আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আপনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন গ্রহন করুন।

হে গুণসমুদ্র, বঙ্গদেশের শাস্ত্রীয় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের আপনি প্রবীণ প্রতিভূ! এক বিরাট সংগীতিক ঐতিহ্যের অধিকারী।

বাংলাদেশে বিষ্ণুপুর সংগীতের এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। শত শত বৎসর ধরিয়া বিষ্ণুপুরের রাজবংশের আশ্রয়ে বহু গুণী, শিক্ষিত ব্যক্তি বিষ্ণুপুরের পবিত্র উচ্চাঙ্গ সংগীত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। স্বনাম ধন্য রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরও বিষ্ণুপুরের সংগীত শিক্ষা গ্রহন করিয়া ভারতীয় কলাবন্ত গুণীগণের সম্মান ভাজন হইয়াছিলেন। হে সংগীত শাস্ত্রী, আপনিও সেই বিখ্যাত বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের এক উজ্জল রত্ন।

আপনি একই সংগে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতের তত্বাঙ্গ ও ক্রিয়াঅঙ্গে সমভাবে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

হে মহান স্রষ্টা,

আপনার বহু শ্রেষ্ট গ্রন্থ রচনার মধ্যে সম্প্রতি আপনি যে বৃহৎ "রাগ-অভিজ্ঞান" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে শাস্ত্রীয়সংগীতের ক্রিয়াঅঙ্গ ও ঔপপত্তিক বিষয়ে বহুবিধ গবেষণামূলক তত্ত্বের তাত্বিক আলোচনা দ্বারা যে আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা সত্যই অদ্ভুত ও অতুলনীয়।

ভগবান আপনাকে সুস্থ ও শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন দান করুন। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ রূপে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে অসংখ্য শিষ্য গঠনপূর্বক উচ্চাঙ্গ সংগীতের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করুন—আপনার নিকট ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয়

হে সঙ্গীতাচার্য্য,

আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রগাঢ় বিদ্যার জন্য আজকার এই অনুষ্ঠানে আপনাকে "গুণসমুদ্র" উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিয়া আমরা আজ সত্যই চরিতার্থ।

ব্রজেন্দ্র কিশোর স্মৃতি সমিতি
৫৫ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৯ ॥ ইং ৩০।১১।৬৯

স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠানের সভাপতি
শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট

ব্রজেন্দ্র কিশোর স্মৃতি সমিতির
পক্ষ হইতে—
বিনয়াবনতঃ
শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী
(সভাপতি)
শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য্য
(সাধারণ সম্পাদক)

সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য্যের শুভ দ্বিষষ্টিতম জন্মতিথি মহোৎসব উপলক্ষে

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদত্ত মানপত্র

হে সঙ্গীত সাধক !

আজিকার এই শুভ লগ্নে সৎসঙ্গের পক্ষ হইতে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। আপনি আমাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন গ্রহন করুন।

নির্লিপ্ত, নির্লোভ, উদার, হে মহান সঙ্গীত পূজারী, আপনার ঐকান্তিক সুনিষ্ঠ সাধনা—সমগ্র সঙ্গীত সাধক সমাজের আদর্শ স্বরূপ। কণ্ঠ ও বাদ্য যন্ত্রাদি নিঃসৃত আপনার সুবিপুল প্রতিভা-সঞ্জাত অপরূপ সুরমাধুরী সঙ্গীত কলাকে অভূতপূর্ব উচ্চাসনে অধিরূঢ় করিয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্রাদি রচনায় আপনার নিরলস প্রয়াস সঙ্গীত-বিজ্ঞানে নূতন দিগন্তের সূচনা করিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয়

আজিকার এই পুণ্য অনুষ্ঠানে সৎসঙ্গের পক্ষহইতে আপনাকে "সঙ্গীত-ভাস্কর" উপাধিতে ভূষিত করা হইতেছে।

ক্বণন-কম্পনে নিত্য-প্রবহমান সৃজনোৎস প্রণব-প্রবাহে আপনি অবগাহন করুন—সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ধরণী আপনার সুর-সুরধুনী ধারায় আপ্লুত হউক,—পরম পিতার রাতুল চরণে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

সৎসঙ্গ দেওঘর,
২০শে অগ্রহায়ন;
সোমবার, বাংলা ১৩৭৯

সৎসঙ্গের পক্ষ হইতে
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক, সৎসঙ্গ।

গুণী সম্বর্দ্ধনা

মহানশিল্পী শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু

আবহমান কাল থেকে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় ভাবিত ভারতবর্ষে সংগীত সাধনা ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থারূপে সমাদৃত হয়ে এসেছে। আপনার ন্যায় সংগীত সাধকগণের একাগ্র নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক অনুরাগ ভারতীয় সংগীত স্রোতস্বিনীর বেগবান প্রবাহকে আরও গভীরতা আরও ব্যাপ্তি প্রদান করেছে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সংগীত রসিকদের নিকট আপনার এই অনবদ্য সাধনাপুত জীবন এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। আজ এই শুভ লগ্নে আপনাকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের দুর্লভ সুযোগ তাই আমাদের গৌরবান্বিত করেছে॥

শ্রীভগবানের কাছে একান্ত প্রার্থনা, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি সংগীত সাধনার আরতি প্রদীপে সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনায় আপনার দীর্ঘজীবন কৃতার্থ ও সিদ্ধ হয়ে উঠুক।

সি, আই, টি বিল্ডিং
এ-৮। কলিকাতা-৭
ইং ১৯।৯।৭৬

গুণমুগ্ধ ও স্নেহধন্য
শতরূপা সংগীতায়নের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,
সংগীত সঙ্ঘের শিল্পীবৃন্দ ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভিনন্দন পত্র

কলিকাতা গাঙ্গুলী কলেজ অফ্ মিউজিক কর্তৃক প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি গুণ মুগ্ধ

—: ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলী :—

হে সঙ্গীতাচার্য্য !
কণ্ঠ তব শত সুধা বরষায় যেন
বাণীর অমর পীঠে তুমি সুধাকর।
স্রোতবিহঙ্গিনী-সম সুধাকণ্ঠ তব
কখনও মন্দ্র কখনও বজ্র,
লহ প্রণাম; লহপ্রণাম,
হে সত্য, হে সুন্দর, হে সঙ্গীতপ্রভাকর॥
সুরের সমুদ্রে অবগাহি তুমি,
আসন পেতেছ এ বঙ্গভূমে—
অতি সুখ্যাত সেই যে ঘরাণা
'বিষ্ণুপুর' নামে যাহা খ্যাত।
উত্তরাধিকার পরম্পরায়
কস্তুরী-সম পরিব্যাপ্ত॥
বিচ্ছুরিত বর্তিকা তাহে তুমি,
সে সঙ্গীত গুরু
লহ প্রণাম, লহ প্রণাম, লহ প্রণাম॥

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
২০সি, নলিন সরকার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

বিনীত—
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মন্মথ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মেমোরিয়েল এসোসিয়েশনের
সহ-সভাপতি কর্তৃক লিখিত (তাং ২৫-১২-৭১)

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীত শাস্ত্রী
মহোদয়ের করকমলে—

মান্যবরেষু,

বিগত ১৭ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব স্বর্গীয় মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৩৮তম বার্ষিক স্মরণ সভা উপলক্ষে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে আপনি অংশগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অশেষ অনুগৃহীত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আপনি আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন॥

আপনার সেদিনের পুরিয়া রাগের আলাপ ও ধ্রুপদ শুনিয়া মনে হইতেছিল আপনি যেন সুরের দেবতার কাছে আত্মনিবেদন করিতেছেন, আর তাহার প্রভাবে শ্রোতারা যেন আপনার সংগে একাত্ম হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানটি সুরমাধুর্য্যে ও ছন্দবৈচিত্র্যে এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয় যে তাহা ভাষার প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এ জাতীয় অনুষ্ঠান সত্যই দুর্লভ...।

আপনার অমায়িক ও বিনম্র ব্যবহার সঙ্গীত শিল্পীদের আদর্শ। আপনার সুমধুর সাহচর্য্যও আপনার সঙ্গীতের ন্যায় সমান আনন্দদায়ক॥

প্রণামান্তে—
আপনার আশীর্বাদ প্রার্থী
হরিভূষণ বসু
সহসভাপতি॥

এই অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক গুণগ্রাহী শ্রোতা ও শ্রোত্রীবৃন্দ উপস্থিত হন। প্রত্যেকেই বিশিষ্ট নাগরিকরূপে পরিচিত। বহু শিল্পীও এই অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগদান করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গীতাচার্য্য পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদায় গ্রহণ উপলক্ষ্যে—

বিদায় বড় নিষ্ঠুর। সমস্ত কারুণ্য, সমস্ত বেদনাকে বিদ্রূপ করে বিদায় আসে। আপনাকে বিদায় দিতে গিয়ে আজ আমাদের এই কথাটিই মনে পড়’ছে,—

"বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর..."

শ্রাবণের বাদল ধারা শেষ করে ভাদ্র পড়লো, আর আপনিও আপনার সব সংগীত মুছে নিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। আপনি আমাদের গান দিয়ে এমন ভাবে ভরিয়ে রেখেছিলেন যে আপনি চলে যাওয়াতে যে আমাদের শুধু ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, আমাদের কাছে আজ সব কিছুই শূন্য মনে হচ্ছে। আপনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠিক কথা, কিন্তু আপনি যেভাবে আমাদের ভরিয়ে রেখেছিলেন সে শূন্যস্থান বুঝি কেউ-ই পূর্ণ করতে পারবে না। গানের ক্লাশে আপনি যে কি এক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতেন, সে ইন্দ্রজালের আবেষ্টনী ভেদ করে বুঝি ছুটির ঘণ্টাও আমাদের কাছে পৌঁছত না।

আপনি আমাদের ভিত্তি প্রস্তর রচনা করে গেছেন, এখন অনেকের কাছেই হয়তো গান শিখবো কিন্তু আপনার অভাব আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করবো, এর চেয়ে বড় সত্য বোধহয় আর নেই। তবে ত্রিবেণীতে ডুব দিলেও উৎসতো সেই গঙ্গোত্রী॥

ইতি প্রণতা—

ইং ১৯৬২ সেপ্টেম্বর,

শিক্ষিকা ও ছাত্রীবৃন্দ

ইউনাইটেড মিশনারী হাই স্কুল, কলিকাতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদ—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায় উপলক্ষ্যে

১৯৬৬

সুধী,

যাবার বেলা পিছু ডেকে, আপনার পথ পিছল করা অহেতুক জেনেও দিতে এসেছি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলিটুকু আপনাকে।

বহু বৎসর ধরে জড়িত ছিলেন আপনি এই বিদ্যায়তনের সঙ্গে। তখনকার বহু শিক্ষিকা ও ছাত্রী আপনার কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিল।

আপনার অসীম ধৈর্য্য, অপরিসীম যত্ন ও অটুট কর্ত্তব্য নিষ্ঠা আপনার স্মৃতিকে উদীয়মান সূর্য্যের মত আমাদের হৃদয়াকাশে উজ্জল করে রাখবে।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন এবং আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

সহকর্ম্মীগণ
সেণ্ট মার্গারেট বিদ্যালয়, কলিকাতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi